শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৬৩

প্রকাশক :
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
২২, ক্যানিং স্ট্রীট
কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট :
অজিত গুপ্ত

মুদ্রক :
রণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৪

চার টাকা

বহুদিন বাঙলায় বড় বেশি কিছু লিখিনি। কখনও সখনও কলকাতায় ছুটিতে এসেছি, বন্ধুরা ধরাধরি করেছেন, যা হয় একটা লিখে দিয়েছি, তার বেশি পরিশ্রম করতে সময় পাইনি, অন্তরের তাগিদও ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে কখনই আমার কোনো রচনার পিছনে লোকে যাকে প্রেরণা বলে তা ছিল বলে মনে পড়ে না। সবই প্রায় খোঁচা খেয়ে লেখা। হয় বুদ্ধিগত, কারুর সঙ্গে মতের মিল হয়নি, না হয় ব্যক্তিগত, কেউ আঘাত করেছেন। সেই জন্য আমার রচনার ধর্ম পাল্টা জবাবের, ডায়লগের। নিজের থিসিস নেই, সব ক্ষেত্রে মতও হয়তো নেই। তবে মন আছে, এবং সে-মন বিচারে সদাই তৎপর। ব্যস, ঐটুকু, তার বেশিও নয়, আশা করি, কমও নয়। আমার যে-মন, তার জন্য দায়ী আমার পারিবারিক পরম্পরা। আমার বন্ধুরা ও বই—ভালো ব ই। সবে মিলে যে নক্সা আমার মধ্যে রয়েছে, তাকেই নিজস্ব মন বলি।

'মনে এলো' কিন্তু ঠিক ঐ ধরনের কোনো খোঁচা খেয়ে লিখিনি। বন্ধুরা কিছুদিন ধরে বলতে শুরু করেছেন, 'আপনি anecdotes লিখুন।' প্রথমে ভেবেছিলাম ইংরেজীতেই লিখবো, নামও ঠিক করলুম—Anecdotage। কিন্তু ভেবে দেখলাম মনে এখনও যখন বুড়ো হইনি তখন আদ্যিকালের গল্প শোনাবার সময় হয়নি। পরে দেখা যাবে ; আপাতত 'মনে এলো'ই লিখি। পুরানো কথাই মনে পড়ে, এখনকার ও ভবিষ্যতের কথা মনে আসে।

বলা বাহুল্য, এটা ঠিক ডায়েরী নয়। সন তারিখ কেবল ক্যালেণ্ডারের গোপন কথা এতে নেই, কারণ যে বয়সে কোনো কোনো গোপন কথা ডায়েরীতে না লিখলে দম বন্ধ হয়ে যায়, সে বয়স আমি পার হয়ে এসেছি। মনোভাবটাও ঠিক রোমান্টিক নয়, আবার দার্শনিকও নয়। অন্য দিকে মানসিক রিপোর্টাজও লিখতে বসিনি। সারাদিন খেটেখুটে

একলা খাবার টেবিলের ধারে বসে নিজের সঙ্গে যা কথোপকথন করেছি এ খানিকটা তাই। অতএব এক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতা, কিংবা অসংলগ্নতার কথাই ওঠে না। এই বয়সে, এই পরিস্থিতিতে আমি যা, তাই হওয়াই শোভন ও সঙ্গত। আমি কোমর বেঁধে সাহিত্যসৃষ্টি করতে বসিনি। আমার মনের নক্সা যদি মামুলি না হয়, তবে 'মনে এলো'র আঙ্গিকও মামুলি হবে না।

আমার বন্ধু সাগরময় ঘোষ ও আমার ভাই বিমলাপ্রসাদের উৎসাহে 'মনে এলো' দেশে বেরিয়েছিল। অতএব পাপের অংশীদার তাঁরা। কিন্তু যদি পাপ না হয় তবে পাঠক যেন তাঁদেরই ধন্যবাদ দেন। আমার ভালোবাসা তো রয়েইছে। প্রকাশকরা বইখানি ছাপিয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিলেন কিনা তাঁরাই জানেন। আমি এইটুকু জানি যে, এই ধরনের লেখা আমি আরো কিছুদিন লিখে যাবো।

বহু পাঠক-পাঠিকা আমাকে চিঠি লিখে উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কলকাতা
৫-৫-১৯৫৬

ধূর্জটিপ্রসাদ

১২-৯-৫৬

১৭-৭-৫৫

অসহ্য গরম, অসম্ভব গুমোট! অসভ্য শহর আলিগড়। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় খাড়া করবার সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই না। আগে না হয় পাকিস্তানের রঙরুট তৈরি হতো এখানে, কিন্তু এখন? এমন একটি বই-এর দোকান নেই যেখানে যাওয়া যায়, বই ঘাটা যায়, বিদেশ থেকে বই আনাবার অর্ডার দেওয়া যায়। কফি পাওয়া যায় না, সিগারেট নয়। দেয়াশলাই যা পাওয়া যায়, তা জ্বলে না। এত বড় নোঙরা শহর ভারতবর্ষে নেই। শহরের মধ্যে খোলা নালা; সেখানে ময়লা পচছে বছরের পর বছর, কেউ আপত্তি করে না। বহু পুরাতন শহর। গুপ্ত যুগের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে; পাঠান, মুঘল, রাজপুত, মারহাট্টা, ফরাসী সকলেই এসেছে আর গিয়েছে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত একাডেমিক স্বাধীনতা আছে। পজিটিভ কিছু নয়, তবে কাজে কোনো বাধা নেই। দেরি হয় খুব অবশ্য। ঢিলে জায়গা। চিন্তার কোনো ঐতিহ্য নেই। গড়ে তুলতে হবে—এবং গড়া যাবে, আমার বিশ্বাস। ছেলেদের মনে যেন একটু রঙ ধরেছে। ছাত্ররা ও নতুন লেক্‌চারারের দল গ্রীষ্মের ছুটিতে লু ও আঁধির মধ্যেও খুব পরিশ্রম করলে। এরা দেশকে জানতো না, এখন দেশ আছে বুঝছে। অর্থনীতিতে বাস্তবতার ঝোঁক এনে দিতে পারলে আমি কৃতার্থ হবো। সকলেই খুব ভদ্র। যৌবনসুলভ তেজ যেন একটু কম। ভালোই। ছাত্র-সমাজের ব্যাপার দেখে ভয় হয়। তাদের ভবিষ্যৎ দেখে ততটা

নয়, যতটা আমাদের বোঝবার অক্ষমতা ও নিঃস্পৃহতা দেখে। কী ভণ্ডুলটাই না হলো এলাহাবাদ আর লক্ষ্ণৌ-এ! এখনও হচ্ছে।

সাতটি মেয়ে এম-এ ক্লাশে ভর্তি হয়েছে। বুরখা পরে এলে ক্লাশে ঢুকতে দেবার অনিচ্ছা প্রকাশ করলাম। হেসে বুরখা খুলে ফেললে। নিজেরা কেউ চায় না পরতে, বাড়ির গিন্নীরাই চান। যারা বুরখা পরে না তাদের মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, কর্মিষ্ঠা। একটি মেয়েকে লেক্‌চারার নিযুক্ত করলাম। পর্দা চলে যাচ্ছে। আশা করি, সংযম টুটবে না। ভারতীয় মেয়েদের শরমের মধ্যে যে গাম্ভীর্য ও শালীনতা আছে, তার তুলনা কুত্রাপি নেই। এখনও—তবে যেন কমছে সন্দেহ হলো কলকাতার হালচাল দেখে।

২০-৭-৫৫

ডাঃ বিধান রায়ের খাস কামরায় গিয়েছিলাম সেদিন। বাঙলা দেশের অর্থনীতিবিদ্‌রা তার প্ল্যান সম্বন্ধে গোটা কয়েক প্রশ্ন করেছিলেন। ডাঃ রায় উত্তর দিলেন। আমি ছিলাম সুশীল দে'র অতিথি। উত্তরই শুনলাম; আলোচনার গন্ধ পর্যন্ত পেলাম না। অত্যন্ত হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। ডাঃ রায়ের উত্তরের পর দুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল: (১) প্রশান্তবাবুর প্ল্যান-

ফ্রেম ডিডাক্টিভ্, আর বিধানবাবুর ইণ্ডাক্টিভ্। (২) বিধানবাবুর প্ল্যান ডিমোক্রেটিক, আর প্রশান্তবাবুর টোট্যালিটারিয়ন। সোজা ব্যাপার! কলকাতায় আজকাল কোথায় নতুন বই পাওয়া যায় জানি না, নচেৎ ইচ্ছে হচ্ছিলো কয়েকজনকে Weldon-এর 'Vocabulary of Politics' কিনে উপহার দিই। বইটা ছোট ও সস্তা—পেলিক্যান। টোট্যালিটারিয়ন, ডিমোক্রেটিক ইত্যাদি অর্থনীতির ভাষা নয়, পলিটিক্সের এবং বস্তা পচা পলিটিক্সের এবং সামাজিক ব্যাপারের শাস্ত্রে মিল সাহেব বহু পূর্বে দেখিয়েছেন যে, ডিডাক্টিভ্, ইণ্ডাক্টিভ্ প্রভৃতি সংজ্ঞা অচল। বাঙলা দেশে ডাঃ রায়ের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত। মাথা তাঁর বৈজ্ঞানিকের, প্রতিপত্তি বৃদ্ধের ও অভিজ্ঞতার এবং তথ্যের উপর তাঁর অদ্ভুত দখল। উপস্থিত অধ্যাপক গোষ্ঠী প্রায় নীরবই থাকলেন। এক এক সময় মনে হচ্ছিলো, আমরা ছোট বলেই অন্যে অতটা বড় হয়। আমার ধারণা হচ্ছে যে, আমরা প্ল্যানিং জিনিসটা বুঝতে পারিনি এখনও এবং প্ল্যান-ফ্রেম্ যে ফ্রেম্ এটুকু বোঝবার উদারতাও আমাদের নেই। এই না-বোঝার মধ্যে অনেকখানি পরশ্রীকাতরতা ও বাঙলা দেশের বিশেষত্ব সম্বন্ধে অভিমান মিশে আছে।

অবশ্য প্রশান্তবাবু the gentle art of making enemies (and not always so gentle)-এর আর্টিস্ট। কিন্তু তিনি যে একটা বিরাট কাজ করেছেন, সেটুকু মানতে কৃপণ হওয়া নীচতা। সংখ্যা-বিজ্ঞান নামে বস্তুটির সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া, দশ পনেরো বছরের মধ্যে একটা বিরাট অনুষ্ঠান খাড়া করা—যার তুলনার জন্য ভিন্ন দেশে যেতে হয়—এ-সব না হয় ছেড়ে দিলাম ইতিহাসের হাতে। কিন্তু প্ল্যানিং কমিশন যা পারেনি, ইকনমিস্টরা যা করেননি, সেই কাজ একজন অর্থনীতিতে

অনভিজ্ঞ লোক করেছেন তাইতে বাহাদুরি দেবো, না হিংসে করবো! সভায় ডিমর‍্যালাইজেশ্যন-এরই লক্ষণ যেন বেশি পেলাম। সুশীল দে বললেন, 'এত আশাই বা করেছিলেন কেন?' উত্তর দিলাম, 'শচীন চৌধুরী যে বলেছিল!'

লিওনতিয়েফ-এর বই দু'খানি* আবার নাড়াচাড়া করলাম। দেরাদুনে দু'মাস ধরে চেষ্টা করলাম বুঝতে। এখনও পারছি না। একটা আবছায়া ভেসে উঠছে। 'কম্পারেটিভ স্ট্যাটিক অ্যাপ্রোচ'-এর কি এই শেষ কথা? উচ্চাঙ্গের গণিতশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে 'ডাইন্যামিক' বিশ্লেষণ কি অসম্ভব? টেক্‌নিক্যাল কো-এফিশিয়েন্ট-গুলি আমাদের দেশের সব শ্রম-শিল্পে কি পাওয়া যাবে? ব্যাপারটা প্রধানতঃ ইঞ্জিনীয়ারিং-এর। অর্থনীতির সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে স্থাপিত হলো। কুটির-শিল্পের 'ইনপুট-আউটপুট' বিশ্লেষণ কিভাবে হবে? মাঝারি আয়তনের শ্রম-শিল্পগুলির? যন্ত্রপাতিগুলোও তো আদ্যিকালের। টেক্‌নিক্যাল কো-এফিশিয়েন্ট বা গুণক বার করতে টেক্‌নিক্যাল সমধর্মিত্ব ধরে নিতে হয় না কি? পরিশ্রমকে না হয় সম-হারে পরিণত করা গেল,—যথা খুব সুদক্ষ মজদুরি অদীক্ষিত পরিশ্রমের তিনগুণ, চারগুণ। কিন্তু যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে কি বলা যায় যে, আধুনিকতম মেশিনটি হাতুড়ির চেয়ে দশগুণ কি বিশগুণ কর্মঠ? ওদের জাতই আলাদা, কাজই আলাদা। এই ধরনের মূল্য পরিবর্তন ও ব্যবস্থাপনে আমার মন সায় দেয় না। অথচ উপায় নেই। আপেক্ষিক মূল্যের ব্যাপারেও একটা গলদ রয়েছে সন্দেহ হয়। রাশিয়ার প্ল্যানিং-এ 'ইনপুট-আউটপুট'

* The Structure of American Economy; L and others—Studies in the Structure of American Economy.

বিশ্লেষণের ব্যবহার হয় না, যতদূর জানি। তবু সেখানে আজকাল ভুলের অবকাশ খুবই অল্প শুনেছি। এতদিনের আন্দাজে ওরা মোটামুটি একটা কার্যকরী খসড়া দাঁড় করায়। কিন্তু অত ভয়ঙ্কর পরীক্ষা কি আমরা বরদাস্ত করতে পারবো? ওদের চাপ ছিল বাইরের ও ভেতরের এক সঙ্গে—আমাদের প্রধানতঃ ভেতরের। তাই বোধ হয় রাশিয়ান প্ল্যানিং-এর ভুল-দোষগুলি কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে। সহজে নয় অবশ্য। খুবই দেরি লাগবে। ততদিনে নৌকো বানচাল না হয়!

এই ধরনের অর্থনীতিক বিশ্লেষণের বিপক্ষে উপায় ও সঙ্গতির নির্দেশকরণ সংক্রান্ত তর্ক অবাস্তব। নির্দেশকরণের জন্যই বিশ্লেষণ। কিন্তু এতে বণ্টনের থিওরি নেই। এতে মজুরি, সুদ ও মুনাফা হচ্ছে 'অ্যাজ গিভ্ন'। অথচ 'গিভ্ন' বললেই তো উড়িয়ে দেওয়া চলে না! মানুষের মনুষ্যত্ব প্রভৃতি কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু মানুষের আয়-ব্যয় তো আছে! আয়কে কর্মের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেই কি সমস্যার সমাধান হবে? টাকা, আয়-ব্যয় এদের প্রয়োজন হয়তো প্রাথমিক নয়, কিন্তু প্রাথমিক নয় বলেই কি তারা উবে যাবে? আমার ধারণা, কীন্সের বিশ্লেষণের সঙ্গে লিওনতিয়েফের বিশ্লেষণের পার্থক্য স্তরের ও আঙ্গিকের পার্থক্য, মৌলিক নয়। ভেবে দেখতে হবে। ভারি মজার ব্যাপার—সমস্যা ছিল এতদিন কীন্স ও মার্কসের সম্পর্কে। লিওনতিয়েফের প্রবেশে সমস্যাটি পণ্ডিতদের কাছে তে'কোণা হয়ে উঠলো। সমাধান হবে কর্মক্ষেত্রে—অধ্যাপকের কৃপায় নয়। সেই আদিম পার্স থিওরি ও প্র্যাকটিস-এর ঝগড়া। এর নিষ্পত্তি চার্লস করতে পারেননি, মার্কসিজ্‌মের মধ্যেও নেই। ডায়েলেক্টিক-এর সাহায্যেও নিষ্পত্তি হয় না, একটা মনগড়া ব্যাখ্যা হয়।

আন্তর্জাতিক সমাজ-বিজ্ঞান বুলেটিন-এর চতুর্থ খণ্ড (১৯৫৪) চতুর্থ সংখ্যাটিতে গণিত ও সমাজ সংক্রান্ত বিদ্যার সম্বন্ধে অনেকগুলি গভীর প্রবন্ধ দেরাদুনে বসে পড়লাম। একজন লিখছেন :

"One might ask why mathematics, representing as it does, a powerful aid to theoretical reasoning, is not used all the time. The difficulty lies in the fact that one must know exactly and specifically what one is talking about and what one is saying before it can be stated in terms amenable to mathematical techniques. In other words, before mathematics can be used as an aid to theoretical thinking, the theory in question must be very specific and unambiguous."

এই দুটো শর্ত, নির্দিষ্টতা আর সুনিশ্চয়তা যদি কোনো থিওরীতে পূরণ হয়, তবেই সেখানে গণিতের ব্যবহার চলবে এবং অন্যদিকে গণিতের ব্যবহার যদি অচল হয়, তবে বুঝতে হবে থিওরীটি নিতান্ত ভাসা ভাসা, ধোঁয়াটে। সমাজতত্ত্বের থিওরী ঘোলা; অর্থনীতিক থিওরী অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। প্ল্যানিং মাত্র আর্থিক নয়, অন্তত ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা খুবই সামাজিক ব্যাপার ও ঘোলাটে। এই বিষয়গত পার্থক্যই কি অর্থনীতির থিওরী ও সামাজিক ব্যবহার, দু-এর মধ্যে অসামঞ্জস্যের হেতু? আমাদের সমস্যাগুলোই দ্ব্যর্থবাচক, অপরিষ্কার ও অনির্দিষ্ট—তা না হয়েই যায় না। অতএব থিওরী ও ব্যবহারের বিবাদ আরো কিছুদিন চলবে—যতদিন পর্যন্ত যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে সমস্যার ছাঁচ সহজে তৈরি না হয়, মানুষ সংখ্যায় পরিণত না হয়। প্রশ্ন উঠছে—সেটা

কি সুদিন? এর উত্তর জানি না। অনুভব করি, নয়। অথচ ইতিহাসের গতি কি করে অমান্য করি! ঐ দিকেই ভারতবর্ষ চলেছে! বোধ হয় কাপুরুষতা।

বুদ্ধিজীবীর কাজ কি ইতিহাসের গতির ওপর ব্রেক কষা? বাঞ্ছিত পথে চালাবার শক্তি যখন নেই, তখন আর কি সম্ভব? মোটর যে চালায়, সেই ব্রেক কষে। বুদ্ধিজীবীরা না চালিয়ে ব্রেক কষতে চান। তাই বেচারীদের এমন দুর্দশা।

২১-৭-৫৫

যে প্রবন্ধটি আমেরিকান পত্রিকার জন্য পাঠিয়েছি, তার মধ্যে একাধিক জায়গায় ফাঁকি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টেলেক-চুয়ালদের আমি পাশ কাটিয়ে গেলাম। বিদেশীর কাছে নিজেদের কেচ্ছা গাইতে লজ্জা হলো। লজ্জা এলো দেখে আরো লজ্জিত হলাম। মনোমোহন ঘোষ রবিবাবুকে বলেছিলেন, 'living apologetically'—আমাদের সকলের অবস্থাই তাই। সবাই লজ্জিত হয়ে, পরের কৃপায় বেঁচে আছি। অন্য দেশে সমাজে ও সরকারের কাছে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের স্থান আছে। এখানে (অল্প কয়েকদিন হলো বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিজ্ঞদের কিছু খাতির হচ্ছে সবকারের কাছে। অনেকেই দিল্লী ছুটেছেন। কিন্তু আমি জানি ভেতরকার কথা। বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কীর্তন।)

বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে আমরা প্রত্যেকে অড ম্যান আউট—শিকাগো বৈজ্ঞানিকদের ভাষায় 'মার্জিনাল' জীব। ধোবিকা কুত্তা,—না ঘরকা, না ঘাট্‌কা। ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীরা মধ্যবিত্তের একটি অংশ,—ইংরেজী-শিক্ষিত, ইংরেজী-চিন্তায় লালিতপালিত, দেশ সম্বন্ধে অজ্ঞান এবং স্বাধীন চিন্তায় অক্ষম। এই আমার তেত্রিশ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। পুরানো ব্রাহ্মণশ্রেণী গত, নতুন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হবার পূর্বেই পলিটিশিয়ানের প্রাদুর্ভাব। যুবকদের আদর্শ টাইপ পণ্ডিত নয়, উচ্চ কর্মচারী, হয় সরকারের না হয় বড় ব্যবসার। অনেকখানি আমাদের নিজেদেরই দোষ। খুবই আফ্‌সোস হয়, কারণ তেজ ছিল বিদ্যাসাগরের, বিবেকানন্দের। রবীন্দ্রনাথের, রামেন্দ্রসুন্দরের, অশ্বিনীকুমারের, সতীশবাবুর, আরো অনেকের তেজ তো স্বচক্ষে দেখেছি। তাঁরা বলতে পারতেন, 'এ হয় না'। আর, এখনও একাধিক বিখ্যাত পণ্ডিত, বাঙালী পণ্ডিত, বাঙলার বাইরে রয়েছেন। তাঁদের পক্ষে সবই সম্ভব। কথাটা ব্যক্তিগত মোটেই নয়। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর পয়সা কোথাও থাকে না—এক রাশিয়ায় ছাড়া। অতএব কেবল আত্মসম্মানবোধটাই তাঁদের পুঁজি। আমার পুরানো অর্ধপণ্ডিত পণ্ডিতমশাই-এর এঁদের চেয়ে বেশি চরিত্র ছিল। বিধবা বিবাহের সমর্থনের জন্য তাঁকে পঁচিশ টাকার লোভ দেখানো হয়। তিনি প্রস্রাব করতে উদ্যত হন। ভাষাটা অ-সংস্কৃতই ছিল। তখন তাঁর মাসিক বেতন ৩০৲।৩৫৲ মাত্র, যতদূর মনে পড়ে এবং তাঁর স্ত্রী তখন বাতে ভুগছেন। সে যুগের অন্যান্য বহু দোষ ছিল, কিন্তু গ্রামের মাস্টারদেরও তেজ ছিল, তাই সম্মানও ছিল। আমার বিশ্বাস, এখন এখানে বুদ্ধিজীবীদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। প্ল্যানিং কমিশন যদি দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পনার পৃথক বন্দোবস্ত করেন, তবে

বোধ হয় কিছুটা হতে পারে। ঠিক এখনকার সরকারী বুদ্ধিজীবীরা মাত্র কেরানী, 'ব্যাক-রুম বয়েজ'।

অর্থনীতির দিক থেকে ব্যাপারটা কেবল 'ফুল এমপ্লয়মেন্ট'-এর নয়; সমাজের কাজ পাবার অধিকারের। অর্থাৎ, জন্মালেই কাজ জুটবে এবং নিজের রুচি অনুযায়ী কাজ এবং যে কাজের বেতন জীবনযাত্রার পক্ষে মাত্র যথেষ্ট নয়, অবসরের জন্যও যথেষ্ট। এবং অন্য বেতনের কিংবা রোজগারের তুলনায় এমন কম নয়, যাতে শ্রেণীবোধ ফুটে উঠতে পারে। দেশ তো এগুচ্ছে সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শের দিকে শুনছি। দেখি মাস্টারমশাইদের হাল কি হয়! আপাতত গ্রামের মাস্টারমশাই সরকারী পিওনদের চেয়ে অনেকক্ষেত্রে কম পান। পিওনগিরিও দরকারী কাজ এদেশে—কারণ 'অফ্‌সার' সাহেবরা ফাইল বইতে পারেন না, তাঁদের গৃহিণীরা তরকারি কিনতে বাজারে যেতে পারেন না, ইত্যাদি। আমাদের সরকারী কাজটাও তো 'লেবার ইন্টেন্সিভ'! দেশে অসংখ্য লোক; এবং ম্যালথস্‌ সাহেব দুর্দশা কমাবার জন্য লোক-লস্কর রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের শিক্ষা বিস্তার, চিন্তা বিস্তার—এগুলিও কম প্রয়োজনীয় নয়। একে একে সবই হবে, আগে হোক আন্তর্জাতিক স্টেটাস, পরে দেখা যাবে ইন্টেলেকচুয়াল স্টেটাস! এই ধরনের যুক্তি ও আচরণের দোষ কাল-প্রত্যয়ে। ইতিহাসের সময় রেখামতো চলে না। ঘটনাগুলো গোছার মতন ঘটে। Innovations occur in clusters—

আমাদের ইতিহাসে ইনোভেশ্যন-এর 'রোল'টা কি?

যদি আমাদের ধারণা এই হয় যে, সব সমস্যাই মূলত সামাজিক

অর্থাৎ সমাজ না বদলালে কিছুই হবে না, তখন নতুন ইণ্টেলেক-চুয়ালদের নজর পড়বে কোন্ পরিস্থিতিতে কি ধরনের ব্যবহার উপযোগী হবে তারই ওপর। ভাবের ওপর নয়, চিন্তার ওপর নয়, প্রকাশশৈলীর ওপরও নয়।

২১-৭-৫৫

বই কিনতে অনেক সময় ঠকতে হয়। কতবার বেশি দাম দিয়ে নতুন বই কিনলাম, বছর না ঘুরতেই সস্তা সংস্করণ পাওয়া গেল। আমার এই অভ্যাসের মধ্যে অধীরতা ছাড়া আধুনিকতার মোহ, দম্ভ প্রভৃতি চারিত্রিক দোষ রয়েছে। বুদ্ধির চর্চার দিক থেকে দোষটা গুরুতর। বাইরের আঘাত না পেলে মন সজাগ থাকে না; এবং অভ্যাসের ফলে এমন হয়েছে যে, মনকে সজাগ রাখার জন্য অনবরত আঘাত আনা চাই, তাই বই কিনে আনি। এ এক প্রকারের masoschism মাত্র। একেই পেশাদারী রোগ বলে। দাওয়াই আছে, ক্লাসিক্স পড়া। পড়িও প্রায়, আজকাল তাই বেশি ভালো লাগে। তবু লোভ এবং কর্ম ও জীবিকার চাপ। বিদেশী জার্নালের শেষ সংখ্যা না পড়লেই বাতিল হয়ে যাবার ভয়! অবশ্য আমাদের শাস্ত্রে বই লেখার পূর্বে নতুন বক্তব্য প্রবন্ধাকারে বেরোয়। সেগুলি না পড়লে চলে না। যে-বিষয়ে প্রধান আগ্রহ মাত্র সেই বিষয়-সংক্রান্ত নিবন্ধ পড়লেই

খানিকটা রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের সংখ্যারও শেষ নেই। সারাংশগুলোতেই বা কতটুকু দরকারী খবর মেলে! আজকালকার চিন্তাধারা পুরানো সীমান্ত অতিক্রম করেই অনেক সময় চলে। অবশ্য আমার আগ্রহও একাগ্র নয়। যাঁরা আমার প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা আমাকে গোটা মানুষ হতে শিক্ষা দেন। অধীত বিদ্যা মনুষ্যত্বের উপাদান হোক—এই তাঁরা বলতেন। তাঁদের উপদেশ সফল হয়নি। একদম বরবাদ হয়েছে, বলবো না। কারণ, ছাত্রেরা তো ভালোবাসছে, আর গান শুনে, কবিতা পড়ে, ছবি দেখে মন তো এখনও চাঙ্গা হয়!

ডাঃ ও মিসেস ফ্রাঙ্কফোর্ট-এর সম্পাদিত—'The Intellectual Adventure of Ancient Man'-এর প্রথম সংস্করণ পড়ি, বোধ হয় পাঁচ-ছ' বছর আগে। গত বছর আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আমাকে চলে আসবার সময় আরেকটি কপি উপহার দিলে। ইতিমধ্যে পেলিক্যানের সংস্করণ বেরোলো। দু' তিন কপি কিনে ছাত্রদের উপহার দিলাম। খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো, ঐ ধরনের বই আমাদের প্রাক্ বৈদিক, বৈদিক যুগ সম্বন্ধে যেন লেখা হয়। 'জিমার' ও 'ক্যাম্বেল'-এর বইগুলো খানিকটা ঐ ধরনের। ভারতবাসীর লেখা বই-এর সন্ধানে আছি।

যদি কেউ প্রাচীন ভারতের মনোজগতের অ্যাড্ভেঞ্চার সম্পর্কে গবেষণা করতে চান, তা' হলে ফ্রাঙ্কফোর্ট প্রভৃতির বই পড়তেই হবে। কিন্তু গোটা কয়েক বিষয়ে প্রথম থেকেই সাবধান না হলে ব্যাপারটা গুলিয়ে যাবে। হরাপ্পা, মহেঞ্জোদারোর মানসিক

সভ্যতা সম্বন্ধে মালমশলা কম, যদিও ধারাবাহিকতা হয়তো খুঁজলে পাওয়া যায় না যে তা নয়।

(১) প্রথম সতর্কতা: কেবল 'মিথ্‌স্‌' ও পৌরাণিক কাহিনী নিলেই চলবে না। মাত্র সেগুলি নিলে কেবল মাইথোপিইইক মনোবৃত্তিই ও তারই ক্রিয়া চোখে পড়বে। এবং সেই সঙ্গে সহজেই প্রমাণিত হবে যে, বৈদিক যুগের ভারতীয় চিন্তাধারা গ্রীক চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ব্যাবিলন-ঈজিপ্টের সমগোত্র; অবশ্য এতে একপ্রকার আত্মতৃপ্তি আসবে—কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। মাইথোপিইইক প্রতিপাদ্যের গলদ সেই লেভি-ব্রুলের গলদ, 'প্রি-লজিক্যাল' বা প্রাক্‌-যুক্তিনিষ্ঠ আর 'লজিক্যাল' বা যুক্তনিষ্ঠ মনের ঐতিহাসিক বিভাগ। কেবল তাই নয়, এও দেখছি, আদিম ব্যবহারের একই ব্যাপারে 'লজিকাল' 'নন্‌-লজিক্যাল' মিশে আছে। ('নন্‌-' আর 'প্রি-' এক বস্তু নয়।) যৌক্তিক কেমন করে অযৌক্তিকের পরে বুঝি না, যদি না বিশ্বাস করি যে, গ্রীক মনই সত্যকারের সভ্য মন; যদি না অবরোহ প্রণালীর জ্যামিতিক পদ্ধতিকে মনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ভাবি, যদি না মানসিক চিন্তাধারা সেই গ্রীকদের মতো একই লাইনে চলছে, স্বীকার করি। যুক্তির দিক থেকেও ইতিহাসের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম—তা কি সম্ভব? এই ধরনের বিপদ থেকে প্রথমেই বাঁচাতে হবে। অর্থাৎ বেদের ভাব-সংস্কারগুলোকেও বুঝতে হবে 'মিথ্‌স্‌' এবং কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে। ঐ দুটোর সম্বন্ধ স্থাপিত হচ্ছে ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে। ফ্রাঙ্কফোর্ট প্রভৃতির বইতে রিচ্যুয়াল বা ক্রিয়ার বিশ্লেষণ নেই।

(২) দ্বিতীয় সতর্কতা: মাত্র মিথ্‌ ও কাহিনীর বিচার করলে আমরা বৈদিক ঋষিদের কাব্যশক্তিরই সন্ধান পাবো। অগ্নিদেবতার

সঙ্গে সম্পর্ক কাব্যিক প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না সত্তাসূচক অ্যানিমিজম্? সংজ্ঞা-জ্ঞাপক কল্পনা ক্যাসিরার-এর ভাষায় খাঁটি মৌলিক রূপকের দৃষ্টান্ত।

(৩) তৃতীয় সতর্কতা : মাইথোপিয়াতে আরোপ হয় সকলেই জানে। সেই আরোপের প্রকৃতি-বিচারের সময় যেন চরিত্রের সঙ্গে সত্তার, তুলনার সঙ্গে সমতার প্রতিপাদন, দ্বৈত সমতার সঙ্গে সজ্ঞানে একরূপ করার চেষ্টা গুলিয়ে না যায়।

(৪) চতুর্থ সতর্কতা : সমীকরণে স্থান বা ক্রম-বিপর্যয়, অনুকল্প স্থাপন আর মৌলিক রূপক ভিন্ন বস্তু।

(৫) শেষ সতর্কতা : বৈদিক যুগের কল্পনাকাহিনী থেকে তার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থা সিদ্ধান্ত করার মধ্যে 'প্রশ্নভিক্ষা' আছে। যুক্তিটা এই প্রকার : সামাজিক অবস্থা ও ধারণা থেকেই কল্পনার জগৎ উঠেছে। অতএব কল্পনার জগৎ থেকেই বাস্তব সামাজিক জগতের পুরো ছবি পাওয়া যাবে। বাস্তব ও কাল্পনিক জগতের প্রকৃত সম্বন্ধ কিন্তু এই যুক্তিতে ধরা পড়লো না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মার্ক্সীয় সমাজ-দর্শনের বিপদ এইখানে। ম্যানহাইম, স্কেলার প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সামলাতে গিয়েছেন, পারেননি। মনোবিজ্ঞানেও এ-বিষয়ে নতুন খবর পাইনি এখনও। Journal of the History of Ideas—জুন, ১৯৫৫ সংখ্যাতে ফ্রাঙ্কফোর্ট-এর পূর্বোক্ত সমালোচনা রয়েছে।

এই পত্রিকারই এপ্রিল সংখ্যায় Pieter Geyl আর এক হাত নিয়েছেন টয়েনবির ওপর। জুন সংখ্যায় টয়েনবি উত্তর দিয়েছেন। ইউট্রেক্ট-এ গেলাম তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে, সাহেবকে পেলাম

না। টয়েনবি হলেন তাঁর কাছে ষাঁড়ের সামনে লাল কাপড়। আমারও টয়েনবিকে ভালো লাগে না, তবে অতখানি নয়। ওদেশে অধ্যাপকরা সাফ্ সাফ্ কথা বলতে ভয় পান না। এখানে সামান্য কিছু বলছো কি মরেছো, চিরশত্রু হয়ে গেলে। পাতলা চামড়া! একে স্পর্শকাতরতা বলা চলে না। মূলধনের অভাব। মার্গট অ্যাস্কুইথের ভাষায়—I shall forget but I shall never forgive ; ভুলবো কিন্তু মাফ্ করবো না।

২৩-৭-৫৫

জেনেভাতে, 'সামিট টক্স' চলছে। এভারেস্ট-কাঞ্চনজঙ্ঘা জয়ের পর শিখরের উপমা চালু হওয়াই স্বাভাবিক। কোনো উত্তেজনাই আসছে না। জার্মানীকে অ-বৈধ করাই ভালো। কিন্তু NATO-তে তা সম্ভব নয়। য়ুরোপের সমস্যাকে প্রধান করার মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকায় কি ঘটছে তাকে অগ্রাহ্য করার ইঙ্গিত পাই। আফ্রিকার জাগরণ আগামী পঞ্চাশ বছরের সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা হবে। অন্ধকার মহাদেশের কৃষ্ণকুটিল আক্রোশ ভয়াবহ জিনিস। পন্থা কি ঐ টেক্‌নলজি, না আর কিছু? গোল্ড কোস্ট-এ আমাদের মতন ভদ্রলোক শ্রেণী তৈরি হচ্ছে। উত্তর আফ্রিকার ইস্‌লাম সামাজিক প্রগতিকে সাহায্য করছে বলে মনে হয় না। কলকব্জারই জয় হবে শেষে, যা বুঝছি। ওখানে

বাধা দেবার মতো কিছুই নেই। জাতীয়তাবাদ আর শ্রমশিল্পবাদ হরিহর।

সুধীন্দ্র দত্তের 'প্রতিধ্বনি' ব্রোমাইড নয়। ঘুম যখন এলোই না, তবে কেনই বা জাগ্রত অবস্থার সদ্ব্যবহার না করি! ভূমিকার মন্তব্য সম্বন্ধে দুই মত থাকতে পারে; কিন্তু এই বইখানির বেলায় নিতান্ত সত্য। তিনটে সেক্সপীয়রের সনেট সুধীনের অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম। সুধীন নতুন কবিতাই লিখেছেন। পরে অনুবাদের অপূর্ব দক্ষতা বুঝলাম। পরে, একসঙ্গে নয়। এইক্ষণে তার মননের অতুলনীয় সততাটাই আমাকে মুগ্ধ করছে। অনুবাদের জন্য এই কবিতাগুলোই বাছলে কেন সে? অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তার ভালো লেগেছিল জানি। তবু নির্বাচনের মধ্যে তার মনের প্রকৃতি ও ইতিহাস পাওয়া যায় কিনা, ভাবছি। অধিকাংশ কবিতায়— সবগুলিতে নয় নিশ্চয়— একটা হতাশার ছাপ রয়েছে সন্দেহ হয়। আবার পড়তে হবে।

সুধীন্দ্রের কবিতায় কী জীবন সম্পর্কে ট্র্যাজিক ধারণা, না মাত্র ব্যর্থতাবোধ? অবশ্য সে বলবে, তাতে কিছুই আসে যায় না। এইখানে আমার সঙ্গে তার গরমিল হচ্ছে।

মালার্মের কবিতাটি ভীষণ শক্ত। দু'-একটি ইংরেজী অনুবাদ পড়েছি। বুঝিনি। এবারও বুঝলাম না, সুধীন্দ্রনাথের ভাষ্যের সাহায্যেও। ওদের প্রতীকগুলো আমাদের নয়, তবে পশ্চিমী সভ্যতা যাঁদের মজ্জায় পৌঁছেছে তাদের পক্ষে হয়তো সেগুলি

অভ্যস্ত। তবু যেন আঁতে ঘা দেয় না। মালার্মের কবিতা আমার পক্ষে একপ্রকার বুদ্ধির কুস্তি। সিম্বলিক কবিতা ভাবার্থ অতিক্রম করতে যায়, সুরের সাহায্যে। ফরাসী ভাষা জানি না, অতএব ফরাসী শব্দের অনুরণন কানে ধরা পড়ে না। বিদেশী সুর ও হার্মনিও ধরতে পারি না সব সময়। অতএব আমার পক্ষে বিদেশী প্রতীকী কবিতা মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করা মুশকিল। তবু অদ্ভুত একটা কিছু মালার্মে লিখেছেন, আন্দাজ করতে পারি।

সুধীন্দ্রনাথের সনেটের হাত অতুলনীয়। ঘন অথচ সুস্পষ্ট। তার একটা শব্দ, একটা বাক্যও বদলানো যায় না। (সে নিজে অবশ্য বদলায়।) এক এক সময় মনে হয় যে, সে গদ্যের প্যারাগ্রাফকেও সনেটের রূপ দিতে চাইছে। তার গদ্য ও পদ্য একই মনের একই ধর্ম মেনে চলে। সকলের বেলায় কি তাই ? খুব সম্ভব তাই হবে। আরো কিছু, যাচাই করতে হবে।

কেদারার মধ্যম—ক'বার যথার্থ মধ্যম শুনেছি ? তিনবারের বেশি মনে পড়ছে না। মম্মন খাঁ'র বড় সারেঙ্গীতে—১৯২৩(?) সালে ; আলাবন্দেনসীরুদ্দিনের মিলিত কণ্ঠে ১৯২৪ সালে ; এবং জোহরাবাঈ-এর রেকর্ডে। বড় গোলাম আলির কেদারা রেকর্ডে শুনলাম। চমৎকার, কিন্তু সে-মধ্যম পেলাম না। গোলাম আলির স্বরবর্ণের প্রয়োগ আমার কানে অমধুর। পাঞ্জাবী ঘরানার ঐ এক প্রধান দোষ। হ্রস্ব ই ও দীর্ঘ ঈ, আ এবং ও-তে যাবার পথে 'য়্যা' হয়ে যায়। য়্যার জন্য তান শ্রুতিকটু ঠেকে। অবশ্য ওস্তাদের কণ্ঠ এতই মধুর, তাঁর গায়নপদ্ধতি এতই সুললিত যে দোষটুকু কানে স্থান পায় না। গোলাম আলির গান সামনে বসে, মন দিয়ে,

বহুবার শুনতে হবে আমাকে। যা শুনেছি তাতে মনে হয়, কপালে রাজতিলক নেই। তবু, অপূর্ব কণ্ঠ।

২৪-৭-৫৫

শুমপীটার-এর 'History of Economic Analysis' গত বছরে পড়েছি। আবার পড়ছি। ভীষণ মোটা, অত্যন্ত দামী—তিন মাস লেগেছিল পড়তে। গ্রীষ্মের ছুটির পর নানা রিভিউ পড়লাম। আমার মনে যে দানা বেঁধেছে, তা নিয়ে মালা গাঁথা যায় না। তবু বলা চলে :

(১) সম্পাদনার কৃতিত্ব অতুলনীয়। ভদ্রলোকের স্ত্রীভাগ্য ভালো। এই উপায়েই কি এপিক তৈরি হতো ?

(২) সবচেয়ে ভালো লাগলো তৃতীয় খণ্ড (১৭৯০—১৮৭০)··· ক্ল্যাসিকাল পীরিয়ড এবং চতুর্থ খণ্ড (১৮৭০—১৯১৪)—ইকনমিক্স যে যুগে স্বাধীন হলো।

(৩) প্রতি যুগের ইকনমিক্সের ইণ্টেলেকচুয়াল কণ্টেক্সট-এর বিবরণ অপূর্ব। স্টার্ক-এর দু'খানি বইতে খানিকটা পেয়েছিলাম, কিন্তু এমন বিশদভাবে নয়। শুমপীটার উপদেশ দিতেন সকলকে ইকনমিক্সের বিশেষ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকতে, আর নিজে উল্টো কাজ করলেন। এইটাই তাঁর মাহাত্ম্য। অর্থনৈতিক ও মানসিক ইতিহাস বাদ দিয়ে ইকনমিক ধারণা বা চিন্তাগুলি বোঝা যায়

না। কেবল তাই নয় তার বিশ্লেষণ পদ্ধতিও হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

(৪) জেভেন্স ওয়লরা, প্যারেটো, বম-বোয়র্ক সম্বন্ধে আলোচনা চমৎকার ; একটু ভক্তিরস বেশি বটে, তবু··· !

Ten Great Economists-তে—এই আভাস ছিল।

সন্দেহ উঠলো গোটাকয়েক বিষয়ে। (১) কে এই মোটা বই অত দাম দিয়ে কিনে পড়বে ? গোটাকয়েক অধ্যায়ের জন্য তাঁরই আগেকার Economic Doctrines and Method (ইংরেজী অনুবাদ) বেশি উপকারী। এ যেন একটা বিরাট জঙ্গল। (২) প্লেটো, আডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর প্রতি অবিচার হয়েছে আমার বিশ্বাস। (৩) শেষাংশ অসম্পূর্ণ, খাপছাড়া। তিনি নিজে সংশোধন করতে পারেননি। (৪) আমি প্রত্যাশা করেছিলাম, 'টুল্‌স্ অফ্ অ্যানালিসিস'-এ ক্রমবিকাশ দেখতে পাবো। তৃতীয় খণ্ডের মার্জিনাল অ্যানালিসিস ছেড়ে দিলে, চতুর্থ খণ্ডের ইকুইলিব্রিয়ম বর্ণনাতেই যেন সব কিছু ভরা রয়েছে। শুমপীটার চাইতেন ইকনমিক্স পদার্থবিদ্যার মতন শুদ্ধ ও সাধারণ বিজ্ঞানে পরিণত হোক। তাই তাঁর মতে ওয়লরা হলেন সবচেয়ে বড় অর্থনীতিজ্ঞ। ঐ হিসেবে সত্য, কিন্তু অন্য হিসেবও আছে নিশ্চয়। এতদিন কি পৃথিবীর অর্থনীতি ওয়লরার জন্য অপেক্ষা করেছিল ? সেই প্রকৃতি-বিজ্ঞান আর সমাজ-বিজ্ঞানের পার্থক্যের কথা আবার ওঠে। আমার মতে, যতদূর পারা যায় ততদূর পর্যন্ত পদার্থ-বিজ্ঞানের যুক্তিপদ্ধতি চলুক ; তারপর যাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে, তাদের গ্রহণ করতেই হবে কর্মক্ষেত্রে। তবে জীবন স্বল্প, আর্ট দীর্ঘ, আর বিজ্ঞানগুলোও জটিল। মানুষ কোথায় ? মানুষ ধরলে অনিশ্চিত, vague অথচ বাস্তব ; মানুষ বাদ দিলে

নিশ্চিত, বিশুদ্ধ অথচ অবাস্তব। অবশ্য একটা না একটা ক্ষণে নির্বাচন করতেই হবে। ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে এই বইখানির সার্থকতা মানসিক ইতিহাস-প্রস্তুতির দিক থেকে, অবশ্য যদি তারা পড়ে কিংবা পড়তে পায়। আমার কাছে বইখানি মহামূল্যবান। ঘুরে ফিরে এখানে আসতেই হবে আমাকে। আসবো নিশ্চয়, কিন্তু শুমপীটার যাকে 'হিস্ট্রি' বলেন, অর্থাৎ the steady march towards the divine event of Walrasian analysis, তার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস না নিয়ে। শুমপীটার ছিলেন মস্ত ইকনমিস্ট, দিগ্‌গজ পণ্ডিত, সর্বপ্রকার বিদ্যায় বিশারদ। কিন্তু তাঁর ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণায় আমি সায় দিই না।

মানুষ এতদিনে দুটো বিদ্যা অর্জন করেছে—গণিত আর ইতিহাস; এবং সেই দুটোর সমন্বয়ের প্রয়াসের নাম 'ফিলজফি'। আমাদের দর্শন কিংবা মিস্টিসিজম্ ঐ দুটোর অতিরিক্ত, কেননা তার কালপ্রভায় নেই, বুদ্ধিপ্রত্যয়ও নেই। অতএব শুমপীটারের দোষ নেই। দোষ কারো নয় গো শ্যামা···। এই কি পূর্ব-পশ্চিমের তফাত? জানি না। কুমারস্বামী বলেছেন, সেদিন পর্যন্ত একটা সাধারণ গুঢ়তত্ত্বের ঐতিহ্যে মিল ছিল। মিলের চেয়ে গরমিলই চোখে পড়ে আজকাল। গ্রীক-রোমান-জুডাইক ভাব-পরম্পরার ওপর যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রভাব, আর আমাদের হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান পরম্পরার ওপর ঐ নতুন সভ্যতার প্রভাব—দু-এর মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। পার্থক্যে ভয় কিসের? ইম্পিরিয়ালিজম্ তো যেতে বসেছে। আপাতত 'কো-এক্সিস্টেন্স' তো হোক, পরে দেখা যাবে। ভারতবর্ষের কাজ অপক্ষপাত সমালোচনা-মূলক, নিউট্রাল নয়। ভারতবর্ষ হচ্ছে একপেশে মনের gadfly.

কী আশ্চর্য! পড়ছি অর্থশাস্ত্র, আর ভাবছি মানুষের কথা!

ইকনমিস্ট হওয়া ধাতে বসলো না। ওধারে হাইড্রোজেন বোমা, আর হাতে গুমপীটার কিংবা ইকনমিক জার্নাল! ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপকমশায়ের কি চমৎকার মূল্যজ্ঞান! কত হাস্যকর মূঢ়তা!

২৫-৭-৫৫

অসহ্য গরম ও গুমোট। পূর্বাংশে বন্যা, আর পশ্চিমাংশে অনাবৃষ্টি। এদেশে মার্কসিস্ট ব্যাখ্যা অচল। এখানে ভৌগোলিক ব্যাখ্যাই উপযুক্ত। মনের ওপর আবহাওয়ার এতটা প্রভাব, প্রভাব নয় প্রতাপ, জানতাম না। এটাওয়া প্রোজেক্টের মায়ার সাহেব একবার বলেছিলেন, 'এদেশে কোনো কিছুই সম্ভব হবে না, যতদিন পর্যন্ত না প্রতি গ্রামে ঠাণ্ডা-ঘরের বন্দোবস্ত হয়; গান্ধী-চবুতরায় চলবে না। মানুষের রস-কষ শুকিয়ে যায় তাপের চোটে।'

আবহাওয়া থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য পড়ি। ক্যাসিরারের 'ফিলজফি অফ সিম্বলিক ফর্মস'-এর দ্বিতীয় খণ্ড—মিথিকাল থিঙ্কিং আরম্ভ করেছি। মিথ ও ধর্মের কালপ্রত্যয় নিউটনীয় নয়—তার মধ্যে পরম্পরা নেই, অর্থাৎ সীকোয়েন্স-এর বিপরীত। একত্রে সব ঘটছে এবং 'স্পেস'-এর সঙ্গে একত্রে। আইনস্টাইনের মন

এই হিসেবে মিথিকাল, প্রায় আদিম। পারম্পর্য নেই, অথচ গভীরতা ও মাত্রা আছে। হিন্দু দার্শনিকদের কাছে কাল চক্রবৎ, অথবা ক্ষণিক ইত্যাদি। ধর্মবিশ্বাসের বেলায় পারম্পরিক, যথা ব্রহ্মার মুহূর্তে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। কালের শ্রেষ্ঠ 'সিম্বল' মহাকাল। সেইজন্য পশ্চিমী ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এদেশে ইতিহাসের প্রাণবস্তু নয়। যুগান্তর, যুগাবতার, যুগধর্ম হলো আমাদের সমাজের ম্যাক্রো-ডাইনামিক্স—আর মাইক্রো হলো অতিকথা, উপাখ্যান, রূপকথা—যেগুলি প্রতি মানুষের ব্যবহারকে আদর্শ নমুনার ছকে টেনে আনে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমাদের ইতিহাসের মালমশলা ভিন্ন। আমি বলি, আমাদের ইতিহাসের কাল-প্রত্যয়ই ভিন্ন। অন্তত এতদিন তাই ছিল। বোধ হয় গ্রামের ইতিহাসে এখনও খানিকটা তাই পাওয়া যায়। সেখানেও বদলাচ্ছে যন্ত্র ও শহরের আশীর্বাদে। পরিবর্তন সহজ হচ্ছে না। সর্বত্র তাই বাধ-বাধ ঠেকছে।

নতুন বাঙালী কবি যখন ইতিহাসের পর্যায় সম্বন্ধে কবিতা লেখেন তখন ঠিক রসসিদ্ধ হতে পারেন না কি এই আন্তরিক বিরোধের জন্য? মিথিকাল, ধর্মের যুগ হলো মাইথোপিইইক,—কবিতার পক্ষে উপযোগী, আমাদেরও অভ্যাস-সুলভ। নতুন যুগ হলো নিউটনীয়, অনুক্রমিক, স্বতন্ত্র। অতএব কবিতার পক্ষে ততটা উপযোগী নয়, বিশেষত আমাদের মনে ধরে যে-কবিতা সে-কবিতার পক্ষে ততটা নয়। অবশ্য পরিবর্তনের পরে সবই অভ্যাস হয়ে যাবে। এখনও হয়নি, যোগাড় চলছে।

অর্থনীতিক পরিকল্পনার কাল-প্রত্যয় ক্ষণিক-বাদ নয়। তার অ্যাপ্রোচ যেকালে সমষ্টি-বাচক, তখন তার ইউনিট হবে প্রোডাকসন ফেজিং ও তার গতির হার নির্ধারিত হবে যন্ত্রপাতি

ও মানুষের কার্য-সম্পাদিকা শক্তি এবং জিনিসপত্রের অবারিত গতি ও কাজে লাগানো—এই দুটির সমন্বয়ের ওপর। সমন্বয়কে বলা যেতে পারে ব্যবস্থাপনের আকার বা দিক। কিন্তু তার অন্তরের প্রত্যয় এক বিশেষ অনুক্রম ও পারম্পর্য। অর্থাৎ ভিন্ন কাজের গ্রুপ-এর ভিন্ন সময়: এবং সেই গ্রুপ-টাইমিং অনুসারে অংশ বিশেষকে চলতে হবে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অথরিটির কাল ঐ ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ-টাইমিং-এর সামঞ্জস্যে। তারও বাইরে আর একটি কাল আছে—সেটি জাতীয় প্রয়োজনের। অর্থনীতিবিদ্‌রা একে রাষ্ট্রিক কারণ বা প্রয়োজন বলে অবহেলা করেন। জাতীয় প্রয়োজনের সময়কে আবার আন্তর্জাতিক অবস্থা (এখানে ব্যালেন্স অফ পেমেণ্টস্ ইত্যাদির কথা ওঠে) ও জগতের ঐতিহাসিক গতির কাল-প্রত্যয়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারলে মাত্র নতুন ব্লক তৈরি হবে। ব্লক-এর মানে হচ্ছে ইতিহাস থেকে কোনো কারণে ভ্রষ্ট হওয়া। প্ল্যানিং-এর মধ্যে অনেকগুলি কাল-প্রত্যয় লুকিয়ে থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস সেগুলিকে বাইরে টেনে আনে: চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাদের যোগাযোগ ঘটান—অন্তত চেষ্টা করেন। আমাদের ইতিহাসে পণ্ডিত নেহরু শেষ দুটি কাল-প্রত্যয়ে সিদ্ধ। প্ল্যান-ফ্রেমে প্রথম দুটির সন্ধান পেয়েছি।

প্ল্যানিং-এর সাইকলজি গেস্টল্ট সাইকলজি। কালেরও একটা গেস্টল্ট আছে। ক্ষেত্র, উদ্দেশ্য, জীবনের মাত্রা, প্রত্যাশা, উদ্দেশ্য, সন্ধান ইত্যাদি প্রত্যয়ের সাহায্যে সোশ্যাল টাইম-এর প্রকৃতি ও কাজ বোঝা সহজ। কর্ট লিউইন, প্যাভ্‌লভের দৌড় অতদূর নয়। তাঁদের রাস্তাই আলাদা। ফিল্ড সাইকলজি এসেছে পদার্থ-বিজ্ঞানের ফিল্ড থিওরী থেকে। তাই তার ঘাড়ে অঙ্ক ও পরীক্ষার ভূত। একবার দুঃসাহসী হয়ে ফিল্ড সাইকলজির মোটা মোটা

সিদ্ধান্তগুলি সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে খাটাতে যাই। দু-তিনটি বক্তৃতার পর বিদ্যাবুদ্ধির শেষ। ছাত্রদের সাফ্ বলে দিলাম, ওর বেশি জানি না। পরে চেষ্টা চলছে দেখলাম। একবার ছুটি পেলে বেয়ে-চেয়ে দেখতে হবে।

২৭-৭-৫৫

নতুন চিন্তা ও ধারণা নিয়ে বক্‌বক্ না করলে আমার আবার মাথা খোলে না। এখানকার ছাত্ররা ও-ধরনে তৈরি হয়নি; শিক্ষকরাও বোধ হয় না। নিজের সঙ্গেই কথা কইতে হয়। তাই লিখতে শুরু করেছি। ডায়রী নয়, যা মনে আসছে সব তাই নয়, নিজের ব্যক্তিগত বিষয় নয়, অথচ খানিকটা তো তা বটেই। যা মনে আসছে, সেগুলি অনুপস্থিত, বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত, আগ্রহশীল বন্ধুর সঙ্গে নীরব কথাবার্তা। মার্টিন বুবার বলেন, সব কিছুই Thou and I-এর কথোপকথন, সংলাপ। Thou আমার ক্ষেত্রে ডিমন নয়, জীবন-দেবতা নয়, জীনিয়স্ নয়—ভূত নয়, প্রেত নয়, ভগবান নয়; এমন একটি পুরুষ সে—স্ত্রীলোক নয়—যার আগ্রহ আমার আগ্রহের সমগোত্র; হয়তো পুরুষটি আমার বিশেষ বন্ধুদের একটা আলকেমিক মিশ্রণ। তাদের সঙ্গে মনে মনে কথাবার্তা কইছি; লিখছি, কারণ সেই মিশ্রিত Thou-এর কোনো উপাদান

সামনে নেই। এক বই ছাড়া—অর্থাৎ লেখক ছাড়া এবং তাঁরাও নীরব। ক্যাসিরারের সঙ্গে কফি খেলে বেশ লাগতো। ভদ্রলোক অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। কে একজন লিখেছেন, বর্তমানকালের অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে শুমপীটার ছিলেন সেরা কথা কইয়ে। আলাপ করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আমার অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে ভালো কথা-কইয়ের তালিকা: রবীন্দ্রনাথ, নাটোর, সাহেদ স্থরওয়ার্দি, অমৃতলাল, প্রমথ চৌধুরী, শরৎদা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন, হারীতকৃষ্ণ দেব, হিরণকুমার সান্যাল, শিশির ভাতুড়ী—নামজাদাদের মধ্যে। লক্ষ্ণৌ-এ অনেক পেয়েছি। অজানাদের মধ্যে কত! এঁরা আড্ডা জমাতে পারতেন। সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে এক ভাতখণ্ডেজী আর অমিয় সান্যাল। কিন্তু ওস্তাদদের মধ্যে অনেকেই—বিশেষ করে কেরামত খাঁ, হাফিজ আলি, ফৈয়াজ খাঁ। এঁদের wit ছিল অসাধারণ। অবনীবাবুর কথা ছিল খেয়ালী। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ যে কোনো আড্ডা জমাতে পারেন। শরৎদা'র মুখে বলা গল্প ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে, পড়লাম। সবগুলি না হোক, অনেকগুলিই আমার শোনা। ইদানীং একটু গরমিল হতো। বলতেন, ভালো মিথ্যুক হবার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন স্মরণশক্তির, আজকাল একটু কমেছে, তাই ভাবছি বেশিদিন নয়। একদিন আমার বালিগঞ্জের বাড়িতে ৫।৬ ঘণ্টা কাটান। প্রমথবাবুও এসেছিলেন সন্ধ্যায়। কে কবে কোথায় বড় মাতাল দেখেছেন, তারই গল্প চলেছিল প্রমথবাবু একটি য়ুরোপীয়ান মহিলার এবং শরৎদা একটি সাধুর গল্প বলেছিলেন। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে তাঁর বহু গল্প ছিল। একবার বলেছিলেন, তিনি মেয়েদের কাছ

থেকে হাজার চিঠি পেয়েছিলেন, প্রত্যেকটাই নাকি আত্মচরিতের অধ্যায়। পতিতা রমণীর বহু জীবনী তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন। দেখাননি অবশ্য। বলতেন, হারিয়ে গিয়েছে। তবে গল্প শোনাতেন অনেক। তাঁর কাছে স্ত্রী-চরিত্রের দু-তিনটি ছক ছিল। একদিন জিজ্ঞাসা করি, এত কম কেন ? আমার ইঙ্গিত ছিল তাঁর নভেলের স্ত্রী-চরিত্রের বৈচিত্র্যহীনতার প্রতি। তিনি বুঝে বললেন, 'ওদের মধ্যে বৈচিত্র্য নিতান্ত কম, যা পেয়েছি তাই লিখেছি।' আমার এখনও বিশ্বাস শরৎদা বহু স্ত্রীলোক জানলেও মাত্র যে টাইপের স্ত্রী-চরিত্র তাঁর হৃদয়ে আঘাত দিয়েছিল, মাত্র সেই টাইপগুলোকেই 'জেনারেলাইজ' করতেন। এক 'সতী' ছাড়া। ঐ গল্পটি আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছিল বলাতে তিনি নিজে এসে এক কপি উপহার দেন ও আমার স্ত্রীকে ঠাট্টায় বিব্রত করেন। সে যাই হোক, আড্ডা জমাতে পারতেন বটে; তবে তাততে দেরি হতো। মধ্যে মধ্যে একেবারে গুম্ হয়ে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের কথাবার্তার স্তর, ভঙ্গী, সবই ছিল অন্য। এমনটি হয় না, হবেও না। একদিন বলেছিলাম, 'রাত্রে না ঘুমিয়ে কথাগুলি বুঝি সাজিয়ে রাখেন ?' 'না, তার প্রয়োজনই হয় না, পঞ্চাশ বছরের সাধনা ভুলছো কেন ?'

অশ্বিনীকুমার দত্তের হাসি জীবনে ভুলবো না। এক কোজাগর পূর্ণিমার রাত—প্রায় সারারাতই হাসি-গল্পের ফোয়ারা ছুটেছিল। বাঙালীর তাঁকে কি মনে আছে ? মস্তলোক, মস্তলোক, মস্তলোক।

শ্যামবাজারের স্কুলপ্রাঙ্গণে অমৃতবাবুর সঙ্গে কথা কইতে দারুণ ইচ্ছে হচ্ছে।

লক্ষ্ণৌ-এর কথাবার্তায় রম্যতা অনেক বেশি। উর্দু কবিতার জন্যে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন আমাদের কথাবার্তার মধ্যে

ঢুকেছে, তেমনি গালিব, মীর, হালি, আকবর প্রভৃতির বহু কবিতা লক্ষ্মৌ-এর মুসলমান, কায়স্থ, কাশ্মীরীদের মুখে মুখে। গজলের প্রাণবস্তুটাই যেন আলাপ, তাই 'উইট' সহজেই আসে।

৩১-৭-৫৫

বানডুঙ-এর বক্তৃতার জন্য পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কেবল তথ্য-সংগ্রহ করলাম। কিন্তু এ-যুগে কো-অপারেশনের থিওরীর পিছনে রাষ্ট্র-সংক্রান্ত একটা থিওরী থাকা চাই। য়ুরোপে যখন কো-অপারেশন চলতে শুরু হলো, তখন ইংল্যাণ্ডে Laissez faire চলছে, আর জার্মানীতে একপ্রকার আমলাতন্ত্রী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হচ্ছে। ফ্রান্স, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশে রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনো থিওরী ঐ সময়ে কি ছিল? যা কিছু চিন্তা, কেন্দ্র-বিচ্ছিন্ন সোশ্যাল ইকনমি ঘিরেই ছিল। তাছাড়া সামাজিক ও আর্থিক অবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন। তাই কোথাও প্রোডিউসার্স, কোথাও কনজ্যুমার্স কো-অপারেটিভসের প্রসার হলো। এদেশে মাদ্রাজ, বোম্বাই অঞ্চলে যা কিছু হয়েছে, তা প্রধানত রুর‍্যাল ক্রেডিট-এর দিকে। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এখনও ওরই ওপর জোর দিচ্ছেন। ভালো। স্টেট ব্যাঙ্ক তো হলো ঐ জন্যে প্রধানত, কিন্তু গ্রামোন্নতির অন্যদিকে কো-অপারেটিভগুলো কি করছে? রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেষ রিপোর্ট

পড়ে হতাশ হলাম। বরঞ্চ কম্যুনিটি প্রোজেক্ট, ন্যাশনাল এক্সটেনশ্যন সার্ভিস-এ বেশি কাজ হবে। গ্রাম একটা গোটা ও জীবন্ত জিনিস। তাকে গোটাভাবেই দেখতে হবে। এ-যুগে রাষ্ট্রকর্ম স্বেচ্ছাকর্মের অপেক্ষা সক্রিয় ও শক্তিশালী। সামাজিক সমগ্রতার ছবি রাষ্ট্রের আয়নাতেই ধরা পড়ছে আজকাল। পছন্দ হয় না। কিন্তু উপায় কি? বাকুনিন? আই ডু নট ওয়াণ্ট টু বি আই, আই ওয়াণ্ট টু বি উই? রোমান্টিক!

রাতে কেনিয়ন রিভিয়ুতে দোস্তয়েভ্স্কী সম্বন্ধে একটি চমৎকার প্রবন্ধ পড়লাম। বিশেষত 'দি পসেস্‌ড' নিয়েই আলোচনা। লেনিনগ্রাডের (না মস্কোতে?) একটি ঘটনা মনে পড়লো। প্লেখানভের. আর বে-খাতির নেই দেখে খুশি হলাম, যেমনি দোস্তয়েভ্স্কীর নাম কেউ করে না দেখে রাগ হলো। একজন সাহিত্যিককে বলেছিলাম, 'আবার আপনাদের দেশে আসবো যেদিন দোস্তয়েভ্স্কীকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে উড়িয়ে দেওয়া বন্ধ করবেন। তাঁর মাহাত্ম্যকে অত সহজে এক সামাজিক সূত্রের মধ্যে ফেলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাতে রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। এবার আপনারা তো সামলে উঠেছেন, এবার তাঁর রচনা নিয়ে সাহিত্যালোচনা করুন না?' ভদ্রলোক সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন কোথাও, ঠিক মনে নেই। তিনি অবশ্য রাগেননি, তবে দুঃখিত হয়েছিলেন। এই প্রবন্ধের পাদটীকায় গোটাকয়েক মজার কথা রয়েছে!

Lenin, The Possessed is "repulsive but great," Lunacharsky, he is "the most enthralling" of Russian writers. In a memorial published in 1920

for the hundredth anniversary of Dostoevsky's birth there appears this generous tribute : "Today we read the Possessed, which has become reality ; living with it and suffering with it, we create the novel afresh in union with the author. We see a dream realised and we marvel at the visionary clairvoyance of the dreamer who cast the spell of Revolution on Russia……"

অবশ্য মত বদলাবেই। আমি কিন্তু ভাবছি, দেশ যদি সমাজ-তন্ত্রীই হয়, তবে কি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে ত্যাগ করবো, তাঁদের কথা ভুলে যাবো, তাঁদের যারা নাম করবে তাদের গালাগালি দেবো ? তাহলেই গিয়েছি আর কি ! কিছুদিন আগে বেশ ভয় হয়েছিল।

বৃষ্টি পড়ে উঠোনের নিমগাছ গন্ধে ভরপুর। টগর-চাঁদনী চক্‌মক্ করেছে। এত দেরিতে, এত রাত্রে বেলা কেন ?

১১-৮-৫৫

গত দশ বারো দিন বক্তৃতা তৈরি করতে ব্যস্ত ছিলাম। পছন্দ হলো না, বিস্তর ঢিলেঢালা ফাঁক রয়েছে। এখানকার লাইব্রেরীতে

রিপোর্ট খুব কম আসে। আগে থাকতে বিশেষ পরিচয় থাকলেও, একটা বিষয় সম্বন্ধে পঞ্চাশ মিনিট বক্তৃতা দিতে আমার অন্তত সাত-দিনের প্রস্তুতি চাই এখনও। লোকের ধারণা আমি খুব নির্বাধ-ভাবে বলি, লিখি ও যে কোনো বিষয়ে কথা কইতে পারি। কিন্তু আমি জানি আমাকে সেজন্য কতটা খাটতে হয়েছে ও হয়। সময় পেয়েছি অনেক—আমি জীবনে ব্রিজ পর্যন্ত খেলিনি। সময় কাটাবার উপায় থাকলে হয়তো সময় পেতাম না। তবু আমার মানসিক পরিশ্রমের মধ্যে বিস্তর গলদ রয়েছে। লোকে যাকে 'অর্গানাইজেশান' বলে, সেটা আমি কখনও শিখিনি। এটা চরিত্রের দোষ। অর্গানাইজেশান দুই ধরনের—এক, ব্রাহ্মণেরা যেভাবে সমাজ বেঁধেছিলেন, আর এক যাকে বৈশ্যবৃত্তি বলা চলে। সমবার্ট 'ক্যাপিটালিস্টিক স্পিরিট' বা পুঁজি-বাদের এক অর্থ 'র‍্যাশনালিস্ট' দিয়েছেন। সেটা দাঁড়ায় 'অ্যাকাউন্টিং'-এ। এই হিসেবের মধ্যে যে বিন্যাস-ধর্ম আছে, আমার সেটাও নেই। ব্রাহ্মণবৃত্তি তো দূরের কথা। অথচ প্ল্যানিং-এ আমি একান্ত বিশ্বাসী—যার মূল ধর্ম হলো যুক্তিবত্তা আর প্রধান যন্ত্র জাতীয় হিসাবকরণ। সমাজের, অর্থবিন্যাসের বেলায় প্ল্যানিং আর নিজের বেলায় অব্যবস্থা। বোধ হয় বৃদ্ধি বা বিস্তার আর বিকাশ বা অভিব্যক্তি, দুটি পৃথক জিনিস। একটি জৈব, অন্যটি মানবীয় বুদ্ধিসর্বস্ব—র‍্যাশনালিটির চরম কথা অন্তত এই যুগে তো তাই- অন্য যুগে ভিন্ন অর্থ ছিল।

লেকীর 'হিস্ট্রি অব্ র‍্যাশনালিজম' বইখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। দেখে চিনতে পারলাম না, অর্ধেক পাতাই নেই। লেকী কি লিখেছেন ঠিক মনে নেই। নিজেই চিন্তা করা

যাক। এই রকম একটা নক্সা মনে ভাসছে—সেইটে সাজিয়ে গুজিয়ে যদি অন্য কেউ লেখেন, মন্দ হয় না। 'রীজন' বা বিচার-শক্তি হলো মুখ্যত গ্রীক, পুরোপুরি নয়। ভারতীয় ভাব। অবরোহ প্রণালীর জ্যামিতিক যুক্তি (ইউক্লিড ও আলোকজাণ্ড্রিয়া)। অ্যারিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্র। (পুরানো গ্রীক ডায়েলেক্টিক নির্লোপ হলো কেন ?) সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের চেষ্টা, প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসের সমন্বয় করবার। আমাদের বৌদ্ধ ন্যায়, শঙ্কর, রামানুজ, কারুরই 'পীওর রীজন' নয়, আবার 'ডিভাইন রীজনও' নয়। তবে একটা মিল থাকতে পারে। য়ুরোপের মধ্যযুগে ও ফরাসী বিপ্লবের সময় রীজন হচ্ছে প্রকৃত নিয়ম বা আইনের সিদ্ধান্ত। আমাদের, কর্মের দুর্বার ফল। কান্টের প্রথম বক্তব্য ও দ্বিতীয় বক্তব্য বিপরীত। কাণ্ট ও রুশো—এদের মূলগত পার্থক্য কম। এ দুই-ই কার্টেজিয়ন রীজন-এর বিপক্ষতার ইতিহাস এবং দুটোই এথিকাল রীজন বা নীতির ন্যায়। অযৌক্তিকতার ইতিহাস শুরু হলো রুশো থেকে নয়, জার্মানির রোম্যাণ্টিক মুভমেণ্ট থেকে। চলছে জাতীয় চরিত্রনীতি থেকে বর্তমান "ঠাণ্ডা যুদ্ধ" পর্যন্ত। নীট্‌শে-লরেন্স সংবাদ। বিচার এবং বিশ্লেষণ—অর্থাৎ সংশয়ের দর্শন—ডেকার্ট থেকে ব্যালফোর পর্যন্ত। এই অধ্যায়ে হিউমের স্থান অনেকখানি জুড়ে রয়েছে। তারপর শেষে আসছে বিচার এবং আধুনিক বিজ্ঞান। মোট কথা যা দাঁড়াচ্ছে, তা এই : র‍্যাশনালিজম হচ্ছে হিউম্যানিজমের সব চেয়ে বর্ধিত রূপ ; বিপরীতটা নয়। তারপর র‍্যাশনালিজমের সীমা-জ্ঞান। এখানে অনেককেই আনতে হবে। ভারতীয়দের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দকে নিশ্চয়। এই জ্ঞান অ-যুক্তির নয়। তবে ভারতবর্ষে এক হয়ে যাবার ভয় আছে।

কিছুদিন আগে E. A. Preyre নামে ফরাসী লেখকের 'দ্য

ফ্রীডম অব ডাউট' বলে একখানি ভালো বই পড়ি। ইনি প্রাকৃত সংশয়বাদীর চিন্তা নিয়ে নিজের মানসিক অভিব্যক্তির ইতিহাস লিখেছেন। এঁর কাছে সংশয় হলো নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক দর্শন। চমৎকার চমৎকার উদ্ধৃতি আছে বইখানায়। আমাদের দর্শনের নেতিবাদ ভদ্রলোক জানেন না কেন, বুঝলাম না। একজন কাশীর পণ্ডিতের কাছে 'ন' কথাটির চমৎকার ব্যাখ্যা শুনেছিলাম। আমাদের নব্য ন্যায়ের 'অ' সদ্‌ভাবাত্মক। যেমন ননভায়োলেন্সের 'নন্‌' শব্দটি গান্ধীজীর মতে।

সন্দেহবাদ সম্বন্ধে আমার নিজের মানসিক স্থিতিটা কি? দুটি মন্তব্য মনে আসছে। শ্রীঅরবিন্দ আমার বিষয়ে (বোধ হয় দিলীপকে) একবার লিখেছিলেন, "Dhurjati, like a good chimney, is burning his smoke.' এখনও কিন্তু ধোঁয়া যায়নি। আর শ্রীকৃষ্ণপ্রেম (নিক্সন) একবার আমাকে বলেছিলেন, Ever since I knew you, you have been standing on the brink. কৃষ্ণপ্রেম আমার বহু পুরাতন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। এখনও সেই মাটির শেষ কিনারায়, পার্থিব সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছি। এটা বুদ্ধির দম্ভ, মনুষ্যত্বের আত্মগরিমা এবং সবটা অজানার ভয়ের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু এতে লজ্জা পাই না। জানি আমার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড়। জানি তার অতিরিক্ত প্রকাণ্ড আকাশ। সেখানে এই জীবনের অনুমান-পরিমাণ অচল। তবু সেখানেও এই বুদ্ধিরই প্রসার চাই। অন্য যন্ত্র, অন্য উপায় নেই। অনুভূতি? কে তাকে অস্বীকার করছে? কিন্তু অনুভূতিরও আইন-কানুন আছে। সেটা অনুভূতি আবিষ্কার করবে না,—করবে ও করছে এই বুদ্ধি, যেমন অণু-পরমাণুর ক্ষেত্রে। ঠিক এই বুদ্ধি না হলেও

মার্জিত বুদ্ধি। তবু বুদ্ধি—অনুভূতি নামে পৃথক বস্তু নয়। অতএব সংশয়ের অর্থ বুদ্ধির মার্জন-ক্রিয়া বা পদ্ধতি মাত্র। তারপর ?

তারপর জানি না। তারও পরে আমার কৌতূহল নেই। মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই ভালো। পাইলেট-এর মতন মুখ ফেরানো নয় বুদ্ধের মতন।

১৮-৮-৫৫

জাকর্তা শহরে রাত কাটালাম। জাকর্তা প্রকাণ্ড শহর। খুব চওড়া রাস্তা, ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রায় প্রত্যেকটাই শুনলাম ডাচ্ কোম্পানির। ডাচেদের কাছ থেকে ওরা পরিচ্ছন্নতা শিখেছে। প্রকাণ্ড হোটেল, পৃথক পরিবারের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত। এক একটি স্যুইট-এর সামনে ছোট বারান্দা, ফুল ও লতাপাতায় সাজানো। সবই য়ুরোপীয়ান প্রায়, দু'চারজন দো'আঁশলা। সামনের হল্-এ তিনজন ডাচ্ ও একজন দো'আঁশলা ডাচ্ জিন্ খাচ্ছে। একজন আমাকে দেখে "নেহরু নেহরু" বলে চেঁচিয়ে উঠলো। মাত্রা একটু বেশি হয়েছিল। আওয়াজে বিদ্রূপ ছিল সন্দেহ হলো, তাই সটান তার সামনে দাঁড়ালাম। ডাচ্ ভাষায় কি বক্ বক্ করলো। খানিক পরে বেসামাল হতে বন্ধুরা ধরে মোটরে তুলে দিলে। সন্দেহ হলো লোকটি দেশ স্বাধীন হতে

সুখী হননি এবং নেহরুকে সেই জন্য দায়ী করছেন। এই ধরনের "চীজ" আমাদের দেশেও সেদিন পর্যন্ত ছিল। তবে আমার সন্দেহটা নিতান্ত অকারণ হতে পারে। আমার মাথার টাক নেহরুর মতন আর ধুতি-পাঞ্জাবি ও রঙিন চশমা পরলে রাজাজীর মতো দেখায়, অনেকেই বলেছেন। রানিখেতের রাস্তায় দূর থেকে শ্রীচণ্ডুলাল ত্রিবেদী রাজাজী বলে ভ্রম করেছিলেন; এলাহাবাদের প্রধান বিচারপতি শ্রীবিধু মল্লিক মোটর থেকে নেমে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার পর তাঁর ভুল ভাঙে। রামানন্দবাবুকে রবীন্দ্রনাথ বলে ভুল করেছিল, তিনি লিখেছিলেন। ফলে তাঁকে দেশবাসীর কাছে ঠাট্টা ভোগ করতে হয়েছিল। তবে হল্যাণ্ডে আমি ঐ ধরনের অনেক "চীজ্" দেখেছি। তাঁরা দেশ স্বাধীন হবার পর দেশত্যাগী হয়েছেন—অবশ্য কোটি কোটি টাকা সরিয়ে ফেলে। এ ধরনের ভারতবাসীর সংখ্যা বিলেতে নিতান্ত কম—নেই বললেই চলে। অবশ্য ভারত ইংরাজের অধীনে ছিল দেড়শ' বছর, আর এরা ডাচের অধীনে ছিল তিনশ' বছর। দোকান পসারের ওপর এখনও ডাচ্ লেখা। গাছপালা, আবহাওয়া, আর অবশ্য চেহারা ছাড়া মনেই হলো না এশিয়ার কোনো শহরে রাত কাটালাম। অথচ হাওয়াই বন্দর থেকে বেরুতে এত দেরি হলো যে, মজ্জায় মজ্জায় বুঝলাম এ দেশ এশিয়ারই মধ্যে। খাওয়ার পর শহরে কিছুক্ষণ ঘুরলাম। রাতে প্রত্যেক শহরই সুন্দর দেখায়। বিকেলে বৃষ্টি হয়েছিল, তাই আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। গাছের পাতা থেকে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ছিল। মস্ত মস্ত পাতা। রাত বারোটা পর্যন্ত রাস্তায় মোটরের ভিড়। রাতে ঘুম হলো না। শরীর ভীষণ ক্লান্ত।

১৮-৮-৫৫ (বিকেল)

ভোর বেলায় বানডুঙ যাত্রা। চল্লিশ মিনিট লাগলো পৌঁছতে। ট্রেনে লাগতো ঘণ্টা চারেক। বানডুঙ পাহাড়ের উপর সমতল-ভূমিতে। প্রায় হাজার চারেক ফুট উঁচু। আসবার পথ অপূর্ব সুন্দর। শহর একদম বিলেতী। দোকান-পশার, বাস, ট্রাম, মোটর, ট্যাক্সী, হোটেল, রাস্তা, গতায়াত, মায় আবহাওয়া পর্যন্ত, সব বিদেশী। তিন দিন ধরে স্বাধীনতা দিবস পালন করছে—প্রতি বাড়িতে পতাকা ঝুলছে। আমাদের দেশ জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে উদাসীন। আগেও লিখেছি, এখনও লিখছি আমাদের পতাকার পরিকল্পনা দুর্বল। যে সব রঙের সমাবেশ হয়েছে পতাকায় তাদের প্রতীক-মূল্য জীবন্ত নয় জনসাধারণের কাছে। এ যুগে, এশিয়ার পক্ষে স্বাধীনতার প্রধান গুণ তেজ। এদের পতাকায় লালটা ডগ্‌ডগে। আমাদের শাদা রঙ 'এক্‌লেক্টিক', পবিত্রতার চিহ্ন নয়। চক্রের রঙ খোলে না ঐ সমাবেশে। হয়তো কেন নিশ্চয়ই, আমাদের পতাকার রঙ-এর ও চক্রের নিগূঢ় অর্থ আছে। কিন্তু যারা জানে তাদের কাছে, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে, কিন্তু জনসাধারণ বোধ হয় সিম্বলের চেয়ে ইমেজ-ই চায়। ইমেজ সহজ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ। আমাদের পতাকায় সিম্বল আর ইমেজের মিলন হয়নি, তাই মিন্‌ মিন্‌ করে। তার ওপর খদ্দর—তাই ঝুলে পড়ে, পৎপৎ শব্দে হৃদয় আলোড়িত করে না।

প্রকাণ্ড হোটেল—একেবারে নতুন ডাচ্ ধরনের। অসম্ভব খরচ, অসম্ভব শোভা। নাচ-ঘর, খাবার ঘর প্রকাণ্ড। দেয়ালে নতুন শিল্পীদের ছবি টাঙানো বিক্রির জন্যে। আলোর সমাবেশ সুন্দর; ল্যাম্পগুলি দেশী; আর কাঠের কারুকার্য কল্পনাতীত। একটু জবড়জঙ, তিলমাত্র ফাঁক নেই। একেবারে ভরাট, দ্রাবিড়ী। প্রাচুর্য যৌবনের চিহ্ন, রিনেসাঁস যুগের ইটালিয়ান দরজাতেও ফাঁক নেই। তারপর ব্যারোক্—প্রৌঢ়ত্ব—চেলিনির সল্ট-সেলার (নিমকদান)—পঞ্চদশ লুই-এর কমোর্ড, ফ্রাজোনার্ড, বুশেযারের ছবি। তারপর রকোকো—বার্ধক্যে যৌবন আনবার প্রাণপণ প্রয়াস। সব অবস্থাই চিদাম্বরমের নটরাজের মন্দিরে দেখেছি। ভার্সাইয়ে—ফনটেনব্লোর ছাতের ছবিতে মার্জিত রুচির লক্ষণ পাইনি। ভারতবর্ষের শিল্প-ঐতিহ্য যে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, তাইতে একরকম বেঁচে গিয়েছি। পরম্পরার বিপদ অনেক। এ-যুগে একটার বদলে দশটা বিরলা মন্দির স্থাপিত হলে কি হতো। ভাবলে হৃৎকম্প হয়।

অতিরঞ্জনেও রুচি চাই: আবুর জৈনমন্দির, রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা', লক্ষ্ণৌ-এর আলাদিয়া খাঁ'র তান, আর যবদ্বীপের কাঠের কাজ ও পুতুল। রুচিবিহীন অতিরঞ্জন: আমাদের যাত্রা অভিনয়, কোনো কোনো ঘরোয়ানার (নাম নাই করলাম) তানবাজি আর লয়কারি, হিন্দী ফিল্ম, দিল্লীর বিরলা মন্দির, বাঙলা ভাষায় বহু অচল প্রেমের কবিতা, আর মস্কো শহরের মেট্রো স্টেশন।

১৯-৮-৫৫ (বিকেল)

তিন দিন স্বাধীনতা-দিবসের জন্য ছুটি। এখানকার ছুটি আমাদের দেশেরই মতন—কথায়-কথায়, প্রতি পার্বণে এবং পার্বণও হাজার রকমের। চ্যাডউইক নামে এক ইংরেজ এসেছেন একই কাজে। চিরজীবন নাইজিরিয়ায় কাটিয়েছেন, এখন ম্যানিলায় কম্যুনিটি প্রোজেক্টের ভারপ্রাপ্ত। খাসা লোক। আফ্রিকাকে ভালোবাসেন, তাঁর জীবনশক্তিতে, পৌরুষে আস্থাবান এবং নাইজিরিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত হয়েছে বললেন। কলোনিয়াল সার্ভিস-এর উৎকৃষ্ট নমুনা। জনসাধারণের শক্তিতে অগাধ বিশ্বাস। অনেক দৃষ্টান্ত দিলেন। গ্রাহাম গ্রীন-এর নায়ক নন। একটা রিকশ' চড়ে দু'জনে শহর ঘোরা গেল। ট্যাক্সী চড়ার পয়সা দু'জনের কারুরই নেই। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা। এশিয়ার নেতা ইত্যাদি। হার্পারেরও তাই মত। অত্যন্ত নরম হয়ে বিনয়ভরে আপত্তি জানালাম। বললাম, "এখনও আমরা বেশি কিছু করে উঠতে পারিনি, তবে চেষ্টা করছি। ভুল হচ্ছে, তবু যেন মনে হয় একটা জাগরণ, একটু যৎসামান্য আত্মবিশ্বাস এসেছে।" দু'জনেই বললেন, 'এ কথা তো অন্যে বলে না—একা ভারতবাসীই বলতে পারে!' আমি তো হতভম্ব। ফিলিপিন অঞ্চলে পণ্ডিতজীর খাতির কম—আমেরিক্যান প্রেসেরই জন্য।

রাস্তাঘাট বানডুঙের সব বিলেতী। মেয়েরা সারঙ পরছে না—একদম আধুনিক। দেশী ও পুরানো রুচির মধ্যে ঐ যা ফুলের শখ। এখানকার শপিং সেণ্টার ঠিক যেন রটারডামের অনুকরণ। নতুন ডাচ্ ধরনের দোকান—প্রকাণ্ড, অত্যন্ত শৌখীন। বলে এরা প্যারিস, কিন্তু প্যারিস অত সাজানো ছিমছাম নয়। মানুষের গায়ের রঙ কালো, ঠিক কালো নয়, শ্যামবর্ণ! আর নাক খেঁদা যদি না হতো মেয়ে-পুরুষের, তবে বোঝা যেতো না ডাচ্ প্রভুরা চলে গিয়েছেন। তাঁরা গিয়েও যাচ্ছেন না। ওঁদের প্রতি এঁদের মনোভাব বিষাক্ত। বহু প্রমাণ এই কয় ঘণ্টায় পেলাম। দেশের একাংশ তাঁরা এখনও ছাড়ছেন না, দেশে লুকিয়ে লুকিয়ে ঝগড়া বাধাচ্ছেন, এমন কি অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়ে। য়ুরোপীয়ানদের এঁরা বিশ্বাস করছেন না একেবারেই। য়ুরোপীয়ানরাই বললেন। আভ্যন্তরীণ গোলমাল চলছে। দেশের ভেতরে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয় শুনলাম। কনফারেন্সের প্রতিনিধিরা গ্রাম দেখতে গেলেন, সঙ্গে সশস্ত্র পাহারা সমেত জীপ গেল।

গত ক্যাবিনেটের ন্যয়-মন্ত্রীকে পুলিশে ধরেছে নতুন ক্যাবিনেটের আদেশে। অভিযোগ ঘুষ নেওয়া; কেউ বলছেন ব্যাপারটা পোলিটিক্যাল। সত্য-মিথ্যা কে নির্ণয় করবে!

সন্ধ্যাবেলা ফুলযাত্রা দেখলাম। চমৎকার লাগলো। স্বাধীনতা-সংগ্রাম-নাটকের মূক-অভিনয়। সব বুঝলাম না। হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ অপেক্ষা করলো তিন ঘণ্টা, নীরবে। তারপর শোভা-যাত্রা এলো। ভদ্র ভিড়—এমনটি দেখিনি। সকলের হাসিমুখ। এরা সর্বদাই হাসছে। খুব অল্পসংখ্যক লোক দেখলাম, যাদের পোশাক-আশাক গরীবের মতন। বেশ সাজতে জানে মেয়েরা। জাতটা স্ফূর্তিবাজ বলে মনে হয়।

কালাবাজারের পরিচয় পেলাম। শাদা-কালোয় চার-পাঁচ গুণ তফাত। একটা স্যুট আর টাই ইস্ত্রী করতে দশ রূপেয়া নিলে। হোটেলের বয়গুলো পর্যন্ত বলছে, এ-দেশে মানুষ থাকতে পারে না। প্রত্যেক জিনিস মহার্ঘ। যুদ্ধের পরও আমাদের দেশে এত দাম বাড়েনি। শুনলাম, বানডুঙ কনফারেন্স-এর পর এতটা বেড়েছে। জায়গাটা ট্যুরিস্টদের জন্যে। ফি শনিবার হাজার-হাজার লোক নিচে থেকে বেড়াতে আর স্ফূর্তি করতে আসে। এ অবস্থা বেশি দিন চললে সর্বনাশ হবে।

কিউরিও-দোকানে গেলাম। একটিও ভালো জিনিস নজরে পড়লো না। বাজে জিনিসও দামের চোটে ছোঁওয়া যায় না। সব যেন ট্যুরিস্টদেরই জন্যে। বলিদ্বীপের কাঠের কাজ যা দেখলাম, তার মধ্যে না আছে পুরাতনের স্বাদ, না আছে নতুনত্বের আগ্রহ। হতাশ হচ্ছি—ভালো নয়। কারুর কাছে জানবার সুযোগ পাচ্ছি না। যাত্রাটাই বিফল হবে না কি ?

গ্রাম দেখার সুযোগ হলো না। আসতে না আসতেই ডেলিগেটরা গ্রামে বসবাস করতে চলে গেল। সঙ্গে সাঁজোয়া গাড়ি! বারো জন সশস্ত্র সৈন্য! বরবদূর যাওয়া বিপজ্জনক—হাওয়াই জাহাজ রোজ ছাড়ে না। অতএব এটাও গেল। বলিদ্বীপে যাওয়াও বিপজ্জনক। একজন বিদেশী বললেন, 'ওখানে যেতে আপনাকে পরামর্শ দিই না।' এখানকার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম—কেমন যেন নিমরাজি। এখনও দেশে শান্তি আসেনি। মনে হলো, বেশ গোলমাল চলছে। আরেকজন মন্ত্রীকে ধরেছে শুনলাম। বিশ্বাস হচ্ছে না। ভারতবর্ষের ওপর ভক্তি আসছে।

ধরা পড়েনি বলে? না। মানসিংহ অবশ্য এখনও বিরাজমান। তবু নির্ভয়ে প্রায় সর্বত্রই যাওয়া যায়।

এখনও এত ঘণ্টা পরেও ইলেকট্রিসিটি ফেল করেনি। আলিগড়ে দিনে গড়পড়তা তিনবার বর্ষাকালে, শীতের সময় একবার। অতএব এদের কর্মদক্ষতা আমাদের চেয়েও বেশি। তবে বানডুঙ বড় শহর, সাড়ে আট লক্ষ লোক—একেবারে বিলেত। বোধ হয় তার চেয়েও ভালো, বস্তি নেই কোথাও। আঠারো হাজার ডাচ্ এখনও এই শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কর্ম চালাচ্ছেন। একজন ডাচ্ মহিলা থাকলেই যথেষ্ট হতো! শুচিবাই যদি কারুর থাকে তো ডাচ্ মহিলাদের।

এক জার্মান পরিবারের সঙ্গে আলাপ হলো। অত্যন্ত কর্মদক্ষ মহিলা। পনেরো মিনিটের মধ্যে ডিক্টেটারশিপের উপযোগিতার উল্লেখ শুনলাম!

২১-৮-৫৫

গ্রাম থেকে ফিরে এসে সকলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে। এমন পরিপাটি গ্রাম ভূ-ভারতে নেই। ঝক্‌ঝকে তর্‌তরে রঙিন, সুচারু, সুরুচি। একজন বাঙালী ডেলিগেট বললেন, 'এদের রক্তে মাংসে, হাড়ে আর্ট মিশে গিয়েছে। ভারতীয় আর্ট।' শুনে খুশি

হলাম। তবে বেশি দিন নয়। মেয়েরা বিলেতী ঘাঘরাই তো পরছে দেখলাম।

কে একজন হোটেলে এলেন। তিন গাড়ি সশস্ত্র সান্ত্রী প্রহরী আগে—পেছনে সশস্ত্র মোটর-স্কাউট। মিশরের উপ-প্রধানমন্ত্রী। পণ্ডিতজী একবার লক্ষ্মৌ এসেছিলেন। ছু'-তিনদিন পুলিশ পাহারার জ্বালায় অস্থির সকলে। তিনি নাকি ভীষণ চটেছিলেন ঐ প্রকার ব্যবস্থা দেখে। তবে গান্ধীজির মৃত্যুর পর বোধ হয় দরকার ছিল। হয়তো এখানেও দরকার আছে। মধ্য প্রাচ্য থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত সিভিল আর মিলিটারির বিরোধ এবং সেই সঙ্গে মোল্লা জুটেছে। খুব বেঁচে গিয়েছি আমরা। গান্ধীজি প্রাণ দিয়ে আমাদের বাঁচালেন। এ-যুগে এই প্রায়শ্চিত্তের তুলনা নেই। আউঙসানের মৃত্যুও ঐ জাতেরই। এঁরাই প্রকৃত খ্রীস্টান। হয়তো বা বোধিসত্ত্ব।

২২-৮-৫৫

সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত বক্তৃতা; তারপর এক ঘণ্টা প্রশ্নোত্তর। পনেরো মিনিট বিশ্রামের পর পাঠচক্র দেড় ঘণ্টা। আবার আলোচনা চললো ১-১৫ মিনিট পর্যন্ত। একটু ভয় ভয় করছিল, শীঘ্রই কেটে গেল। লেখা বক্তৃতা পড়লাম না, মুখেই বলে গেলাম। মনে হলো খারাপ হয়নি। পূর্বেকার মতো অনর্গল নয়।

বিকেলে শহরে ঘুরলাম। ছবি একখানা। একটাও কি ভাঙা বাড়ি নেই, নর্দমা নেই, একটা বাড়িরও কী রঙ চটে যায়নি! এমন দোকান বোম্বাই-কলকাতাতেও নেই। কারা কেনে? কোত্থেকে কেনে? এত পয়সা কোথায় পেলে? প্রায় সব দোকানই বিদেশীর, আর ক্রেতা অনেকেই দেশী। রাস্তার ধারে বসে চা-কফি-পানীয় চলছে। অপেয় চা। এরা দুধ খায় না—সব কেমিক্যাল দুধ ব্যবহার করে। গ্রামে নাকি গরু নেই, মোষ কিছু আছে। বাচ্চারা কি খেয়ে বাঁচে? রাস্তাঘাটে বেশি বাচ্চা দেখলাম না। আমার ঘরের পাশে এক জোড়াই যথেষ্ট। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাও কম নজরে এলো। সবই যেন পনেরো থেকে চল্লিশের মধ্যে। অবশ্য বয়স বোঝা যায় না খাঁদা নাকে। গ্রামে প্রতি কুটিরের সামনে একটি পুকুর, মাছে ভরতি। 'বাঙাল' গৃহিণীদের স্বর্গ! কিন্তু সবচেয়ে ভালো মাছও অখাদ্য। এরা মাছ খায় খুব, কিন্তু মাছ কুট্‌তে জানে না। কি করে জানবে! এদের বঁটি নেই, ছোরা-ছুরি দিয়েই মাছ কাটে! তা না থাকুক! এমন হাসিখুশি পরিচ্ছন্ন জাত জগতে দুটি নেই। ডাচেরা পরিচ্ছন্ন, কিন্তু রামগরুড়ের ছানা।

২৩-৮-৫৫

সকাল বিকেল বক্তৃতা। সকালেরটা জমে ছিল, বিকেলেরটা বাজে হলো।

বিকেলে কর্তৃপক্ষের একজন মোটরে খুব খানিকটা বেড়িয়ে

নিয়ে এলেন। পাহাড়ের ওপর অনেকক্ষণ বসে গল্পগুজব হলো। কি চমৎকার সাজানো! মুসৌরী থেকে দেরাদুনের দৃশ্য এর তুলনায় কিছুই না। এত ফুল, এত গাছ, এত সবুজ, এত নীল মেঘের খেলা রানিখেতেও নেই। কেবল বরফের চূড়া নেই। আগ্নেয়গিরি চারধারে: একটা গোলমাল করছে এখনও। বানডুঙ শহর নাকি আদিম কালে হ্রদ ছিল। দেখলে তাই মনে হয়।

ভদ্রলোক নিতান্ত স্বল্পভাষী। তবু যা বললেন, তাতে অনেক কিছু শিখলাম। হোটেলে এসে ম্যাপ দেখলাম। সাড়ে তিন হাজার দ্বীপে শান্তি স্থাপনা অসম্ভব। এমন সব দ্বীপ আছে যেখানে যেতেই চার পাঁচ দিন লেগে যায়। তার ওপর মহাপ্রভুদের কৃপা। অস্ত্র যোগাচ্ছেন এখনও। একাংশ এখনও ছাড়বেন না। তা ছাড়া, হেগ-চুক্তির উত্তরাধিকার। সেই শর্তে ডাচ্ বণিকদের ব্যবসায়ের ওপর হস্তক্ষেপ চলবে না। ওঁরা এখনও টুঁটি চেপে রয়েছেন, তাই কথায় কথায় এদের রাগ ফুটে ওঠে। আমাদের কনফারেন্সে ডাচ্ অধ্যাপক আসতে পারেননি, আসতে দেওয়া হয়নি। শুনে প্রথমে রাগ ও দুঃখ হয়েছিল। এখন বুঝলাম। কিন্তু ওঁরা এখনও ফিরে পাবার স্বপ্ন দেখছেন। নিতান্ত অলীক স্বপ্ন। এখানে একটা খুন-খারাপি হওয়া আশ্চর্য নয়। ইংরাজেরা সোনার চাঁদ এদের তুলনায়। এশিয়ার জাগরণের খবর ওঁদের অনেকেরই কানে পৌঁছয়নি মনে হয়। আজ আমার হঠাৎ চোখ খুলে গেল।

২৪-৮-৫৫

আজ শেষ বক্তৃতা দিলাম। গোটা কয়েক মূল বক্তব্য সাজিয়ে বক্তৃতা শেষ করলাম। মোদ্দা কথা এই :

কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট বা সমবায়-আন্দোলনকে প্ল্যানিং-এর অঙ্গ করতে হবে, নইলে মাত্র পলিসি-ই থেকে যাবে। যখন আজকালকার রাষ্ট্র অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে কিংবা করছে, তখন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপের প্রশ্ন অবাস্তব। আজ যদি সমবায়-সমিতিগুলি কম্যুনিটি প্রোজেক্টস-এর মাধ্যমে এক্সটেনশন সার্ভিসের অঙ্গ হয়, তবে দু'দিক থেকেই লাভ হবে। জনসাধারণের স্বেচ্ছাসেবার সুযোগ যাবে না, বরঞ্চ বৃদ্ধি পাবে। এবং সেই সঙ্গে আমলাতন্ত্রের দোষগুলি সংশোধিত হবে। আমার মতে—এবং আমার মতটি বিশদ করে বোঝাতে প্রায় দু'ঘণ্টা লাগলো—কো-অপারেটিভের অর্থনীতি এতদিন আমাদের দেশে কেবল ক্রেডিট-পলিসিই ছিল, তাও ক্রেডিট সকলে পেতো না, কেবল মাতব্বরেরাই পেতেন। এখন ক্রেডিট-পলিসিকে অল্প সঞ্চয়ের এবং ছোট মাপের (এমন কি সম্ভব হলে মাঝারি ঠাঠেরও) উৎপাদন-নীতিতে পরিণত করতে হবে। অনেক প্রশ্ন উঠলো। অধিকাংশ প্রশ্নেরই মূলে সন্দেহ ও ভয় ছিল যে, আমি বুঝি কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট তুলে দিতে চাইছি। সকলেই ঐ বিভাগের উচ্চ কর্মচারী। আমলাতন্ত্রের দোষ আমরা সকলেই জানি, কিন্তু দপ্তরখানার বিভাগীয় মনোবৃত্তি আরও ভয়ঙ্কর !

এঁরা সকলেই বিশ্বাসী ও বিশেষজ্ঞ। ব্যাপারটাকে বড় প্রতিবেশে দেখাতে গিয়ে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের একাধিক প্রত্যয় ও সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করতে হলো আমাকে। কো-অপারেটরদের আধুনিক অর্থনীতির একটা দ্রুত প্রাথমিক পাঠক্রম নিতে বাধ্য করা উচিত। লোকগুলি নিতান্ত ভদ্র, একাগ্রচিত্ত; কর্মিষ্ঠ—সবকিছু। কিন্তু 'চামড়ার মতন কিছুই নয়' অর্থাৎ সমবায় তথা সমবায়-সমিতির দপ্তরের কাছে কোনো কিছু নয়!

এই নিয়ে ছ' সাতটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করলাম। এক একজন প্রতিনিধি যেন নিজ নিজ দেশের দূত। এ মনোভাব নিয়ে কেউ কিছু করতে পারে না। মুখে বিনয়, বুকে দম্ভ! আর একটি বস্তু এই প্রথম লক্ষ্য করলাম, আমাদের প্রাদেশিকতা। মাদ্রাজ জানে না বোম্বাইকে, বোম্বাই জানে না পাঞ্জাবকে, আর কেউ জানে না বাঙলাকে। চমৎকার! একটা সমগ্র ছবি দেবার চেষ্টা করলাম। দোষ স্বীকার করলাম, গুণ দেখালাম না। কেবল বললাম, এই ধরনের চেষ্টা চলছে। এই হিসেবে আমার যাওয়াটা সার্থক হয়েছে মনে হয়।

দুপুর বেলা ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্তা তাঁর আপিসে নিয়ে গেলেন। প্রকাণ্ড লাইব্রেরি। আমাদের দেশের খুব কম কলেজেই এত ভালো বই এত সংখ্যায় আছে। ইংরেজী ভাষা শেখাবার বন্দোবস্ত দেখে হিংসা হলো। সেই চার-পাঁচ বছর বয়স থেকে ইংরেজী অক্ষর-শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল, এখনও প্রিপোজিশন আর আর্টিক্যল্-এর ভুল হয়। অথচ কত খ্যাত আর অখ্যাতনামা ইংরেজ আমেরিকান লেখকের রচনাই না পড়লাম। সব ব্যর্থ শিক্ষার দোষে। নতুন শিক্ষাপদ্ধতিতে শক্তির অতটা অপচয় হয় না। ব্রিটিশ কাউন্সিল পাঠাগারের লেণ্ডিং সেক্শন থেকে

সপ্তাহে প্রায় হাজার বই ধার নেয় এদেশের লোকেরা। এতদিন রাজকীয় ভাষা ছিল ডাচ্, যেমন আমাদের ছিল ইংরেজী। এখন ইংরেজীর চলন। আমরা ছাড়ছি, ওরা ধরছে।

তিন চারশ' বছর রাজত্ব করলো ডাচেরা। কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের ওপর মোটেই নজর দেয়নি। অত বড় দেশ একটা নামমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল কলেজ। এখন চার পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু ডাচ্ ধরনের। পরীক্ষা লিখে নয়— পঁয়তাল্লিশ মিনিট মৌখিক পরীক্ষা মাত্র। পছন্দ হলো না। শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, ছাত্রের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। জাকর্তা, বানডুঙ থেকে চার পাঁচশ' মাইল দূরে অন্য শহরে কোনো কোনো অধ্যাপকদের বক্তৃতা দিতে যেতে হয়। এ ব্যবস্থা অচল।

উপনিবেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা জাতীয় আন্দোলনের নেতা হন। স্বাধীনতা পাবার পর তাঁরাই শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনে বাধা দেন। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। 'কালচ্যরল্যাগ' বা সংস্কৃতির জের-এর মজার দৃষ্টান্ত। ইন্দোনেশিয়ার নতুন শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বেশি খবর কেউ দিতে পারলেন না।

সন্ধ্যাবেলায় খবর পেলাম নাচের বন্দোবস্ত হবে। গিয়ে দেখলাম মস্ত জলসা এবং আমারই জন্য। বলিদ্বীপে যাওয়া হলো না, গান শোনা হলো না, নতুন ছবি দেখা হলো না বলে অভিমান করেছিলাম। তাই শুনেই বোধ হয় আয়োজন। গিয়ে দেখি, বিরাট ব্যাপার! বিদায়-অভিনন্দন। (এই চমক-দেওয়ার মধ্যে যে সুরুচির পরিচয় পেলাম, সেটা হাজার বছরের সভ্যতার পলি থেকেই জন্মাতে পারে।) ফুল-যাত্রার সময়ও দেখেছি, এ সভাতেও দেখলাম সংযম। ঠিক কী ধরনের শান্ত ভাব ধরতে পারলাম না,

পরাধীনতার শান্তি না বলিষ্ঠ সংযম? একজন বিদেশী সেদিন বলছিলেন, 'জাতটা বড় নরম, সফ্‌ট্।' (নিশ্চয়ই 'সফ্‌ট্' কিন্তু নরম স্বভাব আভিজাত্যেরও চিহ্ন হতে পারে। যেভাবে মেয়েরা হাঁটে, তার নমনীয়তা, তার শ্রী দুর্বলের নয়। আমার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হলো নাচ দেখে।)

এ দেশে আসবার জন্য তৈরি হয়েছিলাম নৃত্য সম্বন্ধে বই পড়ে এবং স্থাপত্যের ফটো দেখে। এক রবীন্দ্রনাথই এই নৃত্যের অন্তরাত্মার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এমন অপূর্ব সৌকুমার্য কোনো নাচেই দেখিনি। চার ধরনের নাচ দেখলাম। দুটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ, যুদ্ধ এবং আত্মরক্ষা সংক্রান্ত। লোকনৃত্যের শক্তিমত্তা রয়েছে, কিন্তু স্থূলতা নেই। ছাঁদের আকারে রীতিবদ্ধ না হলে আর্ট হয় না। লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, লোকশিক্ষা নিয়ে মাতামাতির মধ্যে সজীব রুচির চেয়ে শহর সুলভ ক্লান্তিরই পরিচয় বেশি। যা দেখলাম, তা লোক-শিল্প নয়।

যুদ্ধের নাচটি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় এক রাজার কল্পনা; ছুরি নিয়ে নাচ আততায়ীর হাত থেকে আত্মরক্ষার নাচ, আক্রমণের নয়। এইটিই বোধ হয় এদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। হাতে লাল কাপড় (স্কার্ফ), পরনে লুঙী, মাথায় ফাট্টা বাঁধা—গ্রামের পোশাক। পদক্ষেপগুলো বিধিবৎ। মুখে চোখে সব রকমের ভাব। কিন্তু সেগুলোও আমাদের রস-শাস্ত্রে বর্ণিত ভাবের মতন। রাজার পোশাক রঙিন, অথচ সুরুচিসম্পন্ন। সুন্দানীজ্ নৃত্য দুটি: রাজকুমারীদের নৃত্য ও পদ্মদীঘির ধারে স্বপ্ন—দুটি ব্যালে। বলশই থিয়েটারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যালে দেখেছি। প্রযোজনা বাদ দিলে এই দুটি নাচ কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ রুশ ব্যালের চেয়ে খাটো নয়। বরঞ্চ আরও পেলব, আরও সুকুমার মনে হলো। আঙুল, চোখ,

হাতের ভঙ্গির ব্যঞ্জনা আরও সূক্ষ্ম, আরও গভীর মনে হলো। স্কন্ধ ও পায়ের কাজ কম—এখানে কথক নাচের বাহাদুরি। নৃত্যের ভূমি ভারতনৃত্যের নিশ্চয়, কিন্তু ব্যালে হিসেবে কথাকলির চেয়ে আরও পরিপাটি। (ভারতনৃত্যের কম্পোজিশন যেন একটি বদ্ধ বৃত্ত, প্রত্যেকটি স্ব সম্পূর্ণ, বন্দেশ আঁটোসাঁটো পান থেকে চুন খসবার জো নেই। এ-নৃত্য ঘোলা—পরাবৃত্ত। তাই মন উধাও হয়ে গেল।)

দেশবাসী হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, আমাদের প্রচলিত নৃত্যপদ্ধতি এর চেয়ে অনেক অপটু, অনেক কাঁচা। আমাদের আকাডেমি যব ও বলিদ্বীপ থেকে একদল কলাবিদ্ আনালে দেশের বহু ছাত্রছাত্রী সত্যকারের নাচ শিখতে পারবে। আমাদের নতুন নাচ অনেক ক্ষেত্রেই গানের অবয়ব-সংস্থান। তাও সংস্থান পুরোপুরি নয়, বিকৃত দেহভঙ্গি মাত্র। হয় এঁদের একদল ভারতবর্ষে আসুন, না হয় আমাদের একদল এখানে বছর তিনেক এসে থাকুন ও প্রকৃতি-পরিবেশ শিখুন। ইন্দোনেশিয়ার নৃত্যে বহু বৈচিত্র্য আছে। এক-একটি দ্বীপে এক ধরনের নাচ গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া শ্যাম, বর্মা, কাম্বোডিয়া থেকে অনেক পদ্ধতি এই দ্বীপপুঞ্জে একত্রে বসবাস করছে। সংস্কৃতির দিক থেকে ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূমিখণ্ডের অঙ্গ। কিন্তু অঙ্গ হয়েও স্বাধীন। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ কৃষ্টির এমন সমাবেশের তুলনা নেই। সমাজতাত্ত্বিকের স্বর্গ। দশ-পনেরো দিনে এত বড় এত দিনের সভ্যতার সমন্বয় কি বোঝা যায়! আবার আসবার সুযোগ কিছুতেই হবে না।

এদের অর্কেস্ট্রেশন কিন্তু অ-পরিণত। সবগুলোই যেন তিলঙ না হয় মালশ্রী। মাত্র পাঁচটি স্বর ; কোমলের মধ্যে কেবল কোমল

নিখাদ। প্রায় সবই ব্রাস্, একটা বাঁশের বাঁশি, আর খাড়া বেহালা, আর একটা বড় ড্রাম। একঘেয়ে লাগলো।

একটা নতুন পরীক্ষা করছে বাঁশের যন্ত্র দিয়ে, অথচ ফুঁ দিচ্ছে না। তিন চারটে মাথা তেরচা করে কাটা বাঁশ, নিচে বাঁশ দিয়ে জোড়া—সেইটের গর্ত দিয়ে একটা কঞ্চি নাড়ে। এক একটি যন্ত্র একটি স্বরের, যেমন সা রে গা ইত্যাদি। কারুর হাতে দুটো—মোটা স্বরের। প্রায় জন পনেরো মেয়ে একত্রে বাজালো। প্রথম সুর জাতীয় সঙ্গীত, দ্বিতীয়টি গেরিলা গান—বীরের গৃহ-প্রত্যাবর্তন। কম্পোজিশন হিসেবে খাসা, কিন্তু বৈচিত্র্য নেই। এদের যুদ্ধের গানও নমনীয়, পেলব। সকলেই আগ্রহ দেখালেন। কিন্তু স্কার্ট পরে কেন? তাও সবুজ! ব্যাণ্ডমাস্টারের কি দরকার ছিল। কালো 'বো' পরা আবার! ঐ একটি মাত্র ভিন্নরুচির পরিচয় পেলাম!

২৬-৮-৫৫

জাকর্তায় সরকারী কর্তৃপক্ষেরা খুব যত্ন করলেন। আমাদের ভারতীয় দূত তায়েবজীর সঙ্গে দেখা হলো। এখানে বেশ জনপ্রিয় হয়েছেন। অনেক কথা হলো, বিদগ্ধ পুরুষ। ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের সজ্ঞানতা অত কম বলে আক্ষেপ করলেন। ব্যাখ্যা দিতে

চেষ্টা করলাম। আমার ইম্প্রেশ্যনগুলি নিয়ে লিখতে অনুরোধ করলেন।

দেশী চিত্রকরের আঁকা খানকয়েক পশ্চিমী ঢঙের ছবি দেখলাম। রঙ লাগাতে এবং বাস্তব সত্য আঁকতে এরা ভয় পায় না। দু'জনেই মুসলমান। এখানে প্রায় সকলেই মুসলমান। কিন্তু আমাদের পরিচিত মুসলিম লীগের মুসলমান নয়। (একটা দার-উল-ইসলাম গড়ে উঠছে।)

কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিস্ট্রার রহিম সাহেব অত্যন্ত কর্মিষ্ঠ লোক। বিস্তর স্ট্যাটিস্টিক্স ঘাঁটা গেল।

প্ল্যানিং দপ্তরে গেলাম। শুনলাম অনেকটা আমাদের পরিকল্পনার ছকে ঢালা! অবশ্য অদল-বদল করা হয়েছে। তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো: (১) মুদ্রাস্ফীতি ও তার ফলে কালোবাজার, (২) শিপিং ও ট্রান্সপোর্ট; জাতীয় আয়ের এক-চতুর্থাংশ খরচ করা হবে। (৩) ব্যালেন্স অব্ পেমেণ্টের অবস্থা—ওদের ঘাটতি বাজেট চলছে। সরকারী খরচ কমাবার প্রয়োজন ভীষণ। এত ফালতু লোক রাখলে চলবে না শুনলাম। অথচ কমাতে গেলে ভোট পাওয়া যাবে না। ম্যান-পাওয়ার বাজেটও ও সেন্সস অব প্রোডাকশ্যনের কাজ কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে। ওদের সমস্যা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি মারাত্মক। হেগ কনভেনশ্যন বদলাতেই হবে। এদের 'ইকনমি'র টুঁটি চেপে রেখেছে ঐ কনভেনশ্যন। নতুন অর্থমন্ত্রী ডাঃ সুমিত্রো। একজন ব্রিলিয়াণ্ট অর্থনীতিজ্ঞ। টিন্‌বার্গেনের ছাত্র। দেখা যাক কি করেন। ডাঃ হাত্তাকে কো-অপারেশ্যনের জনক বলে লোকে। ডাঃ সুমিত্রোকে 'প্ল্যানিং-এর পিতা' বলতে শুরু হবে কবে?

এদের মধ্যে এখনও বিরোধী মনোভাব প্রবল,—গেরিলা যুদ্ধের ফলই তাই। নঞর্থক মনোভাবকে সদর্থক করে তোলাই এদের প্রধান কাজ। একমাত্র প্ল্যানিং-এর দ্বারাই সম্ভব। দু'জন প্রাক্তন মন্ত্রীকে আটক রাখবার সঙ্গে সঙ্গে দাম কমতে আরম্ভ হয়েছে। যথেষ্ট নয়। আমদানীর র‍্যাকেট ভাঙতেই হবে।

১৮-৮-৫৫

সিঙ্গাপুরে রাত কাটিয়ে পরের দিন দুপুরে কলোম্বো। ডাঃ ভানু দাসগুপ্তের বাড়ি উঠলাম। পুরানো লক্ষ্ণৌ-এর বন্ধু। একসঙ্গে চাকরি করেছি, টেনিস খেলেছি। চার পাঁচ বছর পূর্বে সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে স্টেট সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের অর্থনীতিক গবেষণার ডিরেক্টর হয়েছেন। সিংহলের সরকার এঁকে বিশিষ্ট নাগরিক অধিকার দিয়েছেন। প্রায় সাতাশ বৎসর আছেন, ও বেশ ভালোই আছেন। তাঁর মা'র বয়স ৮৩ বৎসর, চশমা পরেন না, নিজে বাঙলা রান্না রেঁধে খাওয়ালেন। অমৃত লাগলো। খালের মাছের ঝাল, লাউ-চিংড়ি, সুক্তো, পেঁপে আর আদা দিয়ে ডাল। মা-ছেলের ভাব কী মিষ্টি! একটি বাঙালী (পূর্ববঙ্গীয়) পরিবারের সঙ্গে আলাপ হলো। ভাষা বুঝতে কষ্ট হলেও তাঁদের মিষ্ট স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করতে কষ্ট হলো না।—আরেকজন বাঙালী (পূর্ববঙ্গীয়)

ও কয়েকজন সিন্ধী ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয়ে অনেক খবর পেলাম।

এরা বড্ড সাহেব হয়ে গিয়েছে। পাড়াগেঁয়ে চাষীদের বাড়িতেও চেয়ার-টেবিল, পর্দা টাঙানো, ঝক্ঝক্ তর্তর্ করছে। যা রোজগার করে তার চেয়ে বেশি খরচ করে এরা। একটু প্রকটভাবে কনজাম্পশ্যনে বিশ্বাসী। আমদানি সামগ্রী অত্যন্ত সস্তা। ভারতবাসীর পক্ষে সুখের জায়গা নয়। ভয়ানক খুনখারাপী হয়। যে-ক'জন সিংহলী মহিলার সঙ্গে পরিচয় হলো, তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত ও অত্যন্ত দক্ষ। তাঁরা মেম বনে যাননি। অথচ টাইপিস্ট মেয়েও বিলেত যায়। মেয়েরাই যদি কিছু করতে পারেন।

গ্রামগুলো যেন পটে আঁকা ছবি। পুরানো মন্দির সংস্কার করে নতুন হয়েছে। চল্লিশ বৎসর আগে পুরানোই ছিল। তবু চিনতে পারলাম।

'ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব্ উইমেন'-এর সুবর্ণ জয়ন্তীতে বক্তৃতা দিলাম ভারতীয় মহিলার অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে। কিভাবে (অর্থাৎ ক্যাপিট্যালিজম্ কথাটি উচ্চারণ না করে) আমাদের পারিবারিক জীবন ভাঙছে দেখালাম। নগরবাসী শ্রমিক-পরিবার আর শহুরে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার—এই দুটি নিয়ে বিচার করলাম। বক্তৃতার পর অনেকে প্রশ্ন করলেন। সিয়েরা লিয়ন, আইসল্যাণ্ড, ইরাক, সুইডেন, পাকিস্তান-এর প্রতিনিধিদের সতেজ বুদ্ধি দেখে অত্যন্ত খুশি হলাম। আমাদের লক্ষ্মী মেনন আগের দিন এমন

সুন্দর বক্তৃতা দেন যে, তাঁর সুখ্যাতিতে সকলে মুখর। আমি আশ্চর্য হইনি, তিনি আমার বহু পুরাতন বন্ধু।

ভারতের নেতৃত্ব সকলেই মানে। কিন্তু গোপনে, কোথায় যেন একটু হিংসাও রয়েছে। আমাদের বিনয়ী হতে হবে—একটু বেশি করে।

৩০-৮-৫৫

দেশের মাটিকে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে। এত অল্প দিনে অত দেশ ঘোরা, অত পরিশ্রম করা, অত বক্তৃতা দেওয়া, অত জনের সঙ্গে মেলামেশার অর্থ হয় না। হাওয়াই জাহাজ আমাদের 'আমেরিকা-নাইজ্' করে দেবে।

একটা বিশ্বাস নিয়ে ফিরলাম—ঔপনিবেশিক মনোভাবকে যেতেই হবে। এ ভূত ছাড়াতেই হবে। ছাড়বার সময় ভূত হাত-পা ভেঙে দিয়ে যায়। তা যাক—না হয় নুলো খোঁড়াই হয়ে থাকা যাবে। তবু ভূতগ্রস্ত অবস্থার চেয়ে ঢের ভালো। স্বাধীনতার দাম না হয় দেবো! দুর্নীতি একটা দাম, অনিশ্চয়তা আরেকটা দাম, রাজনৈতিক দলের প্রাচুর্য আরেকটা দাম। এ-সব দাম আমরা দিচ্ছি, দেবো। কিন্তু তাড়াতাড়ি দেওয়া চাই। অতিশীঘ্র প্যাণ্ডোরার বাক্সকে রত্নগর্ভ পরিণত করতে হবে, প্রধানত

নিজেদের সমবেত চেষ্টায়। নতুন বিদেশীর সাহায্য নিতে ভয় হয়। আর নয়!

ভারতের আত্মবিশ্বাস কিছু এসেছে। কিন্তু বিনয়ী হতেই হবে। আমাদের সংস্কৃতি এতদিন বাঁচিয়েছে, আরও কিছুদিন বাঁচালে মন্দ হয় না। ক্রমেই আমি ঐতিহ্যে বিশ্বাসী হয়ে পড়ছি, প্রাণের দায়ে। আমাদের 'ভ্যালুজ' বা মানগুলো মরেও মরছে না—এটা মস্ত কথা। ঐতিহ্যে দিক্-নির্ণয় নেই, কিন্তু প্রয়াসের সমর্থন আছে।

৯-৯-৫৫

আজ সকালে বাঙলাদেশের বৃষ্টি শুখা আলিগড়ে নামলো। অমনি বিজলী বন্ধ। সরকারী হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক থেকে আমরা বিজলী ধার নিই, অথচ কথায় কথায় বন্ধ হলে আপত্তি জানাই না বা জানাতে চাই না। গোঁজ গোঁজ করেই ক্ষান্ত হই। একেই হয়তো পণ্ডিতজী ছাত্রদের আত্মসংযম বলবেন! ভারতবর্ষের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি ছিলেন না, তাই হয়তো ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন না।

শিক্ষার জন্য বিলেত যাওয়ার আমি বিপক্ষে, বিশেষত

শৈশবাবস্থায় এবং পাবলিক স্কুলে। গত বৎসর য়ুরোপ যাবার পথে প্রায় জন পনেরো দেশী বালকবালিকা আমার সহযাত্রী ছিল। ক্লিফটন স্যার, হ্যারো স্যার, ঈটন্ স্যার, শ্রুজ্‌বেরী স্যার, উস্টেস্টার স্যার, (একটি মেয়ে) চেলটেনহ্যাম স্যার······এই শুনলাম। গুজব অথচ দেশ স্বাধীন হয়েছে। এঁদের জননীরা বোধ হয় বিদেশিনী, তাই সম্ভবত জানেন না যে, জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায় থেকে রমন, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, বীরবল সাহানি, প্রশান্ত মহলানবীশ, ভাটনগর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের দেশী ডিগ্রীর ওপরই বিদেশী ডিগ্রী। সত্যেন বোসের আবার বিদেশী ডিগ্রীই নেই। একমাত্র ভাবা-ই খাঁটি বিদেশী শিক্ষাগ্রস্ত। সুরেন দাশগুপ্তমশায় যখন কেম্‌ব্রিজের ডক্টরেট পেলেন, তখন আমরা লজ্জিত হই। রাধাকৃষ্ণণের ওপর বিদেশী ডিগ্রীর বর্ষণ হয়। সমরফেল্ট সাহেব একবার একজন ভারতীয় ছাত্রকে বলেছিলেন, "ভোঁস—অর্থাৎ সত্যেন বোস থাকতে এই বিষয় শেখবার জন্য জার্মানিতে আসার অর্থ হয় না।" এবার শুনে এলাম ডেরেক্সন ঈডেনবার্গ টিনবার্গেন প্রভৃতির কাছে, সংখ্যাতত্ত্ব শেখবার জন্য কোনো ভারতবাসীর বিদেশে যাবার প্রয়োজন নেই, কলিকাতার ইনস্টিটিউটই যথেষ্ট। কিন্তু মা-লক্ষ্মীরা কিছুতেই বুঝবেন না! বিলেত না হলে দূন-স্কুল। সেখানেও পাঁচ বৎসরের ধন্নার পর ঢুকতে পায়।

দর্শনশাস্ত্রের দুটি পদ্ধতি প্রচলিত; (১) ডায়লগ,—কথোপকথন, আর (২) ডায়েলেক্টিক। ডায়লগ বিভিন্ন মনোভাব ও পরিশীলনের প্রতি শ্রদ্ধা, আর ডায়েলেক্টিকে মতবাদের পার্থক্য উত্তীর্ণ হয়ে নৈর্ব্যক্তিক সত্যের সন্ধান। শ্রদ্ধার

পর সত্যের সন্ধান না-ও মিলতে পারে ; এবং উত্তীর্ণ হওয়ার পথে অশ্রদ্ধা আসাও স্বাভাবিক।

উপনিষদ, প্লেটো থেকে গুরু-শিষ্য সংবাদ সব কথোপকথন। সূফী, সাধু-সন্ত, যোগী-ঋষিদের এই আঙ্গিক। হেরাক্লিটাস, হেগেল, মার্ক্স থেকে বর্তমান বৈজ্ঞানিক পন্থা সব ডায়েলেক্টিক। বিশ্বজনীন নিরালম্ব সত্যের নিষ্ঠা নিষ্ঠুর। কথোপকথনে তুমি তুমি রইলে, আমি আমি রইলাম। ভদ্রজনোপযুক্ত।

আজ সন্ধ্যায় পুরানো কথা মনে এলো। হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সের বাড়িতে (সমবায় ম্যানশ্যনে) ছবির প্রদর্শনী খোলা হবে। তার প্রী-ভিয়্যু-এর নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। ইন্দিরা দেবী আমাকে নিয়ে গেলেন। অবনীবাবু, গগনবাবু ও সমরবাবু আলখাল্লা পরে ঘুরছেন। হল্-এ দু'জন দীর্ঘাকৃতি ইংরেজ, উড্রফ আর কেস্টোভেন। অসিত হালদার, নন্দলাল বসু, সুরেন কর ছিলেন। অসিত হালদারের অপ্সরা ও দুর্গাশঙ্করের পলাশ ফুল, চৈতন্যদেবের মহাপ্রভু, নন্দলালবাবুর শিব, আর বোধ হয় তায়কান ও আরেকটি জাপানীর ছবি মনে ভেসে উঠলো। একপাশে গগনবাবুর খানকয়েক ল্যাণ্ডস্কেপ ছিল। তখন তিনি কিউবিজ্ম নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। নতুন ঢঙ বলে সেগুলিকে অন্যত্র রাখা হলো। এখন মনে হচ্ছে, তখন মনে হয়নি। কিউবিজ্ম-এর ঋজুতা আর স্থিতি-স্থাপকতার সঙ্গে 'সেন্স অব্ মিস্টরি' খাপ খায় না। তখন সিঁড়ির মোড়ে কালো ঘোমটা অদ্ভুত লেগেছিল। অসিত হালদারের রেখা কাঁপে, নাচে, এলিয়ে পড়ে ; আবার তীরের মতন ছোটে। খাড়া দাঁড়ায় কি মনে পড়ছে না। অসিতের আসলে কবি-মন। গাঙ্গুলীমশাই পাশে

এসে দাঁড়ালেন। অসিত হালদারের ছবি লিরিক্যাল বললেন। কাজিন্স সাহেবও পরে তাই লিখেছিলেন। প্রকাণ্ড হল্‌টা বিদ্যুৎভরা। অত উত্তেজনা, অত চঞ্চলতা আর ফেরত পাবো না। যৌবনের জন্য ? বাঙলাদেশই ছিল বিদ্যুৎভরা। (কলেজ স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ের মাথায় শিশির ভাদুড়ী বড়, না নরেশ মিত্র বড়—এই নিয়ে দু'দলের বচসা এক রাত্রে ঘুষোঘুষিতে পরিণত হলো। আরো আগে অমর দত্ত—দানিবাবু নিয়ে ছাতা চলতো।

পরের দিন প্রদর্শনী খোলা হলো। গগনবাবু বললেন, দর্শকদের নিয়ে ঘোরাতে, যৎসামান্য বুঝিয়ে দিতে। কোণে একটা নক্ষত্র-পাতের ছবি ছিল—একজন সাহেব পা বেঁকিয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখছিলেন। আলোর মধ্যে একটি মূর্তি ছিল—গূঢ়ার্থ বুঝতে পারিনি, বোঝাতেও পারলাম না। ভদ্রলোকের গোঁফটা উঁচুতে তোলা। ভঙ্গিটাই দুষ্টুমি মাখানো—'রেকিশ'। বোধ হয়, প্রমোদকুমারের ছবির সামনে এসে কথাবার্তা হলো। সাহেবের সাথে ইন্দিরা দেবীকে কে একজন পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইন্দিরা দেবী হাঁটু ভেঙে 'কার্টসি' করলেন। তখন বুঝলাম রোন্যাল্ডসে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। পরে তাঁর বই পড়ি। একজন ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে ইন্দিরা দেবী ফরাসী ভাষায় কথা কইলেন। সমরবাবু আমাকে অন্য ধারে নিয়ে গেলেন। আজকাল ক'জন সমরবাবুর নাম জানেন! অথচ চিত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতি—দুই ভাই ও রবিকাকার আবডালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন। সমরবাবু ও গগনবাবুর মতন ভদ্র ও বিদগ্ধ জন দেখিনি। সেই গগনবাবুর জিব আড়ষ্ট হয়ে গেল। 'বিচিত্রা'র এক আসর থেকে বেরুচ্ছি,

হঠাৎ পাঞ্জাবী ধরে কে টানলো, ফিরে দেখি গগনবাবু। কি বললেন এক বর্ণও বুঝলাম না। মনে হলে চোখে জল্ আসে।

১০-৯-৫৫

পড়াবার সময় 'অবজেক্টিভিটি' কথাটা প্রয়োগ করলাম। ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট পড়াচ্ছিলাম। এটা নূতন বিষয়। পূর্বে নাম ছিল ইকনমিক হিস্ট্রি, এখন নতুন নাম দেওয়া হলো কেন বোঝাচ্ছিলাম। সেই প্রসঙ্গে হিস্ট্রির কথা উঠলো। র‍্যাঙ্কে বলতেন, ইতিহাসের একমাত্র আগ্রহ ও বিষয় তথ্য এবং তার পদ্ধতি "অবজেক্টিভ", বৈজ্ঞানিক। গ্রোথ্-এর আলোচনা পদ্ধতি একটু পৃথক ; সেটা বুঝতে হলে নানাপ্রকার মডেল তৈরি করলে সুবিধা হয়। ডেভেলপমেণ্ট আরেকটু ভিন্ন। এর মধ্যেকার ইতিহাস প্রগতিশীল ; এবং প্রগতিবাদের অন্তরালে উন্নতি-অবনতির সংজ্ঞা প্রচ্ছন্ন থাকে। অথচ উন্নতি-অবনতি র‍্যাঙ্কের মতানুযায়ী তথ্য নয়। যদি তাই হয়, তবে অবজেক্টিভিটির মধ্যে মূল্যের স্থান আছে। ভ্যালুস আর ফ্যাক্টস, বাট্ অল্ ফ্যাক্টস্ আর নট্ ভ্যালুস্। মার্ক্স ধনিকতন্ত্রকে ভ্যালু-ফ্যাক্ট হিসেবে দেখেছেন। ড্রয়সেন বলতেন, র‍্যাঙ্কে হ্যাড দি অবেজক্টিভিটি অব ইউনাক্। সত্যই

তাই,—ঐ ধরনের মনোভাব নিয়ে ইকনমিক হিস্ট্রি পড়ানো যায়, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট পড়ানো অচল।

এই প্রসঙ্গে সোশ্যাল ফোর্সের আলোচনা করলাম। প্রায় বিশ বছর আগে যা লিখেছিলাম, তাতে আর মন সায় দেয় না। ফোর্স কথাটি এক্ষেত্রে কিভাবে গ্রহণ করা যায় বলবার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা নীরব রইলো। কিন্তু ছাড়বো না, আরো দু'-একদিন বেয়ে-চেয়ে দেখতে হবে। ঘণ্টার পর একটা গল্প শোনালাম।

কলেজে পড়বার সময় আমার কেমেস্ট্রি, ফিজিক্স, অঙ্ক প্রভৃতি ছিল। বি-এ থার্ড ইয়ারে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীমশাই পড়াতে এলেন। তিনি আমার পিতার বন্ধু ছিলেন এবং বোধ হয় আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। সামান্য দু'-একটা কথাবার্তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা তো কেমিস্ট্রি পড়ে এসেছো, চার্লস ল-টা কি?' গড় গড় করে মুখস্থ বলে গেলাম। আবার প্রশ্ন করলেন, 'এভোগ্যাডরোর হাইপথেসিসটা কি?' তাও মুখস্থ বললাম। 'আচ্ছা, এখন বলো দেখি ল' আর হাইপথেসিস্ কাকে বলে, তাদের পার্থক্যটা কি?' সব চুপ। বড় বড় চোখ মেলে বললেন, 'অঃ, তোমাদের একটু লজিক পড়াতে হবে, পরে যন্ত্রপাতি নিয়ে কারবারের সুবিধে হবে।' সেই আরম্ভ হলো কার্ল পিয়ার্সন-এর গ্রামার অব সায়েন্স আর মঁরি পোঁয়াকারের সায়েন্স এণ্ড মেথড্। তিনমাস পুরো তাই পড়ালেন। এই গল্পটি শোনবার পর ছেলেরা হাসলে। বললাম, 'ভয় নেই, সে বিদ্যে আমার নেই।'

পুরাতন অধ্যাপকদের কথা মনে উঠছে। আমাদের সমবয়সী অনেক অধ্যাপক বিদ্বান, দিগ্‌গজ পণ্ডিত। কিন্তু কোথায় যেন আমাদের কিছুর অভাব আছে। হয়তো নস্টালজিয়া। ঠিক

বুঝতে পারছি না। বিদ্যার গভীরতা? ব্রজেন শীলের বক্তৃতা ও তাঁর কথাবার্তা শোনবার অনেক সুবিধা আমার হয়েছিল.। একটা ঘটনা লিখে রাখি। আমি তখন বি-এ ক্লাশে পড়ি। দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছি, জুবিলী স্যানিটেরিয়মে একটা ঘর নিয়ে আছি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ইংরেজী নাটক ও অভিনয়ের মহলা চলছে। সন্ধ্যার পর ডাঃ শিশির পাল ঘরে এসে বললেন, 'ধূর্জটি, একটু বিপদে পড়েছি। কাল সকালে ব্রজেনবাবু আসছেন ঘরের সুবিধে হচ্ছে না। পরশু সকালে তাঁকে ভালো কামরা দিতে পারবো। যদি কাল রাত্রের জন্য তুমি তোমার ঘরটা ছেড়ে দাও, বড়ই ভালো হয়।' আমার ঘরের সঙ্গে বসবার একটা ছোট্ট কাচের বারান্দা ছিল। 'নিশ্চয়ই, আমি ঐ বারান্দাতেই শোবো। সে তো আমার সৌভাগ্য!' ব্রজেনবাবু পরের দিন এলেন। ঠিক এলেন নয়, ঝড়ের মতন ঢুকলেন। শিশিরবাবু ব্যাপারটা ব্রজেনবাবুকে বুঝিয়ে দিলেন। কিছুতেই রাজি হন না, তখন আমি বললাম, 'আপনার সঙ্গে এক জায়গায় থাকার গৌরব থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন?'

'আচ্ছা, বেশ, বেশ, তুমি কি পড়ো?'

'বি-এ পড়ি মাত্র। কিন্তু আপনার একটা বই পড়েছি।'

কলেজ স্ট্রীটের রাস্তার ওপর থেকে চার পয়সায় তাঁর 'নিও-রোমান্টিক, মুভমেন্ট ইন (বেঙ্গলী?) লিটারেচার' (নামটা মনে পড়ছে না) কিনেছিলাম।

উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম আর হুবার্থার-এর আলোচনার পর কীট্‌স সম্বন্ধে সেখানে কিছু বক্তব্য আছে।. আমি তখন কীট্‌সের খুব ভক্ত, অনেক কবিতা ও রচনার সঙ্গে পরিচিত।

তাই সাহস ভরে বললাম, 'আপনার কীট্স সম্বন্ধে মন্তব্যগুলি আমার খুব ভালো লেগেছে।'

'ও বই কখনো পড়ে! আমি তখন নাবালক ছিলাম। ও-সব ছেলেমানুষী কথা এখন ভুলেই গিয়েছি।'

'আজ্ঞে না, আমাদের কাছে ঐ যথেষ্ট। তবে দু'-একটা কথা বুঝতে পারিনি।'

'কোন্‌টা হে?'

'আজ্ঞে, আপনি লিখেছেন, কীট্সের সৌন্দর্যতত্ত্ব হেলেনিক। সেটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তার পরে আপনি একটা সন্ধি করেছেন, Indo-Sino-Mazdean philosophy of the East. ও-সব কি?'

সেই শুনে বিরাট এক হাসি। এমন ছাদফাটা হাসি এক অঘোর চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী দেবীর পিতা), আর অশ্বিনী দত্ত ছাড়া আর কারুর কাছে শুনিনি: হাসবার পর ব্রজেনবাবু দাড়িতে হাত বোলাতেন।

এতে হাসবার কি পেলেন, না বুঝে বললাম, 'আপনি বড় শক্ত শক্ত কথা প্রয়োগ করেন।' আরো হাসি!

'তা বুঝি জানো না—কার্জন সাহেব কি বলেছিলেন, You say he is Seal, But he writes like a hippopotamus. কার্জন সাহেব ইংরেজ, তাই মুখ ফুটে বলেননি, he looks like one too.' হাসি আর থামে না। বললাম, 'সিনো-টা কি?'

'ওটা চীন।' তারপর আধ ঘণ্টা তান-হান-সুঙ-মিঙ ইত্যাদি কথার ছড়াছড়ি শুরু হলো। প্রতি যুগের সৌন্দর্যতত্ত্বের বিচার চললো।

'আজ্ঞে Mazdean-টা কি?' তার ব্যাখ্যাও আধ ঘণ্টা।

'কিন্তু ভ্যাখ, ওটাতে আমার ভুল ছিল। ঐ যে হেলেনিক বলেছি সেটার ব্যাখ্যা করলে পারতাম। ওর পেছনে ছিল ক্রীট্, তারও পিছনে ইজিপশ্যন।' হাঁপিয়ে উঠেছিলাম মনে আছে। বহু পরে চৈনিক আর্ট সম্বন্ধে কিছু পড়ি; পরীক্ষার জন্য ঈজিপ্ট সম্বন্ধেও কিছু পড়তে হয়। তখন দেখলাম যে, কত মূল্যবান কথাই না সেদিন ব্রজেনবাবু একজন ১৭।১৮ বছরের যুবককে বলেছিলেন। বলবার কি আগ্রহ! (দিলীপকুমার একবার মহীশূরে ব্রজেনবাবুর অতিথি হন। সেখান থেকে তিনি আমাকে লেখেন, 'ধূর্জটি, ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে জানতে চাও তো এখনই এখানে এঁর কাছে চলে এসো।')

পরের, কিংবা আরো দু'-একদিন পরের ঘটনা আরো বিস্ময়কর।

স্যানিটেরিয়মে আরেকজন ভদ্রলোক ছিলেন, শ্রীভূদেব রায়। তিনি আমার বড়দার (নরনাথ মুখোপাধ্যায়) বন্ধু। বোধহয় সেইবার প্রথম দার্জিলিঙে এলেন। আমি এর পূর্বে আরো দু'-একবার এসেছিলাম। সে যাই হোক, অবজার্ভেটরি পাহাড়ে ভূদেববাবুকে বরফ-ঢাকা চূড়োগুলো দেখাচ্ছিলাম। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা এইটে, আমার আঙুল যেধারে সেইটে।' ভূদেববাবু ঠিক ধরতে পারছিলেন না। এমন সময় পিছন থেকে গম্ভীরকণ্ঠে কে বলে উঠলেন, 'না, ওটা নয়—আমার ফিঙার ফলো করুন।'

দেখি, ব্রজেনবাবু। আমি বললাম, 'এই তো সার্ভে আপিসের তৈরি ম্যাপটা রয়েছে, তাই দেখলেই তো…'

'না হে না, ওটা ঠিক নয়।'

'স্যার, সার্ভে আপিস অতোটা ভুল করবে!'

'ওটা ভুল নয়, এর‍্যর।'

'কোথায় ?'

'আমার প্রথম অবজেক্‌শ্যন ফাইললজিক্যল…'

'সে কি ! মাপা-জোপার সঙ্গে ফাইললজির সম্বন্ধ কোথায় ?'

'আছে, হে, আছে। ঐ জঙ্ঘা কথাটি ধরো। কথাটি সংস্কৃত. জন্ ধাতু থেকে এসেছে। অর্থাৎ ভারতীয়, অর্থাৎ অ্যাঙল্ অব অবজরভেশ্যন হচ্ছে ইণ্ডিয়ান, নয় কি ?'

'নিশ্চয়ই…'

'তার ওপর কাঞ্চন…'

'হ্যাঁ' স্যার—যাকে পরমহংসদের বলতেন কামিনীকাঞ্চন। কিন্তু কাঞ্চনের জঙ্ঘাটা কি রকম ? ওটা কি ইনভারশ্যন, স্যার ?'

'ওটা ট্রিগোনোমেট্রিক্যল।'

তারপর রিফ্র্যাক্‌শ্যন, ডিফ্র্যাক্‌শ্যন, রেয়ারিফ্যাক্‌শ্যন-এর অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন। মোদ্দা কথা এই : মাপ-জোপ করতে হবে অন্তত পনেরো বিশ হাজার ফুট থেকে, ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এবং বেশি দূরে দূরেও নয়। সবচেয়ে বড় কথা, নেপাল-তিব্বতের দিক থেকে। সার্ভে আপিস তা করেনি। তারপর দেখতে হবে নেপাল-তিব্বতের লোকরা কোন্ শিখরটাকে কি বলে। এইটেই হলো ফাইলো-এ্যানথ্রপোলজিক্যল রিসার্চের পদ্ধতি। ওদের ভাষা এবং ওদের অর্থ—এই ধরো…'

ধরবার সুযোগ হলো না, বৃষ্টি এলো। দার্জিলিঙের বিদ্যুৎ-চমকানো আমার মোটেই পছন্দ হতো না—আর ঐ রকম কড় কড় ঘড় ঘড়, একেবারে যাচ্ছে-তাই ! যাই হোক্, রাত্রে খাবার পর ভূদেববাবু গা ঢাকা দিলেন। আমিও দরজা বন্ধ করে রিহার্সাল দিতে লাগলাম। ব্রজেনবাবু ততদিনে নিজের ঘরে চলে গিয়েছেন। বোধ হয়, তিন চার দিন তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

হঠাৎ একদিন বেলা এগারোটার সময় আমার ডাক পড়লো। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত পুঁথি। 'এই দ্যাখ…' কি আর দেখবো!

ব্যাপারটা এই: ব্রজেনবাবু রায়বাহাদুর শরৎ দাসের বাড়ি গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি শিখরের তিব্বতী নাম খুঁজেছেন এবং পাছে আমার সন্দেহ দূর না হয় ভেবে প্রমাণ সংগ্রহ করে এনেছেন! এ যুগে এ মানুষ হয়? এমন জ্ঞান-স্পৃহা, জ্ঞানের এমন বিশালতা, একটি বিদ্যার সঙ্গে অন্য বিদ্যার যোগ সম্বন্ধে এমন সচেতনতা, আর এমন বিনয় ও শিশুসুলভ সরলতা বর্তমান পণ্ডিতদের মধ্যে আছে কি?

তাঁরা বলেন, বিদ্যা বাড়ছে এমন দ্রুতভাবে যে তার সঙ্গে তাল রেখে চলাই দুষ্কর। নিশ্চয়ই। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, জড়ো করা নয়—যোগসাধন। সেজন্য যোগসূত্রের সন্ধান হওয়া চাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যোগসূত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা নির্বিকার। তার কারণ সামাজিক, বিদ্যার বৃদ্ধি নয়। য়ুরোপের নব যুগে ফিউডাল সমাজ নিশ্চয়ই ভাঙছিল। কিন্তু তখনও খৃস্টানী ভূয়োদর্শনের কাঠামো বজায় ছিল। কেবল তাই নয়, সেই সঙ্গে নতুন বৈশ্য সমাজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাই না সে যুগে সর্ববিদ্যাবিশারদ জন্মায়।

আমাদের দেশের ভূয়োদর্শনের সঙ্গে পশ্চিমী ভূয়োদর্শনের যোগ হয়নি, যেমন হয়েছিল য়ুরোপের খৃস্টানী ও হেলেনিক ভূয়োদর্শনের সঙ্গে। তাছাড়া, এখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী-শিক্ষিত ভদ্রলোক-সম্প্রদায় সমাজের স্তর মাত্র, যদিও নতুন স্তর ছিলেন। য়ুরোপের বিশেষতঃ ইংলণ্ড ও ইটালির নব্য শ্রেণীর মতো নব্য শ্রেণী ছিলেন না। তাই তাঁদের শ্বাস শীঘ্রই ফুরিয়ে গেল। তবু তাঁরা বিরাট ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তিত্ব উৎকেন্দ্রিক

হলেই সহজ-স্মরণীয় হয়। একটু পাগলামি চাই; একটু এক্সেন্ট্রিসিটি, অডিটি না হলে মনে থাকবে কেন? অক্সফোর্ড কেম্‌ব্রিজের 'ডন'-দের কত গল্পই না আছে। অবশ্য ওখানে এক রকম 'ক্যল্ট' হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ অবশ্য অন্য। আমি অতোখানি চাই না। তবু আমাদের ছাত্ররা আমাদের ব্যবহার, আমাদের কথাবার্তা, আমাদের মতামত, আমাদের 'ওবিটর ডিক্টা' কি মনে রাখবে? আমাদের যুগের বেলা কিছু হয়তো থাকবে। কিন্তু তার পরে? ভট্‌চাযিমশাইদের, মৌলবী সাহেবদের কত গল্পই না করেছি!

১২-৯-৫৫

আজকাল বাঙলা দেশে সঙ্গীত সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর আলোচনা শুরু হয়েছে দেখে আনন্দ হলো। সুরেশ চক্রবর্তী ও অমিয় সান্যাল শাস্ত্রজ্ঞ ও করিতকর্মা। অমিয় সান্যালের অতিরিক্ত গুণ যে মজলিশী। একেবারে প্রমথ চৌধুরীর কৃষ্ণনগর। সুরেশের সংগ্রহ সমুদ্র-বিশেষ। অবশ্য পথপ্রদর্শক দিলীপকুমার। ইদানীং রাজ্যেশ্বর মিত্র বাঙলা সঙ্গীত সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। আমার এখতিয়ার থাকলে এঁকে দু' বছর জলপানি দিতাম, যাতে মনপ্রাণ দিয়ে কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারতেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে এঁর

মন্তব্যগুলির একটা স্ট্যাণ্ডার্ড আছে। নারায়ণ চৌধুরীর রচনা সুখপাঠ্য, কিন্তু বিচারে গণ্ডগোল থেকে যায়। তবু চিন্তা করছেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে শান্তিদেব ঘোষের মতামত অত্যন্ত মূল্যবান। সৌম্য ও-সম্বন্ধে যা লিখেছে, তার চেয়ে সে অনেক বেশি জানে। লেখবার সময়ে সে ভুলতে পারে না যে, সে ঠাকুর বাড়ির ছেলে।

'পরিচয়ে' অশোক মিত্রের যামিনী রায় সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়লাম। অত্যন্ত ভালো লাগলো। শেষ মন্তব্য না করলেও পারতো অশোক। কোনো আর্টিস্টের কাছে কোনো যুগে কি প্রত্যাশা করে হতাশ হই, কি হয়েছি—এ সব কথার অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট নয়। তাঁর চিত্রে দ্বন্দ্ব নেই নিশ্চয়। কিন্তু যেখানে তিনি পৌঁছেছেন, সেখানে সমস্যার একটা কোনো উত্তর আছে কি নেই—এই হলো প্রশ্ন, যদি অবশ্য এই ধরনের প্রশ্ন করতেই হয়। আমার বিশ্বাস উত্তর আছে।

বিরোধের জন্য মানুষ বিরোধ চায় না। বিরোধ আছে, কিন্তু বিরোধের সঙ্গে বিরোধ-অবসানের আশা ও আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। যদি পৃথিবীতে শান্তি-আশার অস্তিত্ব স্বীকার করি, তবে সৃষ্টিতেও তার অস্তিত্ব স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সব সময় রঙ্গমঞ্চের গ্রীন-রুম দেখাতে হবে, এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। যদি না থাকে, তবে দ্বন্দ্ব বিরোধ দুঃখ কষ্ট ক্লান্তি ফোটাবার দায়িত্ব যামিনীবাবুর নেই। অথচ যে তাঁকে জানে, সেই জানে যে কত বিরোধের মধ্য দিয়ে কত কষ্টের পর তিনি এগিয়েছেন, ছবি এঁকেছেন। অনেক ছবি তিনি আঁকেন নিশ্চয়ই। তাঁর মানে নয় যে, তাঁর সৃষ্টির পিছনে কোনো কষ্ট নেই। ছবিতে সে কষ্ট

ফোটেনি, বরঞ্চ এইটাই তাঁর বাহাদুরি। দুঃখকে হজম করে শান্ত হওয়া—এইটাই ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষত্ব শুনেছি। তা যদি নাও হয়, তবু ডিগ্নিটি, পয়েজ-এর মূল্য নিশ্চয়ই আছে। (এটা আমি পাইনি আজকালকার রুশ সাহিত্যে ও চিত্রকলায়। আধুনিক চীনে সাহিত্যেও কমছে সন্দেহ হয়েছে।) যামিনীদার বাড়িতে চীনা-আমেরিক্যান যে দুই-ই আসে ছবি দেখতে, সেটা পলিটিক্যাল ব্যাপার নয়, আর্টের ভ্যালু-র ব্যাপার।

এই পয়েজ, এই ডিগ্নিটি, এই স্থিতধিতা কিন্তু স্থিতিস্থাপকতা নয়। অশোক ঠিকই ধরেছে যে, যামিনীদার ছবিতে একটা ডাইন্যামিক পয়েণ্ট আছে। (সব বড় আর্টিস্টেরই সব ভালো ছবিতেই তা থাকতে বাধ্য।). কিন্তু তাই বললেই যথেষ্ট হবে না। সেই চলিষ্ণু বিন্দু থেকে কিভাবে গতির প্রসার হচ্ছে : এইটাই প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, প্রসারে ভারসাম্যের ব্যাঘাত ঘটেছে কি না। তৃতীয় কথা, নতুন ভারসাম্য (ডাইন্যামিক ইকুইলিব্রিয়ম) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না। আমার বিশ্বাস, যামিনীদা প্রধানত সরল রেখার ব্যবহারে নতুন ভারসাম্য প্রস্তুত করে এসেছেন এত দিন। (যামিনীদার ছবিতে পুরুষের ও কখনও স্ত্রীলোকের শিরদাঁড়া খাড়া সোজা, কাঁধ শক্ত ও লম্বা, চোখ পটলচেরা অর্থাৎ সরল রেখা।) বাঁকা রেখা যখন ব্যবহার করেন, তখন সেটা যেন সম্পূর্ণ হতে চায়—এটাও সরলতার লক্ষণ। মিশরী ধরনের ছবির আঙ্গিকের তাই অর্থ। যামিনীদার ছবিতে শান্তি আছে। শান্তিরসপ্রধান কিংবা শান্তিরসাত্মক বললে অন্য রসের অভাব মনে ওঠে। পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গীতে 'পয়েজ' 'ডিগ্নিটি' মানুষিক নয়, মনুষ্যোচিত—আধুনিক মানুষের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি, গাম্ভীর্য।

১৯-৯-৫৫

আজ সন্ধ্যায় ডাঃ নুরুল হাসান তার উদ্বোধনী ভাষণ পড়লে। নুরুল হাসান ইতিহাসের ভালো স্কলার। অল্প বয়সে প্রোফেসর হয়েছে এবং হবার যোগ্য। বিষয় হলো ভারত ইতিহাসের মধ্য যুগের ঐতিহাসিক সমস্যা। ইতিহাস-দর্শন সম্বন্ধে আধ ঘণ্টা বিচারের পর কুড়ি মিনিট কাল বিশেষ সমস্যার আলোচনা করলে। শেষাংশটুকু আরো বিশদ হলে ভালো হতো। বিকেলে ইশায়া বার্লিন-এর 'হিস্টরিকাল ইনেভিটেবিলিটি' শেষ করি। বক্তৃতার পর ব্লক-এর 'হিস্টোরিয়ান'স ক্রাফ্‌ট'-এর দুটি অধ্যায় আবার পড়লাম। নুরুল হাসানও বার্লিন অক্সফোর্ড, আর ব্লক প্যারিস। ব্লক আমার প্রিয় ইতিহাস-লেখক। অল্প বয়সে মারা গেলেন, জার্মানরা গুলী করে মারলে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, জার্মান-বিরোধী দলের গুপ্ত নেতা। বইখানি অসম্পূর্ণ কিন্তু হীরের টুকরো। ইতিহাসের কার্য-কারণ সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ বই লিখতে চেয়েছিলেন, তা ঘটে ওঠেনি। একটি ছোট্ট অধ্যায়ে সামান্য ইঙ্গিত আছে।

নুরুল 'হিস্টরিকাল কজেশ্যন' নিয়ে কোনো মন্তব্য করলেন না। শক্ত হতো অবশ্য, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম। বার্লিন সাহেবেরও বয়স কম। অক্সফোর্ডে তাঁর বক্তৃতায় ভিড় হয় রীতিমতো। অনেকেই বললেন, সব চেয়ে ব্রিলিয়েণ্ট 'ডন'। বেশি কথা বলেন, একই কথা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে, বারবার। কিন্তু মন আছে। ব্যক্তির

দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁর ঝোঁকটি সত্যই মূল্যবান। তাঁর 'এম্পিরিসিজ্‌ম'টাও সুস্থ। কিন্তু মার্কসিস্টরা যখন 'মেকিং হিস্ট্রি' বলেন, তখন কি অনিবার্য নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন? 'ভ্যলগার মার্কসিস্ট'দের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু এই প্রকারের 'আন্ট স্যালি' খাড়া করা সততার পরিচয় নয়। অবশ্য এই চলছে পণ্ডিত মহলে।

অবশ্য গোড়ার দিকে মার্কস্‌ ও এঙ্গেল্‌স এক প্রকার ডিটারমিনিজ্‌ম প্রচার করেছিলেন নিশ্চয়। চলতি মতবাদের বিপক্ষতা তাঁদের করতে হয়েছিল। কিন্তু পরে, বহুবার তার ব্যত্যয়ও দেখিয়েছেন। প্রথম উক্তির ভার নামানো শক্ত। ম্যাক্‌স-মূলর এরিয়ান রেস প্রথমে লিখে পরে প্রত্যাহার করেন, তখন আর কে শোনে! গান্ধীজির হিন্দ স্বরাজে পশ্চিমী যান্ত্রিক সভ্যতার বিপক্ষে অনেক কটু কথা লেখেন। পরে মত অনেকটা বদলালেন, তবু গান্ধী মানে মাত্র চরখা! রবীন্দ্রনাথের মেসেজ অব দী ফরেস্ট, আর্টিস্ট একাকী ('আমার ধর্ম'), কিন্তু কোনোটাই তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্য নয়।

ব্যাপারটা বোধ হয় এই: (মহাপুরুষেরা জনমতের বিপক্ষে নিজেদের মত খাড়া করবার জন্য একটু উগ্রভাবেই বলে থাকেন। নচেৎ লোকে গ্রহণ করবে কেন? আত্মসমর্থনও তো চাই!) বার্লিন সাহেবের ব্যাপার অন্য। তাঁর নিজের মত কি বোঝা গেল না। তাঁর বুদ্ধির প্রাখর্যের বলে তিনি নিজে যে একজন বিশেষ মন-সম্পন্ন ব্যক্তি তারই প্রমাণ হলো। এর পিছনে একটা অধ্যাপকসুলভ দম্ভ রয়েছে। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নতা ও নিজেদের ছোট গণ্ডির মধ্যে তীক্ষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ঐ ধরনের ব্রিলিয়েন্স-এর প্রয়োজন ঘটে। বিশেষত অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজে। সে যাই হোক, এম্পিরিসিজ্‌ম দর্শন নয়—দৃষ্টিভঙ্গী। বহু দৃষ্টিকোণের বহু ভঙ্গী।

ইতিহাসের দর্শন সম্ভব কি না, তা নিয়ে বহু তর্ক আছে ও আরো চালানো যায়। র‍্যাঙ্কে ও ফিশার বলেছেন, ইতিহাসের ফিলজফি নেই, হওয়া সম্ভব নয়। আমার ক্ষুদ্র মতে—আছে ও সম্ভব। তবে ফিলজফির অর্থ ভূয়োদর্শন ও ইতিহাসের অর্থ মানব-সভ্যতার গতিবিধির চেয়ে অধিক হলেই মুস্কিল। আমার দলেও বড় বড় লোক আছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস (সভ্যতা অর্থে)—দর্শন সম্বন্ধে একটা বই ও গোটাকয়েক বক্তৃতা দিই ও প্রবন্ধ লিখি, ইংরেজীতে ও বাঙলাতে। শেষে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। সেগুলো নতুন করে সাজাতে হবে···

কেন এমন হয়? কেন শক্ত জিনিস ধরতে চাই, কেনই বা ছেড়ে দিই? এক উত্তর—দম্ভ। খানিকটা সত্য, পুরোপুরি নয়। বাকিটা শিক্ষা। প্রথমে পারিবারিক শিক্ষা। সারাদিন মোকদ্দমা চালিয়ে সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে স্প্রিং-এর খাটে শুয়ে বাবা আমাকে বললেন, মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ে শোনাও। মর্লের লেখা গ্ল্যাডস্টোনের জীবনীও মধ্যে মধ্যে পড়তে হতো। তখন বয়স বোধ হয় দশ এগারো। তিনি ব্যাখ্যা করতেন মিডলোথিয়ান ক্যাম্পেন-এর ডিস্‌রেলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণগুলি, সেই সঙ্গে ইংরেজী পার্লামেণ্ট আর কন্‌স্টিটিউশ্যন। মায়, ইংরেজী শব্দের উচ্চারণও শুধরে দিতেন।

তারপর স্কুলে ঈশান ঘোষের ইতিহাস আর নারাণবাবুর সাহিত্য পড়ানো: কলেজে ফাদার পাওয়ার, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, জানকীনাথ, ক্ষেত্রমোহন, বিপিন গুপ্ত, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তার সঙ্গে সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্ক আর কৈলাশ পণ্ডিতমশাই-এর সংস্কৃত পড়ানো, অঘোর চট্টোপাধ্যায়ের কেমিস্ট্রি: বিশ্ববিদ্যালয়ে

স্টিফেন সাহেব, মনোমোহন ঘোষের ইংরেজী বক্তৃতা শোনা, তার ওপর ব্রজেন শীল, বিজয় মজুমদার, রমেশ মজুমদার, বিপিন সেন, অজয় দত্ত, সতীশ রায়; সেই সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, প্যাট্রিক গেডিস এবং দূর থেকে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র: বাইরে বাইরে অবনবাবু, গগনবাবু আর অর্ধেন্দ্র গাঙ্গুলী, কুমারস্বামী, রাধিকা গোঁসাই, কেরামৎ খাঁ, বিশ্বনাথ রাও, দুর্লভবাবু, আরো কত! আমার মনে হতো, সকলেই ক্ষুদ্রে সন্তুষ্ট হতে বারণ করছেন। জানকীবাবু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পড়াতে গিয়ে প্লেটো-উপনিষদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশের অর্থনীতির আলোচনাও করেছি ও প্রমথ চৌধুরীর কাছে জমিদার-রায়তের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক কথাই শিখেছি। এমন কপাল যে, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও ঐ প্রকৃতির। বুদ্ধিবিদ্যার অসীমতাই আমার শিক্ষা। দুরাশা পোষণ করেই ক্ষান্ত হইনি, সেজন্য খেটেওছি। এটা গেল একদিক।

অন্যদিকে শেষরক্ষা করতে পারিনি। খানিকটা স্বাস্থ্য, খানিকটা অধৈর্য, খানিকটা পেশা অর্থাৎ অর্থনীতি ও সমাজ তত্ত্বের অধ্যাপনা। আজকালকার অর্থনীতি এতটা জটিল হয়ে উঠেছে যে, তার মূল কথাগুলি ধরবার চেষ্টায় নেশা হয়। যতই ইকনমিক্স পড়ছি, ততই নেশা হচ্ছে ও ততই মূর্খ হয়ে যাচ্ছি সন্দেহ হচ্ছে। এখন এমন অবস্থা যে-ধারে চোখ ফেরাই, সে-ধারেই না-জানার পাহাড়। অথচ ছাত্রদের সব সময় সব কথা বলাও যায় না!

তা' হলে, দাঁড়ালো কি? কি আর দাঁড়াবে? উইলিয়ম জেম্‌স ক্লাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজের মনে যা আসতো তাই বকে যেতেন। একদিন ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করলে, 'What then, Sir, is your conclusion?'

জেমস উত্তর দিলেন,—

'Conclusion ? Is the universe concluded that I should come to a conclusion ?'

জীবনের অন্তে সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে ধস্তাধস্তি, রগড়া-রগড়ি। খেটে যাও আর ঘণ্টায় ষাট মিনিট বেগে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হও। ব্যস্! ফাদার পাওয়ার বলতেন, Who cares !

১৩-৯-৫৫

হেরাক্লিটাস পড়া গেল। এক পাদ্রী সাহেব হেরাক্লিটাস আর লাওৎসের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর ধারণা যে, দু'জনেই বছর পাঁচশ' পরে জন্মালে নিশ্চয়ই খৃস্টান হতেন। বিশ্বের পেছনে খৃস্টানী গোঁড়ামি লুকিয়ে রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যার মধ্যেও উপনিষদ আছে, তবে তিলমাত্র গোঁড়ামি নেই। এথেনিয়ন স্বর্ণ যুগের কিছু আগে পর্যন্তও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভাবছিলেন, দেশ উচ্ছন্ন গেল, লোকে সত্যসন্ধানে বিমুখ হয়ে পড়েছে, জনসাধারণের অরাজকতা এসেছে ইত্যাদি। এইরকম বিপর্যয়ের সন্ধিক্ষণেই কি মানুষের মাথা খোলে ? দরায়ুস হেরাক্লিটাসকে পারস্য দেশে আসতে নিমন্ত্রণ করেন।

চিঠিতে আছে, 'গ্রীস দেশে গুণের কদর নেই। আপনি চলে আসুন, এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও প্রকৃত সমাদর পাবেন।'

হেরাক্লিটাস যাননি। ভদ্রলোককে কন্‌স্টিটিউশনের খস্‌ড়া করতে অনুরোধ জানানো হয়। দেখা গেল, আর্টেমিসের মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছেলেদের সঙ্গে তিনি গুলি খেলছেন। 'আপনি এখানে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আরে মশাই, ছেলেমানুষি যদি করতেই হয়, তবে ছেলেমানুষদের সঙ্গে করাই ভালো। জ্ঞানী লোক ছিলেন, প্রোসেস্‌-এ বিশ্বাস করতেন। সক্রেটিস্‌ পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য ঠিক ধরতে পারেননি। তবে তাঁর অগ্নি-দর্শনের মধ্যে এক মহান্‌ অনুভূতি রয়েছে। পারমেনাইডিস ও হেরাক্লিটাসের বিবাদ এখনও ফুরোয়নি। প্রাক্‌-সক্রেটিস দর্শন ও ধর্ম ভারতবাসীর মনোগ্রাহী।

এতদিন বেশ ছিল। সর্বনাশ করলেন ঐ অ্যারিস্টটল, ফিলজফির প্রথম প্রোফেসর! শাদা-কালোর মধ্যে 'কোল্ড ওঅর'-এর জনক ঐ অ্যারিস্টটল। 'Either-Or' পৃথিবীকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। এক পণ্ডিতের মতে আজ-কালকার উন্মত্ততার হেতু ঐ অ্যারিস্টটলের সিলজিস্‌ম। রাসেল বলছেন, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতিতে যা কিছু অগ্রগতি হয়েছে, তা' অ্যারিস্টটলের শিষ্যবৃন্দের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই। হেরাক্লিটাসের যুক্তিপদ্ধতি ডায়েলেক্টিক, আমাদেরও আসীৎ-অনাসীৎ একত্রে। 'ক কখনও একত্রে ক ও ক নয় হতে পারে না' যদি সত্য হতো, তবে প্রেম বস্তুটা জগৎ থেকে উবে যেতো। শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যেক জিনিসই অন্য স্তর থেকে দেখতেন। প্রকৃত সমদর্শী হতে গেলে উপরে উঠতে হয়।

২৪-৯-৫৫

পুরাতন গেজেটিয়ার নতুন করে লেখার প্রয়াস চলছে। এখানকার কলেক্টর জনকয়েককে ডেকেছিলেন। শহরের মাতব্বরদের মধ্যে বহু ছাত্রের সঙ্গে দেখা হলো। সকলেই খুশি। খুশি তো হলেন, কিন্তু ঘাড়ে কাজ চাপলো। সরকার এক পয়সা খরচ করবেন না। অথচ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক আরো কত কী-র পরিবর্তনের ইতিহাস চান। থুতুতে ছাতু ভেজে না। আদমস্তুমারির কাজে এটা জুড়ে দিলে হতো। এইখানে বাঙলা জিতেছে। মৌর্য যুগে আদমস্তুমারি বাৎসরিক ব্যাপার ছিল। তার ওপর সরকার আলিগড়ের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসও চান। কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে পড়ে। সরকারী ইতিহাসের আমি বিপক্ষে। তবে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ সত্যকারের শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি সত্য কথা বলেন ও সহ্য করেন। দেখি কতদূর এগোয়! এ সম্বন্ধে আমার অন্য ধারণা। জনগণের ইতিহাস এখানে কে লিখবে! মালমশলা যোগাড় করতেই বছর কয়েক লাগবে। তার ওপর পরিবর্তন। প্রায় দুঃসাধ্য, যদি না একটা বড় টীম এই কাজে লেগে থাকে। ক্রোচ-এর মতে ইতিহাস স্বাধীনতার ইতিহাস। বড্ড হেগেল-বাদী। আমার মনে হয়, ইতিহাস স্বাধীনতা ও নিয়তির দ্বন্দ্বের ইতিহাস।

•

ইতিহাস বিজ্ঞান-সম্মত অনেকটা, বাকিটা কবিতা। অর্থাৎ

কবিতা হিসেবেও দেখা যায় এবং কবিতা যতদূর বোঝা যায়, ততদূর ইতিহাসও বোঝা যায়। পশ্চিমী সভ্যতার ইতিহাসের মূল সূত্র হয়তো অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স-এর মধ্যে আছে। অন্তত স্পেঙ্গলার, টয়েনবীর রচনা পড়লে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। আর. পি. ব্ল্যাকমার লিখছেন।

"...We have Aristotle frankly at work in Toynbee's version of his Poetics.···For Toynbee constantly sees the action in his history in the terms of Aristotelian poetics--especially in hamartia or the tragic fault by which we explain and even excuse but cannot justify human action, in anagnorisis or the blinding recognition by which we see the motives of our own actions and natures, and in peripeteia or the reversal of role where we find both our motives and our fates were far deeper in ourselves and outside ourselves than we had known; and the passage of history in each of the countries named above as seen through these terms comes alive as praxis or action."

পরে আরো অনেক কথা লিখেছেন ব্ল্যাক্‌মার·· ···

আমার মনে হচ্ছে: (১) এই ধরনের মন্তব্য পশ্চিমী সভ্যতার এক ধরনের ঐতিহাসিকের প্রাথমিক মনোভাব সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। টয়েনবী, স্পেঙ্গলার, হেগেল, এমন কি মার্ক্‌স—যিনি গ্রীক ট্র্যাজেডির অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন—এঁদের মধ্যে হ্যামাটিয়া, আনাগণরিসিস্, পেরিপেটিয়ার আমেজ

নিশ্চয় আছে। কিন্তু আমাদের ইতিহাসের ঐতিহাসিকদের মধ্যে? অবশ্য ঐ ধরনের ভারতীয় ঐতিহাসিক নেই। কেবল তাই নয়, কর্তারা বলেন, আমাদের ইতিহাসই নেই। সে যাই হোক, আমাদের ইতিহাসের ট্র্যাজিক ফল্ট কি? জাতিভেদ, মুসলমান রাজত্ব, অন্তর্বিবাদ, দার্শনিকতা? সংস্কৃত কাব্যবিচার অনুযায়ী শান্ত রসই আমাদের সভ্যতার মূল রস নয় কি? বহুর মধ্যে একের সন্ধান? আমাদের কাব্যবিচারে ট্র্যাজেডিই নেই, কারণ ইতিহাসের দুর্ঘটনাকে ঐ ধরনের ট্র্যাজেডি হিসাবে বোধ হয় কখনও ধরিনি।

৫-১০-৫৫

লক্ষ্ণৌ-এ বেশ কাটানো গেল, এক হিসেবে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, আলাপ-আপ্যায়ন। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কিন্তু নতুন চিন্তার খোঁজ পেলাম না। চিন্তা করবো কখন? প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত! এমন সর্বব্যাপী ব্যর্থতা আমার কল্পনাতীত। আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে, ঠিক অবসর নেবার মুখে মুখে আলিগড়ের নিমন্ত্রণ পেলাম। আর এক বছর থাকলে সন্ন্যাসরোগে মারা যেতাম। এলাহাবাদের ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে লক্ষ্ণৌ-এর ছাত্ররা টোকেন স্ট্রাইক করলে শুনলাম। কোনো

গোলমাল হয়নি। এ-সব আমার অপছন্দ। তবু লক্ষ্ণৌ-এর ভদ্রতার তুলনা হয় না।

রাত্রে একটি মিরাসী ঘরের মেয়ের গান শোনা গেল। মেয়েটির বাবা বললেন, মিরাসী ওস্তাদ আর কেউ নেই। বেশি কিছু জানে না, কিন্তু অপূর্ব কণ্ঠ। যেমন জোরদার, তেমনি দরদী। পুরানো বাড়ির পুরানো বৈঠক। যেন বেচারীকে কখনও মাইকের সামনে গাইতে না হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের স্নেহ অধ্যাপকদের শ্রেষ্ঠ, বোধ হয় একমাত্র সম্পদ। যে-সব ছাত্রকে রিসার্চে লাগিয়ে এসেছিলাম তাদের উৎসাহ কমেছে সন্দেহ হলো।

ডাক্তার দেখালাম। সকলেই বললে, চুপচাপ শুয়ে থাকতে। চা-কফি-সিগারেট খেতে বারণ করলে না। লক্ষ্ণৌ-এর ডাক্তার ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো শহরের ডাক্তার কি অতো বুঝদার, অত ভদ্র হয়। মস্কোর ডাক্তাররা সব বন্ধ করে দিয়েছিল। কেবল তাই নয়, গাইডদের পর্যন্ত হুকুম হয়েছিল দেখতে যেন সিগারেট-চা না খাই। ঐ এক জায়গায় হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিলাম রেজিমেণ্টশনের অর্থ। শেষকালে আধ ঘণ্টা অন্তর স্নানের ঘরে যাওয়া। বলে কিনা ভড্‌কা সিগারেটের চেয়ে কম ক্ষতিকর! বলে কিনা সিগারেট খেলে ক্যান্সার হবে! আমি সিগারেট খেয়ে ক্যান্সারই করি আর যাই করি, সেটা আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আমার হিউম্যান ডিগ্‌নিটি, আমার কন্‌জিউমারস্‌ সভারেন্টি! ওপ্রকার চিকিৎসা ভারতবর্ষে চলবে না। ভারতবর্ষে চলে তো লক্ষ্ণৌ-এ কখনও চলবে না। এমন স্বাধীন শহর হয় না! হজরতগঞ্জের রাস্তার ওপর দল বেঁধে দাঁড়িয়ে গল্প করবো, মোটর চাপা দিক দেখি! লক্ষ্ণৌ শহরে মোটর চাপা দেখিনি বত্রিশ বৎসরে।

সকলে চাপা পড়ে মরতে তৈরি, অথচ কেউ মরছে না, কারুর গায়ে আঁচড় পড়ছে না! গাড়ি থামিয়ে নেমে অনুরোধ করুন, 'একটু মেহেরবাণী করে যদি... ...', অমনি মাপ চেয়ে ইঞ্চিখানেক সরে দাঁড়াবে। এই যে মৃত্যু ও জীবনের সঙ্গে মধুর বোঝাপড়া, এই তো স্বাধীনতা, এই তো বিশুদ্ধ ডিমক্রাসি, এই তো ভদ্রতা!

রাত্রে আলি আকবরের স্বরোদ শুনলাম। অবশ্য রেডিওর লঙ রেকর্ড। এ-পন্থাটা ভালো। আমাদের সঙ্গীত পনেরো মিনিটের আগে জমাতে না। আলাপেই পনেরো কুড়ি মিনিট অন্ততপক্ষে। তারপর অস্থায়ী আরো পনেরো। তবে আধ ঘণ্টার পর যেন একঘেয়ে হয়ে যায়। বয়সের দোষ কি আর কিছু? যুবা বয়সে এম্‌দাদ খাঁ'র পুরিয়া আড়াই ঘণ্টা ধরে শুনি। তখন ক্লান্ত হইনি। তাঁর পুত্র এনায়েৎ খাঁ, পৌত্র বিলায়েৎ খাঁ'র সেতার অনেকক্ষণ ধরে শুনেছি। এম্‌দাদের 'ঘরানা' আমার জীবদ্দশায় তৈরি হলো। এ ঘরের সৃষ্টিশক্তি প্রচুর। তেমনি আলাউদ্দিন, আবদুল করিম খাঁ'র ঘরের। এক এক সময় মনে হয়, আলি আকবর, রবিশঙ্কর একটু বেশি পরীক্ষা-শীল। অর্থাৎ সব মিশ্রণ আমার ঠিক কানে বসে না। নিশ্চয়ই আমার কানের দোষ। পরীক্ষা চলুক, পরে কানে বসবে, রূপ স্বকীয় হবে। গোটা কয়েক হবে, গোটা কয়েক হবে না, তাতে কি আসে যায়! 'মেনি আর কল্ড ফিউ আর চোজ্‌ন'। ছাত্রদের বেলাও তাই। প্রাকৃতিক নির্বাচন আর সামাজিক নির্বাচন দুটো এক না হলেও পদ্ধতির মিল আছে তাদের মধ্যে। পার্থক্য বুদ্ধির প্রয়োগে। অবশ্য বুদ্ধিরও পরীক্ষা আছে। সেটা চলছে। সাঙ্গীতিক বুদ্ধি আর লেখাপড়ার বুদ্ধি এক নয়। তবু সাধারণ

বৈদগ্ধের একটা মূল্য আছে মনে হয়। তার ফলে পরীক্ষার প্রবৃত্তি জাগ্রত থাকে এবং পরীক্ষার রীতি-নীতি বোঝা যায়; তার ওপর দখল আসে, ভুল ভ্রান্তি কম হয়।

আমার মনে হয়, মুঘল চিত্র আর খেয়ালের ধর্ম অনেকখানি এক। রাজপুত চিত্র, মাড়োয়ারী লোকসঙ্গীত আর চারণ-বর্ণিত ইতিহাস; অষ্টাপদী, কীর্তন, পট আর বিষ্ণুপুরের স্থাপত্য-ভাস্কর—প্রতি তিনটির মধ্যে যেন একই সূত্র রয়েছে। সেই সূত্র ধরতে পারলে নতুন সৃষ্টির রীতি-নীতিও বোঝা যায় মনে হচ্ছে। রাইক্স-মিউজিয়মের সপ্তদশ শতাব্দীর ছবির সঙ্গে খালের ধারে বণিকদের আপিস-বাড়ি, গুদোম, বসতবাড়ির মিল ঘনিষ্ট। অবশ্য তিনের কোনটা বেশি খোলে। একজন বিদেশী অধ্যাপক আমাকে এই প্রশ্নটি করেছিলেন, "কেন কোনো দেশে কোনো একটি যুগে একটি বিশেষ কোনো আর্ট অন্য আর্টের চেয়ে বেশি ফোটে?" ব্যাপারটা ঘটে দেখেছি কিন্তু তার সামাজিক ব্যাখ্যা জানি না··· ভেবে কূল-কিনারা পেলাম না। সামাজিক ব্যাখ্যা অচল না কি? অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও মাথায় এলো না। সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ্ আর্টের বেলায় সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা কিন্তু সবচেয়ে সোজা। একটা দার্শনিক আবহাওয়া? যুগাত্মা? অনেক জার্মান পণ্ডিত তাই বলতেন। একটা ·ব্যাখ্যায় সবটা বোঝা যায় না। কিছু দৈবের খেলা আছে। প্রতিভাকেও বাদ দেওয়া যায় না তবে আমি জোর দিতে রাজী আছি ছকের ওপর, একটা প্যাটার্ন নক্সা, একটা নেট-ওয়ার্কের ওপর।'

অগস্ট লুস্‌ক্-এর 'ইকনমিক্স অব্ লোকেশ্যন' পড়তে আরম্ভ করেছি। ওখানেও সেই সিস্টেম অব নেট-ওয়ার্কস্-এর আলোচনার পর কতকগুলি নূতন ফ্যাক্টর-এর বিচার। ফিরোজাবাদে কেন

অতো চুড়ি তৈরি হয় ? কাঁচামালের কোনো সুবিধে নেই, রেলওয়ের ভাড়ার সুবিধেও নেই, অথচ ভারতবর্ষের মেয়েরা যত চুড়ি পরে, তার শতকরা আশী ভাগ ফিরোজাবাদের। অর্থাৎ একবার শুরু হলে এবং অন্যান্য সুবিধে থাকলে উৎপাদন চলতে থাকে, তারপর বাড়ে। তবু নক্সাটাকে কারণ বলতে মন চায় না। অবশ্য কারণ মানে আদিম কারণ নয়। তবু যেন মন আদিম কারণই খোঁজে। মধ্যযুগীয় মনোভাব বটে, তবু ফীল্ড-থিওরীতে যেন মন ভরে না। কারণ আর উপকরণ, এই দুটোর মধ্যে একটাকে ছাড়তে হয়। ওটা সপ্তদশ শতকের ডাচেদের ফীল্ড অব্ বিহেভিয়র, আর গতি ফীল্ড অব্ ইকোয়েশ্যন্স না হয় বুঝলাম। তবু কেন এটা, অন্যটা নয় ?

লুস্ক্ পড়ছি। দেশের প্ল্যান-ফ্রেম তো তৈরি হলো এবং পার্সপেক্টিভ প্ল্যানিং-এর জন্য তোড়জোড় হচ্ছে। অত্যন্ত সুখের কথা। নতুন প্রদেশ কি হবে এখনও জানা যায়নি, তবে রীজ্যনাল প্ল্যানিং আর ব্যালেন্স না সম্ভব হলে কিছুই হলো না। সোভিয়েট রাশিয়ায় প্ল্যান তৈরি হবার পর রীজ্যনাল ব্যালেন্স-এ পরিণত করা হয়। একে ব্রেক-ডাউন বলে। অতএব এখান থেকে লোকেশ্যন-স্টাডি আরম্ভ হোক। প্ল্যানিং কমিশনের কাজে এখনও নতুন ভূগোলের জ্ঞান প্রবেশ করেনি। অর্থনীতিবিদ্‌রা কতদূর পারবেন বুঝতে পারছি না।

গ্রোথ-মডেল নিয়ে সেমিনারে ঘণ্টা দুই আলোচনা হলো। আবার কাল হবে। হ্যারড-ডোমার-সিঙ্গার প্রভৃতির প্রবন্ধ পড়া ছিল। আলোচনা তো হলো। কিন্তু কীন্স-এর ব্যবহৃত 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' কথাটি কেবলই মনে পড়ছিল। স্টাটিক আর ডাইন্যামিক —কথা দুটিরই বা অর্থ কি ? অণু ও তরঙ্গ পৃথক স্তর যেমন, এও

কি তাই? অন্য উন্নত বিজ্ঞান থেকে প্রত্যয় ধার করার বিপদ আছে। ফোর্স, রেসিস্টান্স কিংবা ফ্রিকশ্যন, ইকুইলিব্রিয়ম, প্রোসেস্ প্রভৃতি অঙ্ক কিংবা ভূতবিদ্যার প্রত্যয়গুলি কি অর্থনীতির বেলায় খাটে? আমরাও ঐ শব্দগুলির ব্যবহার করছি, কিন্তু এক অর্থে? মনে হয় না। এফ. এইচ. নাইট তাঁর 'এথিক্স অব্ কম্পিটিশ্যন' বই-এর স্ট্যাটিক্স এবং ডাইন্যামিক্স নামক অধ্যায়ে লিখছেন :

"Our general conclusion must be that in the field of economic progress the notion of tendency toward equilibrium is definitely inapplicable to particular elements of growth and with reference to progress as a unitary process or system of interconnected changes is of such limited and partial application as to be misleading rather than useful. This view is emphasized by reference to the phenomena covered by the loose term 'institution'."

এইসব ঘটনার ইতিহাস আছে। কিন্তু যে কাল-বৃত্ত ইতিহাসের বিষয়, সেখানে প্রাইস্-ইকুইলিব্রিয়ম প্রভৃতি প্রত্যয় অপ্রযোজ্য। তিনি তাই বলেন যে, ইতিহাসের মূল পরিবর্তনগুলির আলোচনায় শক্তি, প্রতিরোধ এবং গতি প্রভৃতি নির্দিষ্ট শব্দগুলি এবং গতানুগতিক যান্ত্রিক তুলনার ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জন করে আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে। নাইট সাহেবের মাথা ঠাণ্ডা, আমি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। কিন্তু প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল বই-এর আকারে ১৯৩৫ সালে। তারপর অর্থনীতিবিদ্‌রা বুঝেছেন যে, মেকানিক্যাল

অ্যানালজিকে কিছু অদল-বদল করা চাই। তাই 'গ্রোথ' শব্দটির প্রয়োগ। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা 'চেঞ্জ' কথাটি ব্যবহার করছেন। অর্থনীতিবিদ্ এখনও ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, ইকনমিক হিস্ট্রি কথাগুলি ছাড়তে পারেননি। সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এখনও ঐ চলছে। 'গ্রোথ'-ব্যাপারে দিকনির্ণয় নেই। দিক, ডিরেকশ্যন, কেবল অ্যাঙ্গল বিট্যুইন চেঞ্জেস। কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট-এর নিশ্চয়ই একটা দিক আছে। 'প্রোগ্রেস্' কথাটি তো ছেড়েই গিয়েছে। তেমনি ইকুইলিব্রিয়ম হলো প্রোসেস্—তার বিলম্বিত লয় হলো গিভ্‌ন কণ্ডিশ্যন, যার মধ্যে একটা, কি তারো বেশি প্রোসেস্ দ্রুত লয়ে চলছে একটা চলন্ত সাম্যের দিকে। তা তো বুঝলাম (অর্থাৎ কিছুই বুঝলাম না), কিন্তু আমাদের কি প্রয়োজন ? চেঞ্জ, গ্রোথ, ডেভেলপমেণ্ট, প্রোগ্রেস—কোন্‌টার দিকে বেশি ঝোঁক দিলে ছাত্ররা ভবিষ্যৎ ভারতের স্রষ্টা হবে ?

আমার মনে হয়, ডেভেলপমেণ্ট-এর দিকটাই জোর দেওয়া ভালো। তারই অঙ্গ হবে চেঞ্জ, গ্রোথ ইত্যাদি। পাঠ্যতালিকা সব বদলে দিয়েছি ঐ কথাটি মনে রেখে। ম্যাক্রো-ইকনমিক্সটাই প্রধান হোক। এক ধারে মার্জিনাল কস্ট নিয়ে অধ্যাপকরা ব্যস্ত আর ওধারে সরকার মহোদয় গড়পড়তা খরচ অনুসারে সংসার চালাচ্ছেন। এইসব নানা কারণে গ্রোথ-মডেল তৈরি করা যেন একরকমের খেলা মনে হয়। বেশ মজা লাগে ; কিন্তু ঐ মজাই ! এল্‌কেমি যেমন পরে কেমিস্ট্রি হয়েছিল, তেমনি হয়তো মডেল-নির্মাণ থেকে কোনো না কোনো দিন ইমারৎ তৈরি হবে। এই আশা-বিলাসকেই আদর্শবাদ নাম দেওয়া হয়। আমরা সত্যই বোকা বনতে সদাই রাজী।

জে আর ক্যাণ্টর বিজ্ঞানের ইতিহাসের তিনটি স্তর দেখাচ্ছেন :—(১) সাব্‌স্ট্যান্স-প্রপার্টি স্টেজ, (২) স্ট্যাটিস্টিক্যাল কো-রিলেশ্যন স্টেজ এবং (৩) ইন্টিগ্রেটেড ফীল্ড স্টেজ।

বেশ কথা; কিন্তু ফীল্ড-স্টেজে পৌঁছানোর সঙ্গে সর্বগত নিয়ম বা সূত্রের বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। তখন দাঁড়াবো কোথা? ফীল্ড-এ? সেটাও তো মাত্র ফ্যাংশনাল কো-রিলেশ্যন! ক্রমেই পায়ের নিচে মাটি জল আর জল হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। কেবল তাই নয়, অনুবন্ধগুলো তো বিশেষ—তা অণুই হোক আর গুচ্ছই হোক এবং প্রতি বিশেষের ইতিহাস পৃথক। ফীল্ড-স্টাডির ডাইন্যামিক সূত্রগুলো কি? অবশ্য আজ একটা ফীল্ড-স্টাডি করলাম, কিছুকাল পরে সেইটাই আবার 'স্টাডি' করলাম, এতে খানিকটা গতির প্রকৃতি বোঝা যায়। রেডফীল্ড আর লিউইস মেক্সিকোর এক গ্রাম নিয়ে তাই করেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ফীল্ড-টা আর ঠিক সেইটা রইলো না। তৎসত্ত্বেও ইকলজিক্যাল স্টাডির মূল্য খুব বেশি।

ছাত্রদের নিয়ে সার্ভে করাচ্ছি। টেক্‌নিক খানিকটা শিখেছে। কিন্তু মূলে যুক্তির ফাঁকি—ফাঁকি ঠিক নয়, প্যারাডক্সটা রয়েই গেল। আমি চাই ছাত্ররা সামাজিক সত্তার সম্পর্কে আসুক। এই সম্পর্কে নেই বলেই তারা নিরাগ্রহ, অ-সংযত। তবু একদিন তাদের বলতেই হবে যে, সার্ভের কোনো আঙ্গিকের সাহায্যেই গতির ধর্ম বোঝা যায় না। প্রত্যেক সার্ভে স্ট্যাটিক হতে বাধ্য। অথচ দেশ দাঁড়িয়ে নেই, চলিষ্ণু এবং আমার বিশ্বাস এগুচ্ছে—অন্তত দেশের অগ্রস্থিতি চাই, ছাত্রদেরই মাধ্যমে। ঠিক বুঝি না, কি করা উচিত।

৭-১০-৫৫

আমেরিকান এনথ্রপলজিক্যাল এসোসিয়েশ্যন থেকে ভিলেজ ইণ্ডিয়া—স্টাডিজ ইন দী লিট্‌ল কম্যুনিটি, এডিটেড বাই ম্যাকিম ম্যারিয়ট বেরিয়েছে। রেডফীল্ড আমাকে 'লিট্‌ল কম্যুনিটি' নামে পুস্তকাকারের বক্তৃতাগুলিও পাঠিয়েছেন। ম্যারিয়ট এই আলিগড়ের পাশে কিশন-গঢ়ী নামে এক গ্রামের সামাজিক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি প্রায় এক বছর এখানে ছিলেন। অনেক তথ্য শিখলাম। বেশ লেখা, কোথাও কোথাও একটু ছেলেমানুষী আছে। পূজা-পার্বণের 'স্যাংস্কৃটিক ট্র্যাডিশ্যন' বস্তুটা কি? পুরুত ঠাকুরের মন্ত্রপাঠ? যাই হোক, গ্রামটা যখন জানি না, তখন সত্য-মিথ্যার বিচারে আমার অধিকার নেই। আর একটি প্রবন্ধ মজার Notes on an approach to a study of personality formation in a Hindu village in Gujrat. লেখক খেটেছেন খুব। পার্সন্যালিটির বাঙলা কি? আমেরিকান পণ্ডিতরা আজকাল যাকে পার্সন্যালিটি বলেন, তার কোনো ভারতীয় প্রতিশব্দ আছে কি? ওঁদের সভ্যতার তাড়ায় ওঁদের ব্যক্তিগত জীবন বিক্ষুব্ধ, ছিন্ন-ভিন্ন। তাই পার্সন্যালিটির চর্চা। আমি একাধিক আমেরিকান পরিবারের অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়ে দেখেছি, একাধিক আমেরিকান রিসার্চ স্কলারের সঙ্গ পেয়েছি। কেমন যেন ছেমো-ছেমো! আমাদের সমস্যা অন্য রকমের। পার্সন্যালিটি রিসার্চ, টেনশ্যন রিসার্চ প্রভৃতির বিশেষ

কোনো অর্থ নেই আমাদের কাছে। তবু ঐ ধরনের রিসার্চ করতেই হবে। ঐতেই সহজে টাকা আসে এবং আমাদের অধ্যাপকরা স্ফীত হন।

রিসার্চের নামে আমাদের দেশে অনেক বুজরুকি চলছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়ে আমি অজ্ঞ। সমাজ সংক্রান্ত গবেষণার (সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ) বিষয়ে কিছু কিছু খবর জানি বিষয়গুলি কেমন যেন হাওয়া-হাওয়া, অ-বাস্তব, অনেক সময় মনগড়া। তা নিয়ে কারুর বহুরাত্রি নিদ্রাহীন অবস্থায় কেটেছে বলে মনে হয় না। ছাত্র এম-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী হয়ে গিয়েছে : 'কিন্তু স্যার, আমার ভয়ানক আগ্রহ।' 'কোন্ বিষয়ে ?' 'স্যার, বিষয় আমাকে বলে দিন। আমি খুব খাটতে পারি, স্যার। আপনি যা বলবেন, তাই করবো।' হয়তো সঙ্গে এক ঠোঙা ডালমুট কিংবা আতর মাখানো পেড়া এনেছে। 'তবু তারতম্য তো আছে।' 'তা যদি বলেন, স্যার' তবে আমি অমুক পেপারে বাষট্টি পেয়েছিলাম।' ধরা যাক, শ্রমিক কিংবা কৃষি-সমস্যা। 'শ্রমিকদের কোন্ সমস্যা ?' তারপর শ্রমিকদের দারিদ্র্যের বর্ণনা চললো। শুনতে হয়। পরে জিজ্ঞাসা করি, 'তোমার হৃদয় অত্যন্ত করুণ, তোমার ন্যায়জ্ঞান উন্নত, যুবকদের যা হওয়া উচিত। তোমার বাড়ি কোথায়, বাবা ?' কোনো এক গ্রামে। 'তোমার বাবা কি করেন ?' 'দোকান আছে গম আর গুড়ের।' 'গবেষণা করতে বছর তিনেক লাগে জানো তো ? এ ক'দিন কিসে চলবে ?' 'সেই-তো বিপদ, স্যার। আজকাল গমের দাম কমে যাচ্ছে, দোকানে কোনো লাভ নেই।' 'তোমার ভাই-বোন ক'টি ?' এক গণ্ডার কম কখনও শুনিনি। 'তোমাদের অঞ্চলে ফ্যামিলি প্ল্যানিং

ক্লিনিক খোলা হয়েছে?' ছেলেটি অনেক ক্ষেত্রেই জানে না. ব্যাপারটা কি। বোঝবার পর লজ্জিত হয়। বলি, 'লজ্জা তোমার নয়, তোমার পিতামাতার। সে যাই হোক, গমের দাম কমছে কেন?' ছেলেটি গ্রামের উড়ো খবর বলে, আমি শুনি। 'ঐটে নিয়ে কিছু ভাবো না?' 'ঠিক বলেছেন, স্যার। কোনো বই আছে?' 'অন্য দেশের সম্পর্কে অনেক বই আছে, আমাদের দেশ সম্পর্কে একটা অনুসন্ধান চলছে। বছর কয়েক আগে একটা রিপোর্ট লেখা হয়, কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ছিল।' 'স্যার, আমি ঐ বিষয়ে গবেষণা করবো।' ঘণ্টাখানেক কথাবার্তার পর ছাত্রটি সোৎসাহে চলে গেল। মাস দু'-এক দেখা নেই। একদিন রাস্তায় পাকড়ালাম। 'কি হে! কি করছো?' হয় নিতান্ত সঙ্কুচিত ভাবে বললে, 'স্যার, একটা সার্টিফিকেট দিতে পারেন?' বেচারী চাকরি চায়, চেষ্টা করছে না, মাত্র চায়। কিংবা হয়তো বললে, 'স্যার,আমার আগ্রহ ব্যাঙ্কিং-এ।' 'ওটা তো আমি জানি না মোটেই। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান।' কথায় কথায় বেরুলো হয়তো তাঁর বাবা সংসার চালাবার জন্য, তার মধ্যে তাকে ও তার ছোটভাইকে শিক্ষা দেবার জন্যও, মহাজনের কাছে হাজার দুই টাকা কর্জ করেছেন শতকরা পনেরো টাকা হারে। দেশী মহাজনের, সমবায় সমিতির কথা পাড়লাম। শেষে ছাত্রটি ঠিক করে ফেললে, দেশী মহাজনের সম্বন্ধে কিংবা সমবায় সমিতি সম্বন্ধেই কাজ করবে। বহুৎ আচ্ছা! 'স্যার, আমাকে খানকয়েক বই-এর নাম বলে দিন, যেগুলো লাইব্রেরীতে পাবো। আর স্যার, লাইব্রেরীয়ানকে বলে দেবেন যে, আর কেউ এ বইগুলো না নিয়ে যেতে পারে।' 'আমার সঙ্গে কাজ করতে চাও, তবে গ্রামে গিয়ে থাকতে হবে, তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বাবা, আমি

বই-এতে বিশ্বাস হারিয়েছি।' ছাত্রটি কিছুদিন কাজ করলে হয়তো একটা কিছু লিখেও আনলে। সাধারণত কোনো বই-এর ভূমিকার সার-সংগ্রহ মাত্র। 'এ হয়নি। আবার লেখো। গ্রামে গিয়েছিলে? তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে কেন, কি উপায়ে তিনি ধার নিয়েছেন?' 'না স্যার, এইবার যাবো। বোনের বিয়ে আসছে।' 'বেশ তো! বোনের বিয়ের খরচ কেন হয় এই নিয়েই একটু গবেষণা করো না?' ছেলেটি হেসে ফেললে। তারপর ছেলেটি উধাও। শুনলাম কেরানী হয়েছে। এটা মাত্র একটা নমুনা। এই রকম কত আসে কত যায়, তার ঠিকানা নেই। ব্যাপারটা কি? দারিদ্র্য? নিশ্চয়ই। কিন্তু তা ছাড়া আরো কিছু আছে। গবেষণার বিষয় বলে কোনো জানোয়ার নেই: সমস্যা আছে, তার সমাধানের তাগিদে বিশেষ পদ্ধতিতে চিন্তার নামই রিসার্চ, গবেষণা। ছেলেদের আগ্রহ নেই সত্য কথা নয়, কারণ সেটা মানতে গেলে মানতে হবে ছেলেদের সমস্যা নেই! ছেলেদের বহু সমস্যা আছে। আমরা কি এমনভাবে তাদের পড়াই যে, সেই সমস্যাগুলোর অন্তরের মূল সমস্যা সম্বন্ধে ছাত্রেরা সচেতন হয়? অবশ্য বিষয়ভেদে মূল সমস্যাও ভিন্ন হবে আমার বিশ্বাস যে, রিসার্চের বুজরুকি, তার অ-সার্থকতার জন্য আমাদের অধ্যাপনাই দায়ী। বাস্তব জগতের সঙ্গে আমরাই পরিচিত নই: এক চাকরিতে যেন-তেন-প্রকারেণ উন্নতি সাধন ছাড়া আমাদের শিক্ষক-জীবনে মনে হয় যেন কোনো সমস্যাই নেই; (আমরা পড়াবো এমন সব থিওরী, দেবো এমন সব দৃষ্টান্ত, যার সঙ্গে আমাদের, অতএব ছাত্রদের জীবনের ঐ সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যার কোনো যোগ নেই: আর আমরা তৈরি করবো শত-সহস্র পি-এইচ-ডি! এ হয় না।) সাধে কি মার্ক্স, লেনিন, থিওরী

আর একজনের অভিন্ন যোগ চেয়েছিলেন! অন্য ধরনের রিসার্চ নিশ্চয়ই আছে—যেমন পদার্থবিদ্যার ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ। সেখানেও দুটি জিনিস লক্ষ্য করবার রয়েছে: সামাজিক প্রয়োজন ও পূর্বতন পরীক্ষা এবং বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণের আইনকানুনের অবজেক্টিভ রিয়ালিটিতে বিশ্বাস। দুটো বাস্তব-সত্তার মধ্যে পার্থক্য নিশ্চয় আছে। কিন্তু দুটোরই তাড়ায় সমস্যা উঠে, যে সমস্যার ফলে রাতে ঘুম হয় না। ছাত্রদের আমি প্রায়ই একটি প্রশ্ন করি, 'বিষয়—সাবজেক্ট তো বেছে নিয়েছো; কিন্তু ক'রাত্রি ঘুমোও নি?' আর নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, 'সমস্যা তো দিলাম ছাত্রটিকে, কটা বড়ি বেলার্গল সেবন করতে হবে সেই সঙ্গে?' নিজেই উত্তর পাই না। সহকর্মীরাও পান কি? বোধ হয় না। নচেৎ কেন শুনি, 'আমার হাতে পঞ্চাশটা রিসার্চ-স্কলার, অথচ আমিও গণ্ডাখানেক প্রবন্ধ কিংবা বই লিখেছি এই বছর, কিংবা গত দু'বছরে?' ধন্য ধন্য, হাততালি, মহাপণ্ডিত! এতটা ফাঁকির ওপর দেশ বড় হয় না।

এই গবেষণার হুজুগ নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে। শেষকালে পারবো না। কাকে কাকের মাংস খায় না, হয়তো ভাববো। তবু এই রাত্রে নির্জনে গোপনে নিজের কাছে বলি, 'সমস্যা সম্বন্ধে সুতীব্র সচেতনতাই গবেষণার প্রধান আগ্রহ। এবং সমস্যা উৎপন্ন হয় বাস্তবেরই সংঘাতে।'

৯-১০-৫৫

সুমতি মুতাৎকারের আবার তাগিদ এলো, 'দি গ্রেট মাস্টারস্ অব মিউজিক আই হ্যাভ হার্ড' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে। রেডিও সঙ্গীত সম্মেলন উপলক্ষ্যে পুস্তিকা বেরুবে। সাধনা অদ্ভুত। স্বামী পুত্র ছেড়ে লক্ষ্ণৌ-এ সঙ্গীত শিখতে এলো, সাত-আট বছর প্রাণপণে শিখলো। তারপর ডক্টরেট অব মিউজিক নিলে। আমি একজন পরীক্ষক ছিলাম। এই না হলে মেয়ে! এই না হলে শেখা! তাকে 'না' বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু কি লিখবো ভেবে পাই না। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার আগ্রহ কমে গিয়েছে। খুব ভালো না হলে শুনতে পারি না। দেখি কাদের কথা মনে আসে। তখন ভাতখণ্ডেজী প্রায় বদ্ধ-কালা হয়ে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'অভাব মনে হয় না।' 'মোটেই না। এই তো কাল রাত্রে মঙ্গল রাগ আমার সামনে উপস্থিত হলো। ১৮৮০-৮২ সালে শুনেছিলাম যা ঠিক তাই।' এই বলে মঙ্গল-রাগ গাইলেন। বেটহোফেনের ও তাই হতো। আমার বাবা বলতেন, হদ্দু খাঁ'র ভাই নত্থু খাঁ'র কেদারার রূপের কথা। আমার কিন্তু রাগের টুকরোই মনে পড়ে। দু'জন মহা-ওস্তাদের বাজনা শুনিনি বলে খুব দুঃখ হয়, বীণ শেষান্না আর উজীর খাঁ—অথচ ইচ্ছা করলেই শুনতে পারতাম, নিমন্ত্রণও পেয়েছিলাম। আফ্সোস! অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তুলনা এসে পড়ে। অথচ আমি বিশ্বাস করি ভারতীয় সঙ্গীতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে। যখন আলি আকবর, বিলায়েৎ,

রবিশঙ্কর এখনও ঐ রকম বাজাচ্ছে তখন না করে যে পারি না।

বাঙলা কি হিন্দী আধুনিক গান চেষ্টা সত্ত্বেও বরদাস্ত করতে পারছি না। মোটামুটি বলা চলে যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সুচিত্রার কণ্ঠ শুনতে বড্ড ইচ্ছে হয়। 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে নাক ও ন্যাকামী' এই বিষয়ে যদি কেউ মজা করে কিছু লেখেন তো তাঁকে মনে মনে আশীর্বাদ করবো। ভাগ্যিস দিনুদা বেঁচে নেই! কী মিষ্টি, কী মধুর কণ্ঠ, বাঙালী মেয়েদের! গান শুনলে বিশ্বাসই হয় না যে, এঁরা স্বামী, ছোট ভাইবোন, ঝি-চাকরদের খিঁচুতে পারেন। কিন্তু পারেন। জীবন আর আর্ট ভিন্ন জগৎ। তা হোক, দুটোর মধ্যে একটা অন্তত তো বাসযোগ্য হোক।

১১-১০-৫৫

বুদ্ধদেববাবু ও প্রেমেনের স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প পড়লাম। আমি সম্পাদক হলে কিছু অদল বদল করতাম। নিজের লেখার বিচারক হওয়া কঠিন কাজ। নিজের কথায় নিজের দোষগুণ ধার্য হয় না, ইংরেজী আইনে অন্তত তাই বলে। অবশ্য কোনো সংগ্রহ বা চয়ন সকলকে তুষ্ট করতে পারে না। ক'জন আর প্যালগ্রেভ হতে পারে! তার ওপর নিজের প্যালগ্রেভ হওয়া!

টমাস ম্যান-এর মৃত্যু সংবাদে বাঙলা দেশে শোকসভা হলো

না কেন? মাতিসের মৃত্যু উপলক্ষ্যে তিন-চারটি বাঙলা প্রবন্ধ পড়েছিলাম। অথচ বাঙালী চিত্রের চেয়ে সাহিত্যই বেশি ভালোবাসে। লিজারও মারা গিয়েছেন শুনছি। আজ সারা বিকেল ও সন্ধ্যায় ম্যান্-এর তিনটি ছোটগল্প পড়লাম। অপূর্ব! অর্থাৎ ও-দেশেও অপূর্ব। ম্যান্ পড়তে আমার কষ্ট হয়, বিশেষত শেষ বয়সের নভেলগুলি। অত্যন্ত ক্লান্তিকর। চিন্তার জটিলতা এত বেশি যে, গল্পের গতি সময় সময় থেমে যায়। আর সবচেয়ে খারাপ লাগে রোগ আর পাপবোধের ব্যাখ্যান। 'টিপিকাল' জার্মান-সভ্যতার প্রতীক। জার্মানিতে থাকতে পারলেন না, আমেরিকা গেলেন, সেখানেও থাকতে পারলেন না, পালিয়ে এলেন সুইজারল্যাণ্ডে। এই ধরনের পলাতক প্রবাসী জীবন সত্যই ভয়াবহ। ভদ্রলোকের কোনো রচনায় রসিকতার চিহ্নমাত্র নেই। তবু মহান। ভিন্ন জগতেরই স্রষ্টা; অথচ এই জগতেরই আভ্যন্তরীণ সমস্যার প্রতীক। যোসেফাস সাইক্লটা শেষই করতে পারলাম না তবু। ঐ একমাত্র নভেলিস্ট যাঁর নভেলের এক অধ্যায়ের বেশি একদমে পড়তে পারিনি। প্রবন্ধগুলোও অত্যন্ত কঠিন। টিউটনিক মনই ঐ না কি! অথচ তাঁর ভাই-এর লেখবার ঢঙ বেশ সহজ! ম্যান্কে হয়তো চেষ্টা চরিত্তির করলে বোঝা যায়, কিন্তু বরদাস্ত করা যায় না। শেষ নভেলটির মাত্র একটি অধ্যায় হডসন্ রিভিউতে বেরিয়েছে। পুরো বইটা এখনও হাতে আসেনি। থীম্‌টাও সেই persona-র চরিত্রের মুখোশের। এবার মাথা বদলানো নয়, পুরোপুরি সাজা।

এ ধরনের গভীর নভেল কি গল্প আমরা কেন লিখতে পারি না কে জানে? প্রতিভা হয়তো নেই। কিন্তু চেষ্টাও তো করা যেতে পারে।

জার্মানদের না হয় 'গিল্ট সেন্স' স্বাভাবিক অর্থাৎ ঐতিহাসিক। কিন্তু ফরাসী Colon-রাই বা কি করছে মরক্কো ও এলজীরিয়াতে'! ফরাসী কাগজেরই উদ্ধৃতি দেখছিলাম। এ যুগে এই অমানুষিকতা সম্ভব! হাজার দুই লোককে খুন করা হলো! কিনীয়াতেই বা কি হলো! মলয় দেশে! এবার কি সাইপ্রাসেও আরম্ভ হবে? ইম্পিরিয়ালিজমের মরণ কামড়! অথচ ফরাসী সভ্য জাত, ফরাসী সাহিত্য চিত্র এখনও সভ্যতার নিদর্শন। আর ইংরেজ তো আদর্শ ওয়েলফেয়ার স্টেট তৈরি করেছে, ইংরেজই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডেমক্রাট, ইংরেজ কত বুদ্ধির সঙ্গে আস্তে আস্তে সরে গেল ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে! এত বড় ভণ্ডামির তুলনা ইতিহাসে মেলে না। রাগের বশে এক এক সময় মনে হয়, ফরাসী সভ্যতা অন্তঃসারশূন্য আর ইংরেজী সভ্যতা ভণ্ডামিতে ভরা। | ঘৃণা করছি না, কিন্তু মিথ্যা আচরণের বিপক্ষে তীব্র প্রতিবাদ না করলে চরিত্রের অবনতি হয়। হাঁ, নিজেদের আচরণের সম্বন্ধেও। | এখনও হরিজনরা পতিত! হিন্দুদের পাপ-বোধ নেই, ফরাসীদেরও নেই। আমরা উভয়েই পাপ করি আর মনেই রাখি না। কেউ কেউ বলেন, 'সেন্স অব্ গিল্ট খৃস্টানী কিংবা হিব্রেয়িক প্রত্যয়- -ওটা সেমেটিক নাকি! ফরাসীরাও তো খৃস্টান—ওরা অত আনইনহিবিটেড কেন? আমরা না হয় হিন্দু!

আমার মনে হয়,—গোড়ায় যাই হোক না কেন, পাপবোধটা খৃস্টানদের মধ্যে যোল কি সতেরো শতাব্দী থেকে বেড়েছে। অবশ্য আদিম পাপ, 'ফল্ অব্ ম্যান'-এর ধারণা তো রয়েইছে। যখন ভগবানের রাজ্য থেকে পৃথিবীর রাজ্যাতে নামা গেল, তখন থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট (ক্যালভিনিস্ট) 'এথিক' আর ধনিকতন্ত্রের মিল শুরু। মাড়োয়ারীদের অদ্ভুত দানশীলতার মধ্যে কি পাপবোধ লুকিয়ে

আছে? ভারতীয় দানধ্যান, এণ্ডাওমেণ্টেরও হেবেরীয়ান ব্যাখ্যা বোধহয় চলে। ইংরেজী কিনীয়া-মলয় আর ফরাসী এলজীরিয়া-মরক্কো—এই দুটোর পার্থক্য চরিত্রগত। দুই-ই খৃস্টান। চার্চহিল আবার খৃস্টান সভ্যতা আর স্বাধীন জগতকে এক বস্তু ভাবেন!

দিলীপ রায় না একবার চার্চহিল সম্বন্ধে কবিতা লিখেছিল যুদ্ধের সময়? ভাগ্যিস ছাপা হয়নি। অবশ্য রজনী সেনের একটা কবিতায় বার্ এগারো 'পাপ' কথাটি আছে যেন মনে হচ্ছে।

১১-১০-৫৫

পিয়র মন্দেঁ ফ্রান্স, (ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ছিলেন সেদিন) ও গেব্রিয়েল আর্দঁ একটি চমৎকার বই লিখেছেন, ইকনমিক্স্ এ্যাণ্ড অ্যাক্শ্যন। দু'জনই ভালো ইকনমিস্ট। কি ঝর্ঝরে, তর্তরে লেখা! ইচ্ছে হচ্ছে প্রত্যেকের হাতে দিতে, ছাত্রদের, সরকারী অফিসারদের, বিশেষত এম. এল. এ., এম. পি-দের। আধুনিক অর্থনীতির প্রয়োগশিল্পের এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা খুব কমই দেখেছি। বি. এ. ক্লাশের ছাত্রদের বিশেষ উপকার হবে আমার বিশ্বাস। ফরাসীরা যখন লেখে তখন কলমে কী মদ ভরা থাকে জানতে ইচ্ছে হয়। একজন ফরাসী অধ্যাপক, লেভী-স্ট্রউস্, আমাকে বলেছিলেন,—Our tragedy is that we have too many

brilliant men.' সত্যই তাই। কার্টেসীয়ান যুক্তিতে মাথা পরিষ্কার হয়, লেখা ঝক্‌ঝক্‌ করে, কিন্তু নতুন সমাজশক্তিকে অ-যৌক্তিক, 'ইর্‌র্যাশনাল' নাম দিয়ে বাতিল করবার দিকে ঝোঁক থাকে। ফরাসী সভ্যতার অবনতি মানে কার্টেসীয়ান যুক্তির সীমা-লঙ্ঘন। ইকুইলিব্রিয়ম আর চয়েস-এর সরলতম ব্যাখ্যা পেলাম। ক্লাসিকাল অর্থনীতি আর বর্তমান, ১৯৩০ সালের পরের, অর্থনীতির পার্থক্য বইখানিতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু ঐখানেই শেষ!

লেখবার পরেই মনে হচ্ছে ভুল করলাম। অফিসার আর এম. পি-রা পড়লেই (যদি পড়েন) ভাববেন সব বুঝে ফেলেছেন। এ অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। বর্তমান ভারতবর্ষের ভাগ্যনিয়ন্তাদের, অফিসার ও লেজিসলেটার উভয়েরই এখনকার এই অবস্থার, প্রয়োজন হলো সমস্যা একদম বুঝে ফেলা নয়,—তার আবিষ্কার, তার সামনে বিনয়। clarity-র চেয়ে sense of mystery, adventure আর humility-কেই বেশি প্রাধান্য দিতে হবে আপাততঃ। এইখানেই ফরাসী চিন্তার গলদ। (প্রমথবাবু একে Latin genius বলতেন।) |অনুন্নত দেশের উন্নতির ইতিহাস সৃষ্টিতে একটু adventure থাকা ভালো। অত আলো নাই হলো!/

States Re-organisation Committee-র দৈনিক পত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের সারাংশ পড়লাম। শিখ সম্প্রদায় আর মাহরাট্টাদের মধ্যে ঘোরতর চাঞ্চল্য হবে নিশ্চয়! সামান্য অদল-বদল করে কংগ্রেস সামলে দেবে মনে হয়। বিদর্ভ সৃষ্টির মধ্যে একটা aesthetic যুক্তি রয়েছে। নামটি খাসা: ঐ নামের একটা প্রদেশ হওয়া উচিত। ভারতীয় বাংলাকে পুণ্ড্রদেশ নাম দিলে কেমন

হয় ? মানভূম-পূর্ণিয়ার কিছু অংশ বাংলাকে দেওয়া হয়েছে। বাংলা পাবে কি ? কেন্দ্রীয় আয় ব্যয় কিভাবে ভাগ হবে ? উত্তর প্রদেশ যা ছিল তাই রইলো। পন্নিকরের আপত্তিটা পড়লাম। খোঁচা' না দিলেই চলতো। তবে এটা ঠিক যে, ভারতবর্ষের অনেক বিশেষত দক্ষিণ অঞ্চলে উত্তর প্রদেশের বিপক্ষে মনোভাব প্রবল। যেভাবে জনকয়েক ভদ্রলোক হিন্দী প্রসারে উৎসাহী হয়েছেন, মুখেই অবশ্য, তাতে একটু রাগ হওয়া অ-স্বাভাবিক নয়। বিক্ষোভটা দ্রাবিড় ও আর্য সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোঠায় পর্যন্ত তোলা হয়েছে জানি ; ব্যাপারটা কিন্তু কেন্দ্রীয় শক্তির ব্যবহারের সুযোগ সংক্রান্ত। তাও বলি, অর্ধেকের ওপর সেক্রেটারী ও উঁচু কেরানী তো তোমাদের দক্ষিণেরই।

ভারতীয় ঐক্য সাধনার উপায়গুলি মনোজ্ঞ, যথেষ্ট নয়। ঐক্য শিক্ষা কি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্রীয় হিন্দীভাষী বিশ্ব-বিদ্যালয় করে দিলেই চলবে ! না হয়, আরো একটা, দুটো, দশটা হোক ! তাতেই বা কি হবে ? ভিন্নভাষী অধ্যাপক ও ছাত্র নেওয়া হবে বেশি ? যখন মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত দেওয়া হবে তখন ক'জন তামিলঅধ্যাপক বাঙলা ভাষায় এম-এ ক্লাশে পড়াতে পারবেন, ক'জন বাঙালী গুজরাটি-মাহরাট্টিতে ? ঐ ফাঁকে ইংরেজীর বুনিয়াদ পাকা হয়ে যাবে। সেটা শুভ হবে না। ছাত্রদের গতায়াত অবশ্য বাড়াতেই হবে। দক্ষিণ থেকে বহু ছাত্র উত্তরে এসেছে পড়তে, অবশ্য ডবল কোর্সের জন্য। কেউ হিন্দী উর্দু শেখেনি— খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, মেলামেশার কোনো পরিবর্তন দেখিনি। আমার মনে হয় ঐ বিষয়ে S. R. C. বেশি চিন্তা করেননি। কিংবা হয়তো পুরো রিপোর্টে আছে সব।

দক্ষিণে প্ল্যানিং অদল-বদল করতে হবে। কম্যুনিস্ট পার্টি কেন

সংযুক্ত মহারাষ্ট্র চাইছেন বুঝলাম না। স্ট্যালিনের ন্যাশানালিটি-সমস্যার সমাধান প্রয়োগ না কি! আমাদের সমস্যা ঢেলে সাজা, অ-সভ্য, অনুন্নতকে উন্নত করা নয়। The right to secede আমরা কাগজেও মানতে পারবো না। একবার ন্যাশানালিটির নামে অনেক বামপন্থীরা বোকামি করেছেন, আর সহ্য হবে না। অবশ্য ভোটের ব্যাপার আছে। এবার কংগ্রেস মেজরিটি কিছু কম হবে, স্বাধীন প্রতিনিধির সংখ্যা আরো বাড়বে মনে হচ্ছে।

'বাংলা ছোট থাকতে আপত্তি নেই আমার। আকারে ছোট্ট হলে তেজ বাড়ে— প্যারিসের নেপোলিয়ন, মস্কোর লেনিন, মোহন-বাগানের রাজেন সেন, অজ্ঞাত ভারতবাসী তথা স্টেট্‌সম্যানের নীরদ চৌধুরী---সব আকারে ছোট্ট খাট্টো, কিন্তু কত বিস্ফোরণ শক্তি!'

১৩-১০-৫৫

বন্যা এসেছে উত্তর ভারতে। যুবা বয়সে দামোদর বন্যা-পীড়িতদের উদ্ধারকল্পে আমরা জনকয়েক তারকেশ্বর অঞ্চলে যাই! সে আজ চল্লিশ বৎসরেরও পূর্বে। এখন বলতে পারি খবরের কাগজে যা ছাপিয়েছিলাম তার চারভাগের তিন ভাগও সত্য ঘটনা ছিল না। যে যুবতীটিকে 'উদ্ধার' করেছিলাম তার বয়স গোটা আষ্টেক এবং আমরা উদ্ধার করিনি, করেছিল বিশপ্‌স কলেজের

ছাত্ররা। কিন্তু আমাদের হাতে ছিল দৈনিকপত্র। সেই থেকে পরোপকারের ওপর আস্থা কমেছে।

আর মনে পড়ে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনের দেশপ্রিয়তা আর কাজের শক্তি। আর, মাঠের মধ্যে স্টীম লঞ্চের ওপর বসে একজন আমেরিকা ফেরত বাঙালীর হাতে মদের গেলাস আর বক্তৃতা—

"What is wrong with Bengal? Bengal has no organisers, she has no ability to organise."

লঞ্চটি আটকে গিয়েছিল, আমরা ঠেলে গভীর জলে নিয়ে যাই। ভদ্রলোকটি লঞ্চের ওপর থেকেই আমাদের ডাইরেক্টিভ (আদেশ) দিচ্ছিলেন। আরো মনে আসে হেমেন্দ্র রায়ের কবিতা পাঠ নৌকার ওপর, সুধীর সরকারের গান ও কাঠের ওপর বাঁয়াতবলা বাজানো, রাত্রে পাল মুড়ে শোয়া, পেটে খিদে মুখে সিগারেট, মোহন্তের সঙ্গে ঝগড়া—আর এক বিধবা জমিদার গৃহিণীর সংযত সমাদর। বাঙলা দেশে তখন অনেক মা ছিল।

দামোদর বন্যা প্রপীড়িতদের (তখন সর্বহারা, বাস্তুহারার চলন হয়নি) উদ্ধার করে এসেই গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে গেলাম। ভিজে এসে জ্বর হলো। জ্বরের ঘোরে শিবে-বিজের নামোচ্চারণ করি। ডাক্তারে এসে মাকে বোঝালেন নামটি কোনো মেয়ের নয়, দু'জন খেলোয়াড়ের। পথ্য পেয়েই দানিবাবুর অভিনয় দেখতে গেলাম লুকিয়ে।

ভারি মজা! বিহারের ভূমিকম্পকে গান্ধী বললেন ভগবানের অভিশাপ, আর বন্যাকে জওহরলাল বলছেন প্রকৃতির challenge to man। একেই বলে রিনেসাঁস। এই কথাটা ঘুরে ফিরে ক'দিন ধরে কেবলই মনে আসছে। যে রবীন্দ্রনাথকে বোঝে সে

অতি সহজে জওহরলালকে বুঝতে পারবে। এক ধাতু, এক মেজাজ, কেবল জওহরলালের মজ্জায় উপনিষদ নেই।

বিদেশী অভিনেতা-অভিনেত্রীর জীবনী পড়েছি। ঠিক বোঝা যায় না কেন তাঁদের অভিনয় দেখে লোকে পাগল হতো। তবে আমরাও পাগল হতাম। অর্ধেন্দু মুস্তাফীমশাই-এর অভিনয় প্রথম দেখি নিতান্ত অল্প বয়সে, প্রায় শৈশবাবস্থায়। তবু মনে আছে। রবিবাবু, অবনীবাবু, ঠাকুরবাড়ির মতে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা "এমনটি আর হয় না"—কবি বলতেন। (তাঁর অনেক fixation ছিল যথা বঙ্কিমবাবু আর যদু ভট্ট।) সমরবাবুর কাছে মুস্তাফীমশাই-এর এক 'প্র্যাক্টিকাল্ জোক্'-এর গল্প শুনি। ঠাকুরবাড়ির এক (ঘর) জামাই খুব সাহেব হয়ে উঠেছিলেন। সকলে অস্থির। একদিন সকালে দেখা গেল নগ্ন-গাত্র, চটিধারী এক ব্রাহ্মণ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে পূর্ববঙ্গের ভাষায় চিৎকার করছেন। ব্যাপার কি? ব্রাহ্মণ 'হালার পুত হালা'র সঙ্গে দেখা করতে চান। ব্রাহ্মণের রাগ আর থামে না। শোনা গেল তাঁর ছেলে ঐ বাড়িতে লুকিয়ে আছে, ম্লেচ্ছ হয়ে গিয়েছে। সকলে মিলে তাঁকে ধরে করে বারান্দায় বসালে—সেখানে বসে পিণ্ডিদান আরম্ভ হলো। ব্রাহ্মণের ছেলেটি শোনা গেল ঐ জামাইবাবুটি। তিনি তখন অন্দরমহলে গায়েব, লজ্জায় বাইরে আসতে পারছেন না। ব্রাহ্মণ খাওয়া দাওয়ার পর অভিশাপ দিতে দিতে বিদায় হলেন। ব্রাহ্মণটি ছিলেন মুস্তাফীমশাই, আর ষড়যন্ত্রটি পাকিয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির দুষ্টু ছেলেরা। জামাইবাবু শুধরেছিলেন কিনা জানা নেই।

গিরীশবাবুর অভিনয় গগনবাবুরা পছন্দ করতেন না,

দানিবাবুরও না। একটা কার্টুনেই প্রকাশ। তা না পছন্দ করুন, গিরীশবাবু মস্ত অভিনেতা ছিলেন। নীলধ্বজে গৈরীশি ছন্দের আবৃত্তির রেশ অনেদিন কানে বাজতো। আর চোখে ভাসতো তাঁর চৌকো ভারী গাল দুটো যার প্রত্যেক পেশীটা তাঁর কথা শুনতো। প্রফুল্লর যোগেশ 'রানি মুদিনীর গলি' গাইছে। 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' তিনবার তিন স্বরে উচ্চারণ করছে--এগুলো ভোলা যায় না। 'চৈতন্য লীলার' অভিনয় মনে আছে। নাম জানতুম না কারুর তখন। পরে জেনেছি, বিনোদিনী চৈতন্য, আর জগাই-মাধাই গিরীশবাবু আর মুস্তাফীমশাই। নন্দলালবাবুর (?) জগাই-মাধাই-এর রেখাচিত্র মনে হয়। ওঁদেরই ছবি। কলসীরকানায় মহাপ্রভুর কপাল থেকে রক্ত ঝরছে, তবু কীর্তন চলছে, 'মেরেছো কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দিবো না।' জগাই-মাধাই-এর একজনের অনুতাপ এসেছে, অন্যের মুখে তখনও অসভ্য গালাগালি! মুখে গালি কিন্তু পা দুটো খোলের তালে নাচতে আরম্ভ করেছে। নিচে থেকে যেন একটা ঢেউ উঠে শরীরটাকে দুলিয়ে দিলে, এ আমি দেখেছি। এবং একেই অভিনয় বলি।

দানিবাবুর উচ্চারণ ছিল অস্পষ্ট, আধ-আধ। তবু তাঁর মুখের ভাবব্যঞ্জনা ছিল অদ্ভুত। বলতেন, 'যা কিছু বাপির কাছে শিখেছি।' বিল্বমঙ্গলের 'সলিলকি' আমার কাছে হ্যামলেটের আত্মোক্তির সমপর্যায়ের। অলিভিয়র, গীলগুড্ দেখে আমরা মোহিত হই আজকাল। ঠিক সেই রকমই মোহিত হতাম দানিবাবুর বিল্বমঙ্গল শুনে ও দেখে। 'গৃহলক্ষ্মীর' কি 'শাস্তি ও শান্তির' ঠিক মনে পড়ছে না, 'ওঃ, আজ বুঝি একাদশী'. বলিদানের 'মেজো মেয়েটিকে ছাড়ো না বাবা'—দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনোভাবের

উক্তি। কিন্তু দানিবাবুর পক্ষে দুইটিরই প্রকাশ সহজ ছিল। অমৃত মিত্রের মতন কণ্ঠস্বর আমাদের রঙ্গমঞ্চে হয়নি, কিন্তু ব্যঞ্জনা ছিল কম। অমর দত্তের কণ্ঠ ছিল আরো গম্ভীর, তিনি উচ্চারণে গমক দিতেন। তাঁর বহু অভিনয় দেখেছি, কিন্তু যখনই রঙ্গমঞ্চে নাবতেন, তখনই মনে হতো যে তিনি সৌখীন অভিনেতা। অথচ রঙ্গমঞ্চের জন্য তিনি জীবনপাত করলেন। তাঁর প্রতিভা স্থিত হতে পারেনি।

অমৃত বোসমশাই আমার কাছে প্রধানত মজলিসী মানুষ, দ্বিতীয়ত, নাট্যকার ও শেষে অভিনেতা। তাঁর মজলিসী কথাবার্তায়, তাঁর জ্ঞানের বহুমুখিতায়, তাঁর রসিকতায় মুগ্ধ হননি এমন লোক দেখিনি। (হেরম্ববাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, 'আমার জীবনের শেষ আশা এখনও মেটেনি, হেরম্ববাবুকে স্টেজে আনা।') মনে আছে, তাঁকে আমি ইব্‌সেন বার্নসন্ পড়তে দিই। ভদ্রলোকের খুব আনন্দ। শ্যামবাজার হাইস্কুলের প্রাঙ্গণের দরবারে বললেন, 'তিন সেনে একবার দেশটা মাটি করেছিল। উইলসেন (Wilson Hotel) ইস্টিসেন্ আর কেশব সেন। চতুর্থ সেন জুটলো এই ইব্‌সেন।' Punটি ছিল সস্তা, কিন্তু বলবার ভঙ্গিতে আমাদের মত উন্নাসিক, রবীন্দ্রনাথ-বীরবলী রসিকতায় অভ্যস্তরাও খুব হেসেছিলাম। অনেকের ধারণা, তিনি ব্রাহ্মদের পছন্দ করতেন না। সেটা মস্ত ভুল। একদিন ভগবদ্বিশ্বাসের আলোচনা হচ্ছিলো। তিনি হঠাৎ বললেন, 'আমি ভগবান দেখেছি। যখন কেশব সেন প্রার্থনার সময় God উচ্চারণ করতেন।' অমৃতবাবু বিস্তর পড়েছিলেন, বিশেষত সাহিত্য আর নাটক। প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল, চোখ নষ্ট হবার

পর ও অন্য কারণে বিক্রি করে দেন। অমন বিদগ্ধ পুরুষ, নাগরিক বাঙলা দেশে খুব কম জন্মেছেন। হুঁকোর নল মুখে দেওয়া থেকে চুল, জামা, বসবার ভঙ্গি প্রতিটি আচরণে বৈদগ্ধ ফুটে উঠতো। হারিতকৃষ্ণ তাঁর সম্বন্ধে বহু কথা জানে। সেই বড় ঘনিষ্ঠ ছিল। সেই তাঁকে ফোটাতে জানতো। হারিতের বাড়িতে মূকও মুখর হতো, শোভাবাজারের রাজবাড়ির এমনই আবহাওয়া।

আমার কাছে শিশিরবাবুই দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা থাকবেন, অভিনয়-কলা, অভিনয়ের অভিব্যক্তি ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের দিক থেকে। অথচ শিশিরবাবু একাধিকবার বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথই তাঁর মতে, দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। 'স্টেজের ওপর হাত ও আঙুল নিয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। হাত ও আঙুলের ব্যবহারই সবচেয়ে শক্ত কাজ; এবং সে কাজে পূর্ণ দক্ষতা ছিল কবির।' তা হোক, তবু শিশিরবাবু আমার কাছে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। সময় পেলে তাঁর সম্বন্ধে দু'-একটা কথা লিখতে ইচ্ছে করে। পরিচয়ে অমর দত্তের জীবনীর আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু লিখেছিলাম। আরো বিশদভাবে লেখা উচিত। কেবল বিশদ নয়, বিশ্লেষণাত্মকও। এই ধরনের খানিকটা

(১) শিশিরবাবুর উচ্চারণ-পদ্ধতিতে স্বরবর্ণের ব্যবহার; তাকে দীর্ঘ করার ফলে প্রথমত, যুক্তাক্ষরের মুক্তি, দ্বিতীয়ত, ব্যঞ্জনবর্ণের স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা। চৌদ্দমাত্রার পয়ার ভাঙার সমগোত্রের। তাই টানা সুর নেই, যা রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তিতে ছিল। গদ্য হলো ফলে, কিন্তু একটা ছন্দ রইলো লুকিয়ে। ছন্দ সব সময় যে ধরা পড়তো না তার জন্য দায়ী বাঙলা ভাষা।

(২) আমাদের ভাষায় ক্রিয়াপদ দরিদ্র। তার অভাবে শিশিরবাবুর রঙ্গমঞ্চে গতিবিধি ঐ নতুন ধরনের গদ্যছন্দের অনুগামী

হলো। প্রবেশ, নিষ্ক্রমণ খুব শক্ত কাজ নিশ্চয়, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে হাঁটা, স্থান (stance) আরো কঠিন। ক্ল্যাসিক্যাল অভিনয়ে ওর জ্যামিতি সহজ। ভাব প্রকাশের অনুযায়ী তার একটা ছক্ থাকে। শিশিরবাবু সেই ছক্ বদলেছিলেন। তিনি ভাবের গতিকে অগ্রাহ্য করেননি : ভেঙেপড়া গদ্যের ছন্দকে দেহের গতির সাহায্যে ফুটিয়ে ভাবকে সম্পন্নশালী করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেতারাই এই ক'টি কাজ একত্রে করতে পারেন। সমন্বয়টাই .চাখে পরে।

(৩) অথচ সাহিত্যিক অভিনয় নয়।' পুরো অভিনয়। এই জন্যই দর্শক ভুল করতো (এবং সমালোচক ভুল করতেন) যে, সর্বত্রই শিশিরবাবু। অর্থাৎ তাঁরা ভাবতেন জীবানন্দ, যোগেশ ও নিমচাঁদের মাতলামির অভিনয়ে কোনো পার্থক্য নেই। তাঁদের মনে হতো শিশিরবাবুই মাতলামি করছেন। বস্তুত তা মোটেই নয়। জীবানন্দ, যোগেশ ও নিমচাঁদের মধ্যে পার্থক্যটুকু চরিত্রগত : সে পার্থক্য ব্যবহারেই প্রকাশ : কিন্তু প্রতি ব্যবহারের সারাংশ, ক্ষীরটুকুই হলো অভিনয়ের বস্তু। বিশেষ হলো ম্যানার, যার অপব্যবহার ম্যানারিজম—তোৎলামি, হাঁচা, ঘাড়নাড়া, একটা কথার অনবরত প্রয়োগ ইত্যাদি। সর্বত্রই শিশিরবাবু নয়, সর্বত্রই অভিনয়। অথচ স্টাইলাইজ্‌ড নয়। (জাপানী, কি বলী, কি কথাকলি অভিনয়ের মত নয়।) স্টাইলাইজেশ্যনে ভাষা আমরা হারিয়েছি, যেদিন অভিনয় নৃত্য থেকে পৃথক হয়েছে।

(৪) তবু শিশিরবাবুর কল্পনা সার্থক হয়নি। রঙ্গমঞ্চের মঞ্চত্ব তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন। মার্জিত যাত্রা সৃষ্টি করাই তাঁর ইচ্ছা ছিল। দর্শক ও অভিনেতার মধ্যেকার দূরত্ব তিনি বজায় রাখতে চাননি। ইচ্ছাটা মূলত বিপ্লবী, কিন্তু নানা কারণে হয়ে

উঠলো না। যতটুকু নিজের দোষ তার চেয়ে অনেক বেশি দোষ দেশের।

ইত্যাদি, ইত্যাদি···শুনলাম শিশিরবাবু বাঙলা দেশের দশজন শ্রেষ্ঠ বাঙালীর একজন গণ্য হয়েছেন। এই ক্ষতিপূরণের অর্থ হয় না। গরু মেরে জুতো দান! ন্যাশানাল থিয়েটারের ডিরেক্টার করা হয়নি কেন?

বিনোদিনীকে মনে নেই ঠিক। দুই বিনোদিনী ছিল। একজনকে পরমহংসদেব আশীর্বাদ করেছিলেন, 'তোমার চৈতন্য হোক।' অমৃতবাবু এঁরই বিলাসিনী কারফর্মার অভিনয়ের শতমুখে প্রশংসা করতেন। একটা ফটো আছে মনে পড়ছে। অন্য বিনোদিনী (কালো) গায়িকা ছিলেন। দু'-একটা রেকর্ডও ছিল। মার্জিত-সুরেলা গলা। একটা পিলু-বারোয়ার ছাদ মনে পড়ছে। এখন জানি বারোয়ার রূপ কত পৃথক।

গিরীশবাবু তিনকড়িকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। রাণীর মতন তার চাল-চলন। একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ভারতের মিসেস সিডন্স বলেন। বোধ হয় লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকার অভিনয়ের জন্য। একবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় 'জনা'র এক অংশ নির্বাচিত হয়। বন্ধু, সুরেশ (বোস), তিনকড়ির বাড়ি গিয়ে হাজির। অত্যন্ত যত্ন করে শেখালেন, খাওয়ালেন। শেষে বললেন, 'তারার (তারাসুন্দরী) কাছে যাও। সে আমার চেয়ে ভালো শিখিয়ে দেবে।' অথচ তিনকড়ির জনাই প্রসিদ্ধ ছিল। তারাসুন্দরীর অপূর্ব কণ্ঠস্বর ছিল। নিতান্ত স্পষ্ট উচ্চারণ, সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, অথচ পুরুষালী নয়। তবু তিনকড়ি ছিলেন মহিমাময়ী। যথাসর্বস্ব দান করে গেলেন। একজন অভিনেত্রী

অন্য অভিনেত্রীর সুখ্যাতি করা অস্বাভাবিক নয় কি ? অন্তত অধ্যাপকের দলের কাছে তো বটেই ! যে-কোনো কংগ্রেস কি কনফারেন্সে গেলেই বোঝা যায়।

আরো কত অভিনেত্রীর কথা মনে ওঠে। নরসুন্দরী, কুসুম, রাণী, সুশীলা, চারুশীলা, নীরদা, প্রভা, কঙ্কা (ইদানিংকার মলিনা) —এঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন রঙ্গমঞ্চের জন্য। শিশিরবাবুর হাতে চারুশীলার অভিনয়ের অপূর্ব পরিবর্তনের কথা অনেকেই জানে। প্রভার কণ্ঠস্বর আমি অন্তত ভুলতে পারবো না। বাঙলা দেশে আমার কথার কোনো মূল্য যদি থাকতো তবে বলতাম এই একনিষ্ঠা আর্টিস্টদের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হোক। এই যে পথের পাঁচালীতে আশী বছরের বৃদ্ধা চুণিবালা অভিনয় করলেন তার জন্য তাঁকে কি সম্মান দেওয়া হলো ? 'আকাদমী' খাড়া করলেই হয় না। চুণিবালা তখন নগণ্য ছিলেন। কিন্তু পথের পাঁচালীর সার্থকতার জন্য কি তিনিই বেশি দায়ী নন ! বিদেশে ক'জন মহিলা ঐ ধরনের অভিনয় করতে পারেন। For Whom the bell Tolls-এ ক্যাটারিনা যখন মেরিয়া অভিনয় করলেন তখন ধন্য ধন্য পড়ে গেল। আর চুণিবালার কিই বা খাতির হয়েছে ? বেসুরোয় 'দিন যে গেল সন্ধ্যে হলো পার কর আমারে' কেউ গাইতে পারেন ? রাক্কোস-খোক্কোসের গল্প কেউ করতে পারে ঐ-ভাবে ? 'ও বৌ হলো কি—হলো কি -হলো কি ?' তিনবার তিন পর্দায় ? মনোরঞ্জন থাকলে একটা কিছু করে ফেলতো ! একটা প্রকাণ্ড সভা হোক, পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা তোলা হোক, আর সেই টাকা শিশিরবাবু চুনিবালার হাতে তুলে দিন। লোকে বলে বাঙালী ভাবপ্রবণ ! ঐ কবিতা লেখবারই বেলা ! আর কেউ আমাদের পোঁছে না বলে অভিমান করবারই বেলা ! আমার মতে

আমাদের দিল নেই। অথচ কলাপ্রিয় জাত নাকি! অবশ্য খানিকটা তো বটে। বাঙলায় কত ভালো এমেচার-অভিনেতাই না হয়েছে! শম্ভু মিত্রের দল-বহুরূপী চমৎকার অভিনয় করে। নতুন যা দু'-একটা দেখলাম তা খুবই আশাপ্রদ। I. P. T. A. ভেঙে যাওয়া (দেওয়া?) অন্যায় হয়েছে। সরকার পেছনে লাগলো। বিরাট মূর্খতা! Youth Festival Children's Theatre শুরু হয়েছে। চমৎকার! কিন্তু ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা গোছের। তার চেয়েও অদ্ভুত! সাহিত্য-চর্চা করতে হয় তো কংগ্রেসেরই আশীর্বাদে! শান্তি-সভা করতে হয় তো আমরাই করছি! থিয়েটার, সঙ্গীত, সমাজ-সেবা, যুবা, বাল-সমিতি কারুর করতে হয় তো সে আমরাই করছি, আমরাই করবো! কেমন যেন খারাপ লাগে। অবশ্য এর একটা ভালোর দিক আছে। তবু মন যেন সায় দেয় না। মনে পড়ে পুরানো ধরনের শাশুড়ীদের ব্যবহার।

২০-১০-৫৫

এই প্রথম স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয় পেলাম। মৃত্যু ভয় নয়। বহু মৃত্যু দেখেছি, রাগই হয়েছে বেশি, দুঃখের চেয়ে। বৃদ্ধের মৃত্যু কম

দেখেছি বলেই। মৃত্যুর সময় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখে একটা বোকামির ছায়া পড়ে, যাকে ভক্তিভরে কিংবা স্নেহভরে বলি শান্তি, হাসিমুখ ইত্যাদি।

২১-১০-৫৫

গেব্রিয়েল মারসেল-এর The Decline of Wisdom একটি হীরের টুকরো। এঁর Metaphysical Journal দুর্বোধ্য; কিন্তু এখানি নিতান্ত প্রাঞ্জল। ফরাসী দেশের একজন বড় চিন্তাশীল লেখক। এককালে এক্জিস্টেশিয়ালিস্ট ছিলেন লোকে বলতো। এখন ঐ নাম থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য নিজেই ব্যস্ত। বাস্তবিক পক্ষে পাসকাল, কিয়ারকেগ্রডি প্রভৃতির সঙ্গেই মিল বেশি। সার্তর্ বলেন, Existence is prior to essence, আর ইনি বলেন, Essence is prior to existence। তাই তিনি ঐতিহাসিক রিলেটিভিজমের বিপক্ষে। এই ধরনের মতবাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। Popper-এর যুক্তি কিন্তু অন্য ধরনের লজিকাল। আমি মানি না, তবু আকৃষ্ট হই। ঐতিহ্য, পরম্পরা প্রভৃতির প্রকৃতি আমি বুঝতে চাই; তাদের আমি কদর করি। একটা কৃতজ্ঞতা, বিশ্বজনীন মূল্য আর ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে একটা সতত, ধৈর্যশীল সম্বন্ধ না থাকলে জীবনটা খেয়ালী ক্ষণের সমষ্টিতে

পরিণত হয়। সম্বন্ধটা টেনশ্যন গোছের। যা হচ্ছে তাই ভালো বলতে কে আর রাজী! একবার ননীকে (অধ্যাপক নীরেন চৌধুরী) জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মার্কসিজমে good আর evil-এর স্থান কোথায় ও কতটুকু?' অন্য কথার মধ্যে সে একটি কথা বলে, 'যা ইতিহাসের (গতির) বিপক্ষে তাই অমঙ্গল, যা তার স্বপক্ষে তাই কল্যাণ।' শুনে ভয় পেয়েছিলাম। নাঃ ও চলবে না। কল্যাণ সম্পর্কে ধারণাকে ইডিয়লজি, সুপার-স্ট্রাকচার, এপি-ফেনমেনা, বললেই তো হলো না!

মার্সেল popular wisdom সম্বন্ধে অনেক দামী কথা বলেছেন। পরমহংসদেবের দিব্যানুভূতি আর ঐ সাধারণ বুদ্ধি (common sense) পরস্পরকে সমর্থন করতো। সব মিস্টিকদের বেলাতেই তাই করে দেখেছি। তেমনই জনগণের চলতি বুদ্ধির মধ্যে ঐ প্রকার উঁচু ধরনের জ্ঞান (wisdom) লক্ষ্য করেছি। ভগ্নী নিবেদিতা এই সংযোগ দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন। কিন্তু এই popular wisdom-এর ক্ষয় আরম্ভ হয়েছে এদেশে। এখন দুই প্রকার জ্ঞানের মিলন ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। না রইলো গোষ্ঠী না রইলো গ্রাম, না রইলো সমাজ সংহতি—এখন sensorium commune থাকবে কোত্থেকে? তবে? নতুন ক্ষেত্র গড়তে হবে নিশ্চয়। কিন্তু গোলাম তখন গোরে যাবে।

ডাঃ সুশীলকুমার দে'র বাঙলা প্রবাদ (ছড়া ও চলতি কথা) একটা খনি বিশেষ। আমি গেব্রিয়েল মার্সেল-এর পূর্বোক্ত মতের সমর্থন পেলাম। আমার মতে নতুন প্রবাদ যে তৈরি হচ্ছে না সেটা সমাজক্ষয়ের প্রধান নিদর্শন। প্রবাদ না থাকলে কার জোরে non-secular wisdom বাঁচবে, প্রতিপত্তি বাড়াবে? অপরিণতদের মার্সেল পড়া উচিত কিনা জানি না, তবে

সার্তর্ পড়া উচিত নয় জানি। (সাহিত্যিক প্রবন্ধ ছাড়া অবশ্য।)

প্যারিসে একটা হাসির রোল শুনেছিলাম। একদিন দেখা গেল বড় রাস্তা দিয়ে এক বিরাট শোকযাত্রা চলছে। সকলের কালো পোশাক। এগুচ্ছে পাঁথিও-র দিকে, যেখানে দিগ্‌গজ ফরাসীদের কবর আছে। কে এমন মারা গেল, অথচ খবরের কাগজে বেরুলো না! পুলিশ ভ্যাবাচ্যাকা! এখানে-ওখানে টেলিফোন—কেউ বলতে পারলে না। এক জায়গায় পুলিশ আটকে দিলে—ফরাসী পুলিশ তো। বড় অফিসার এসে কফিনের পাশে দাঁড়ালো, ঢাকা খুললে, ভেতরে কেউ নেই—কেবল লেখা রয়েছে, Existentialism is dead—কিছুদিন আগে সার্ত্র্ কম্যুনিস্ট হয়েছেন। সমস্ত প্যারিস সপ্তাহখানেক ধরে হাসলো, নতুন হাসির খোরাক না পাওয়া পর্যন্ত। (ফরাসীরা হেসে জিততে চায়, অন্তত প্যারিস।)

আমাদের দেশে হাসি নেই, বক্তৃতা আছে, বই লেখা আছে, সভা-সমিতি করা আছে। জওহরলাল বললেন, মার্কসিজম মরেছে : এম. এন. রায় লিখলেন, মার্কসিজম মরেছে, Society of Cultural Freedom প্রমাণ করছে মার্কসিজম মরেছে। আমি বলি যদি মরেইছে তবে অতো ভয় কেন? ভূতের ভয় অবশ্য আছে। শরৎদা বলতেন, 'ভূত মানি না, ভয় পাই।' খাঁটি কথা। সেভাবে Democracy is also dead। সবই ভূত না কি? তবে সভ্য আর আদিম মানুষের পার্থক্য কোথায় রইলো! কোনো বড় ঐতিহ্য মরে না, যদি মরে তো ভূত হয় না, পুনর্জন্ম হয়। সার্তর্-এর মতামত লোপ পেতে পারে, কিন্তু পাস্কাল্? হ্যারী পলিট, রজনী দত্ত যাবে, কিন্তু মার্কসিজম যাবে না—আণবিক যুগেও নয়। আণবিক ইম্পিরিয়ালিজম্ আরো ভয়ঙ্কর। পণ্ডিতজী মাঝে মাঝে

যে কী বলে বসেন তার ঠিকঠিকানা পাই না। বিহারে গিয়ে সেদিন বললেন, 'আমি জাতিভেদপ্রথা ধ্বংস করে তবে ছাড়বো।' অত সহজে হাজার বছরের জিনিস ধ্বংস হয় না। আর উনি একলা ধ্বংস করবার কে! দিল্লীর এক সভায় ডাঃ শ্রীনিবাস বেশ উত্তর দিয়েছেন। (প্রবন্ধটি Economic Weekly-তে বেরিয়েছে।) তবে পণ্ডিতজীর চটবার কারণ নিশ্চয় ছিল ও আছে। এবং মধ্যে মধ্যে বে-মওকা, বে-সামাল কথা শুনতে মন্দ লাগে না, প্রাপ্তবয়স্ক প্রধানমন্ত্রীর মুখেও।

১৫-১০-৫৫

দুর্গাপূজা। এ ক'দিন মা আমাদের বাড়ির ওপর রুষ্টই থেকেছেন। শরতের আলো অন্য ধরনের। এবারকার পুজোর আলো Sisley-এর প্রিয়। নিম-গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে আসতে ভেঙে গিয়েছে। এখানকার বাঙালীরা উৎসাহের সঙ্গে পুজো করছেন। যোগ দিতে দেহ পারছে না, মন চাইছে না!

গ্যাসেট মারা গেলেন। তাঁর Revolt of the Masses আমরা সকলেই একটু ভুল বুঝেছিলাম। কিন্তু তাঁর Mission of

the University-তে ভুলের অবকাশ নেই। আমিও Cultural Synthesis চাই, আমারও ইচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয়ে Vital Subjects মাত্র পড়ানো হোক; আমার বিশ্বাস Faculty of Humanities-এর ওপর বেশি জোর দেওয়া উচিত। কিন্তু আমার কাছে সীনথেসীসের অর্থ দুটি, দুই স্তরের, (১) জ্ঞানের পারস্পরিক সম্বন্ধের methodology, ও (২) জীবনক্ষেত্রের ব্যবহারিক সংযোগ। প্রথমটি সম্বন্ধে গ্যাসেট ডিল্টাই-এর শিষ্য; অর্থাৎ প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও মানব-সংক্রান্ত বিজ্ঞান দুটি সম্পূর্ণ পৃথক। আমি সম্পূর্ণ পৃথক বলতে রাজি নই। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের যুক্তি-পদ্ধতির এখন ভীষণ প্রতিপত্তি, তাই তাকে প্রয়োগ করবার মোহ নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সে যুক্তি-পদ্ধতিও বদলাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই প্রয়োগ করবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তার ফলে কি আমরা বস্তুসত্ত্বার প্রকৃত পরিচয় পাচ্ছি? বরঞ্চ দূরেই সরে যাচ্ছি মনে হচ্ছে। অতএব এই প্রয়োগ ব্যাপারে সাবধানের প্রয়োজন। কিন্তু ঐ আশঙ্কা থেকে অনেকখানি মুক্ত হওয়া যায় যদি কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্র—যেমন কোনো একটি গ্রাম—নির্বাচন করে, তার ভূমি, আবহাওয়া, আর্থিক জীবন, আশা-ভরসা, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-কানুন প্রভৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই ব্যাপারে সব বিজ্ঞানই এসে পড়বে। যেকালে এটা একার কাজ নয়, তখন সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিকের সহযোগ চাই। সেই কনক্রীট সহযোগের ফলে বিবিধ বিজ্ঞানের সীনথেসিস সম্ভব। ভূমির বেলা সয়েলকেমিস্ট ও ভৌগোলিক, আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, আশা-ভরসার ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজ-ব্যবস্থার বেলা সমাজতাত্ত্বিক, রাষ্ট্রতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, খাদ্যের বেলা বায়োকেমিস্ট, অর্থ-

নৈতিক ; এই ধরনের সহযোগে বিবিধ জ্ঞানের আন্তরিক সম্বন্ধ ঠিক ঠিক বোঝা যায়, আর জ্ঞানের সমন্বয় হয়। (বেসিক এডুকেশনের মূলে এই ধরনের একটা প্রয়াস আছে।) অর্থাৎ, বিজ্ঞানের ছাত্রদের আর্ট কিংবা ইতিহাস কিংবা দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে কিংবা আর্টস কোর্সের ছাত্রদের অণু-পরমাণু সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলে ফল হবে না, কেবল গোটা-কয়েক ধরতাই বুলির প্রচার হবে। মেথডলজির বক্তৃতা খুব কম লোকেই দিতে পারে এবং খুব কম ছাত্ররাই বুঝতে পারবে। তাই মাটি থেকে গড়ে তোলাই ভালো। সমস্যা যতই কনক্রীট হয়, ততই তার সমাধানের সুবিধা। সাধারণ শিক্ষা (General Education)-ই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ উপায়। গ্যাসেট এই সাধারণ শিক্ষা নিয়েই মাথা ঘামিয়েছেন ; কিন্তু কোথায় যেন গলদ রয়েছে। সত্যকারের চিন্তাশীল ব্যক্তি। লিবারেল এরিস্টক্র্যাসীর সব গুণ তাঁর মতামতে প্রকাশ পেয়েছে। একজন অধ্যাপক অতো কাজ কি করে করতে পারতেন, ভাবলে বিস্ময় লাগে। তবু, গ্যাসেট অতীতের মানুষ, যাকে স্পেনে Generation of '98 বলা হতো। সে-যুগ গত।

ক্যাস্টিলের দুরবস্থা নিয়ে একটি পুরানো স্প্যানিশ কবিতা জোয়াকিন কস্টা'র (Costa) হাতে পড়ে। তিনি কবিতাটি জীনারকে (Giner) দেখিয়ে বললেন, 'Giner, that is Spain.' জীনার উত্তর দিলেন, 'No, Joaquin, that was Spain. Spain is different now.' কস্টা বললেন, 'Giner, we want a man now.' জীনার উত্তর দিলেন, 'Joaquin, what we want is a people.'—এই দ্বন্দ্বের, এই ক্যাস্টিলিয়ান সমস্যার আজও

মীমাংসা হয়নি। অভিজাত সম্প্রদায় একটা মানুষ চায় এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণও চায়। সে জনসাধারণ শিক্ষিত হোক তবেই—নচেৎ Revolt of the masses !

রবীন্দ্রনাথ কোথায় যেন লিখেছেন—এক সময় ভাবতেম জনসাধারণ যেন প্রদীপের নিচে আঁধার, অর্থাৎ শ্রেণীভেদ স্বাভাবিক। পরে সে মত তাঁর ছিল না। অবশ্য তাঁর মহামানবের তীরের মহামানব জনগণ নয়। একদিন অতুলপ্রসাদ সেনের ছাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই শ্রেণীবোধ, জনগণ, ইতিহাস প্রভৃতি নিয়ে দু'তিন ঘণ্টা আলোচনা হয়। আলোচনা আর কি? তিনি বলে গেলেন, আমি শুনে গেলাম; আর মধ্যে মধ্যে একটু যাকে খুঁচিয়ে দেওয়া বলে তাই। তাঁকে বলি, 'এইবার লিখে ফেলি আপনার মতটা কি?' 'না, তা করো না, তুমি আবার মণ্টুবৃত্তি নিলে কবে থেকে? আচ্ছা আমিই লিখবো।' তাঁর বক্তব্যের খানিকটা 'কালান্তর' প্রবন্ধে প্রকাশ পেলো। কিন্তু তিনি যা-যা বলেছিলেন তার যৎসামান্যই এই প্রবন্ধে রয়েছে। তাঁর মন কত flexible, কত adventurous ছিল আমরা কল্পনাই করতে পারি না। তিনিও ভিড় পছন্দ করতেন না; তাঁর মুখে অর্ধশিক্ষিত সাধারণ্যের সম্পর্কে অনেক কটু কথা শুনেছি। এখন কবিপক্ষ করলে কি হবে? ভদ্রলোককে খুবই ভুল বুঝেছি আমরা। 'নারায়ণ' মনে পড়ছে। তবু Revolt of the masses তাঁর হাত দিয়ে বেরুলো না। রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্য একটু যেন অন্য ধরনের। জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে তার ধারণা যেন আরো গভীর।

২৭-১০-৫৫

পুজো এলো, গেল বুঝতেই পারলাম না। গোটা কয়েক পুরানো মুহূর্ত মনে এলো—সন্ধিপূজা, আরতি, সঙ্কল্প, বাড়ির পুজোর দালানে ঠাকুর তৈরি হচ্ছে, চালচিত্র আঁকা হচ্ছে, ভিয়েন ঘরে বোঁদে, পান্তুয়া, লুচি, ছ্যাঁচড়া, আরো কত রান্না-বান্না চলছে, কর্তারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ভেতর মহলের উঠোনে বড় বড় বঁটিতে প্রকাণ্ড মাছ কাটা, সেজগিন্নী তার চার্জে, তরকারির ঘরে মেজগিন্নীর প্রভুত্ব, ছোটগিন্নীর একটু দেরী হয়, আর বড়গিন্নী কি যে করেন বোঝা যায় না, মিষ্টির ঘরে পিসেমশাই, আর গণ্ডা তিনেক বোন গণ্ডা পাঁচেক বাচ্চা নিয়ে কলরব করছে, প্রত্যেক মা বাচ্চাকে ভাজা বোঁদে খাওয়াতে ব্যস্ত, সব সাটিনের জামা পরে ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, অসহ্য গোলমাল, ঢাক-ঢোল, সানাই, সে যে কি সানাই! তারা নাকি তিন পুরুষ বাজিয়ে আসছে আমাদের বাড়িতে, ভিয়েনকারও তিন পুরুষ, কুমোরও তিন পুরুষ, কেউ তিন পুরুষের কম নয়। একবার আমাদের একঘরে করা হলো—চার-পাঁচশ' লোকের খাওয়া ফেলা গেল—কারণ পুজোর দালানে কর্তারা গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য যে ফ্রী স্কুল খুলেছিলেন তার মাস্টারমশাই-এর স্ত্রী নাকি বিবাহিতা স্ত্রী নন। তাঁকে গ্রাম থেকে না তাড়িয়ে গ্রামের মোড়লরা জলগ্রহণ করবেন না। ব্যাপার সত্য কি মিথ্যা, কেউ খুঁজলো না। কর্তারা বললেন, ভিন্ গাঁয়ের গরীবদের ডেকে

খাইয়ে দাও। দ্বিতীয় দিনে কম্প্রোমাইজ হলো, পনেরোজন ব্রাহ্মণ-মোড়লকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে। মহাষ্টমীর দিনে তাঁরা পদধূলি দিলেন, আনন্দ সহকারে খেলেন, আর আমাদের পূর্বপুরুষদের কি সুখ্যাতি! এমন আচারনিষ্ঠ, সদ্‌ব্রাহ্মণের গোষ্ঠী নাকি দেশে জন্মায়নি! পুজোর পর ছাড়াছাড়ি, আর এক মাস ডি. গুপ্তের বোতল, আর কুইনিনের বড়ি। বাংলার গ্রাম বদলেছে নিশ্চয় এখন। শুনেছি, বারোয়ারি পুজো হয় ও তিন রাত্রি কমসে কম থিয়েটার। গ্রামে ছেলেরা এখনও মেয়ে সাজছে?

গয়া কংগ্রেসের পর চিত্তরঞ্জন লক্ষ্ণৌ এলেন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি ভারতবর্ষের গ্রামীন সভ্যতা, পঞ্চায়েত প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। তখন রাধাকুমুদবাবুর Local Government in Ancient India with the Foreword of the Marquess of Crewe, Secretary of State of India বেরিয়েছে। (এই বইখানির সুন্দর উল্লেখ আছে অলডাস হাক্সলের Point and Counterpoint-এ)। রাধাকুমুদবাবুর ছোট ভাই রাধাকমলবাবু (এখনকার লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর) তখন 'ডেমোক্রেসিস্ অব দি ইস্ট' লিখছেন। দুই ভাই-ই গ্রাম-পঞ্চায়েত সম্বন্ধে ভীষণ উৎসাহী। চিত্তরঞ্জনের উক্তিতে উভয়ই মহাখুশি। রাত্রে একসঙ্গে খাওয়া হচ্ছে। মুখুজ্যেমশাইদের একজন পঞ্চায়েত সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ মন্তব্য করলেন, বললেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা গড়ে তুলতে হবে গ্রাম থেকে, পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে। দাশসাহেব অনেকক্ষণ শুনে বললেন, 'ভারতবর্ষের সর্বত্র ঘুরেছি—এমন কোনো গ্রাম, এমন কোনো

পঞ্চায়েত দেখিনি যা থেকে ভবিষ্যতের ভারত গড়ে তোলা যায়।' মুখুজ্যেমশাইরা দমবার পাত্র নন। তাঁরা বললেন, দেখেছেন। দাশ-সাহেব কেবল বললেন, 'আমি দেখিনি।' আমার একটু আশ্চর্য ঠেকেছিল মনে আছে। দাশসাহেব রিয়ালিস্ট ছিলেন, গয়ার বক্তৃতায় লীড দিচ্ছিলেন। তাঁর কথাই ঠিক—এখনকার কম্যুনিটি প্রোজেক্ট বেডেন-পাওয়েল কিংবা মুখুজ্যেমশাইদের ভিলেজ-কম্যুনিটি নয়। শরৎদারও পল্লী-সমাজ সম্বন্ধে যে তিলমাত্র মোহ ছিল না তা অনেকেই জানেন। কম্যুনিটি এখন সোসাইটি হয়ে গিয়েছে। প্ল্যানিং কমিশনের রিসার্চ বিভাগের সভ্যদের একবার জিজ্ঞাসা করি, 'কম্যুনিটি কথাটির অর্থ কি হলো?' উত্তর পেলাম, 'সিমিলারিটি অব ইণ্টারেস্টস।' টুনিস সাহেব অন্যভাবে ব্যাপারটাকে দেখেছেন। সে যাই হোক, গ্রামবাসীর ইণ্টারেস্টস এখন আর বেশি সিমিলার নয়, আগেও ছিল না। গ্রামের জমিদার আর ক্ষেত মজুরদের ইণ্টারেস্টস এক ছিল? এখনকার ভূমিধার আর ক্ষেত-মজুরদের এক? যাঁরা এক বলেন, তাঁরা জানেন না গ্রামে কি চলছে। উঁচু জাত আর ভূমিধার একধারে আর অন্য ধারে নীচ জাত আর ক্ষেত-মজুর।

আমার মনে হয় যে, গ্রামের উন্নতি হলেই সেটা ছোট শহর হয়ে ওঠে। হাইডেল আর মোটর-বাসের (ফিল্মেরও) আশীর্বাদে তাই হচ্ছে, আর হবে, আর হওয়া উচিত। দুর্নিবার গতি। পথের পাঁচালী পড়তে ভালো, দেখতে ভালো—কিন্তু সে-পথে মানুষ হাঁটবে না—সে-পাঁচালী মানুষে গাইবে না, গ্রামের মানুষেও নয়। (গ্রামেরও 'দিন যে গেল সন্ধ্যে হলো পার করো আমারে।' নারডনিকী রোম্যাণ্টিসিজম অচল।)

২৮-১০-৫৫

আলিগড়ে এসে একটা সুবিধা হয়েছে। এই এক বছরে বন্ধুদের দৌলতে ইতিহাসের কিছু নতুন ভালো বই পড়া গেল। ম্যাথিয়ে (Mathiez), লেফেভ্‌র (Lefevre) প্রভৃতি লেখকদের ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে নতুন গবেষণার খবর কানে পূর্বে এসেছিল। এবার পরিচয়ের সুযোগ পেলাম। আমরা যখন এম.এ-তে ইতিহাস পড়ি তখন শ্রীঅজয় দত্ত (রমেশচন্দ্র দত্তের পুত্র) আমাদের ফরাসী বিপ্লব পড়াতেন। লেকীই ছিল আমাদের প্রধান আশ্রয়। মধ্যে মধ্যে তিনি মিশ্‌লে, অলার্ড থেকে ভিন্ন মত শোনাতেন। বিপ্লব-পূর্বের অবস্থা সম্বন্ধে টেন্‌ থেকেও বলতেন। তাঁর কৃপায় ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে মোহ পাকা হয়ে গেল। বাবার আদেশে কার্লাইল আর. সেন ব্রাদার্সের দৌলতে ক্রপ্টকীনের অপূর্ব ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস ও আনাতোল ফ্রান্সের Gods are Athirst নামে বিখ্যাত নভেল পড়ে। ডিকেন্সের Tale of Two Cities আগেই পড়া ছিল। এই সব পড়ে-শুনে বার্ক-এর মতামত বাতুলতা মনে হতো। ওধারে ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্যের ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব তো ছিল ও-যুগের বাঁধা প্রশ্ন। তার ওপর ভিক্টর হ্যুগোর Ninety Three। এই সব বই-এর নেশা থেকে এখনও মুক্ত হতে পারিনি। এখনও ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে আমার মোহের অবসান হয়নি। টমসন বহুদিন পরে পড়ি— চোখ খুলে যায়। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনই চকমকে লেখা। তাঁরই

রচনাগুলি বোধ হয় ইংরেজি ভাষার জগতে ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ। মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। অবশ্য বিষয়টিও তেমনই। বিপ্লবীদের ভাষাও এমন ওজস্বিনী, দ্যোতনাময় যে, প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁদের বক্তৃতা কিংবা রচনা থেকে দু'-একটা উদ্ধৃতি থাকলেই রক্ত চন্‌মন্‌ করে ওঠে। আমার মনে হয় যেমন হিমালয় কিংবা মরুভূমি সম্বন্ধে তৃতীয় শ্রেণীর লেখা অসম্ভব, তেমনই ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে। (রুশ বিপ্লব সম্বন্ধেও খানিকটা তাই। কিন্তু চীন বিপ্লবের ট্রট্স্কী, রীড এখনও আসেনি, অন্তত আমার হাতে। দেখি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস কি হয়। বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ছাড়া আর কি হবে !)

এই সেদিন ম্যাথিয়ে পড়লাম। গত বৎসর লেফেভ্‌র ও বছর আষ্টেক আগে ম্যাঙ্গেলা পড়ি। রোবস্পিয়রকে ম্যাঙ্গেলা বুঝতে পারেননি। টমসন, ম্যাথিয়ে, লেফেভ্‌র রোবস্পিয়রের মর্ম বুঝেছেন। Reign of Terror-এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম হলো। ফরাসী বিপ্লবের অর্থনৈতিক তাগিদ ও সমস্যা নিয়ে যা পড়েছি তাতে মন ভরেনি।

কার-এর বলশেভিক বিপ্লবের ইতিহাস পাণ্ডিত্যের ও অন্তর্দৃষ্টির প্রায় শেষ কথা। সহানুভূতি আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বিরোধী নয়। (তৃতীয় ভল্যুমটা পড়া হলো না এখনও)। অত্যন্ত প্রাঞ্জল লেখা, তবু চমকে উঠলাম না। কি জানি, হয়তো ইংরেজি ভাষারই দোষ, কিংবা কার-সাহেবের মনের ভঙ্গীই ঐ রকম। তবু একদমে পড়া যায় এমনই সহজ, এমনই নতুন তথ্যে ভরপুর এমনই বিষয়ের ওপর অধিকার। শুনছি তিনি একাই আরো

কয়েক ভলুম লিখবেন। চার ভলুমে ১৯১৭ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত এসেছে—পরে Socialism in one Country নিয়ে দু' ভলুম লেখা হবে। এ-যুগে এই ধরনের মনুমেণ্টাল কাজ সম্ভব নয় ভাবতাম। কিন্তু কার সাহেব এবং চৈনিক বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক নীড্‌হ্যাম) অবাক করলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অতো জেনে-শুনেও কিছু লিখতে পারলেন না। মধ্যযুগে আরব পণ্ডিতরা ঐ ধরনের বিশাল বই লিখতেন শুনেছি।

বিপ্লবের ইতিহাসে একটা ছক পাওয়া যায় নিশ্চয়। মার্কস্ এঙ্গেলস্, লেনিন্ ট্রট্‌স্কী, স্টালিনের ও ইদানীংকার মাওৎসে টুং-এর রচনায় প্রায় সম্পূর্ণ হয়। ছক না হয় ধরা পড়লো, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়েছে, কোনো বিপ্লবই সিদ্ধ হয় না। যেটুকু অসিদ্ধ থাকে, সেটুকু সিদ্ধ হতে চায় পরের বিপ্লবে, প্রায়ই অন্যদেশের বিপ্লবে। তাই মাত্র নিজের দেশের বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে বেশি কিছু ফল হয় না, বরঞ্চ ক্ষতিই হয়। বুদ্ধিটা হয়ে যায় সঙ্কীর্ণ, প্রাণ হয়ে যায় আত্মপ্রসন্ন, আর ইতিহাস হয়ে যায় পিছনমুখো। ফরাসীদের তাই হয়েছে অনেকের মতে। আমাদেরও হবার ভয় আছে। আমাদের বিপ্লব ইয়ুনিক শুনে শুনে কান পচে গেল। অথচ নীরবে একটা টেক্‌নিক্যাল বিপ্লব চলছে, অনেক দিন থেকেই, এখন পরিবর্তনের মাত্রা বেশি বেড়েছে। নন্-ভায়োলেন্স কি কলকারখানা মানে, না তার মালিকরাই মানছে? ফ্যাক্টরীর চারপাশ দেখলে, শহরের উপনগর দেখলেই বোঝা যায় যে, যা হচ্ছে তা নন-ভায়োলেণ্ট বিপ্লব নয়। আপাতত অন্তত আমাদের টেক্‌নিক্যাল বিপ্লব বেশই ভায়োলেণ্ট

৩১-১০-৫৫

কাল আগ্রা গিয়েছিলাম। পূর্ণিমার রাতে তাজ দেখার জন্য নয়, অমনি, দিনের বেলায় আগ্রা ঘোরানো ভাই ও ভাইপো'কে। যতবার আগ্রা দেখি ততবারই মনে হয়, অলডস্ হাক্সলীর তাজ সম্বন্ধে মন্তব্যে বুদ্ধির খেলা সৌন্দর্য উপভোগের চেয়ে বেশি। তাজ সুন্দর, সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও, সুন্দর। মিলো'র ভিনাস বেশ পুরুষ্টু, পা দুটো বেশি লম্বা, তবু ভিনাস। তিলোত্তমাদের যক্ষ্মা-রোগ হয় শুনেছি।

একটা মজার জিনিস দেখলাম। ভেতরকার গেটের বাইরে গাড়িতে বসে আছি, এমন সময় একটা মোটরে জন আষ্টেক ছেলে-মেয়ে এলো। বুশ শার্টের রঙচঙ দেখেই বুঝলাম কোন্ দেশী। গাড়ি থেকে নেমেই সারবন্দী মোটরের দিকে গেল, কোন্টার কত অশ্বশক্তি, কোন্ মেক, পিক-অপ ইত্যাদি বহুবিধ টেকনিক্যাল আলোচনা চললো। একজন বললে, তার ড্যাডী এই স্পোর্টস-মডেলটা তাকে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু স্কুলের অন্য একটি ছাত্রের সেটা আছে দেখে সে নেয়নি। প্রায় পনেরো মিনিট পরে তারা ফাটকের সামনে দাঁড়িয়ে ক্লীক ক্লীক করে বহু ছবি তুললে। ক্যামেরার টেকনিক্যাল শব্দগুলিও কানে এলো। একটা অক্ষরও বুঝলাম না। মাত্র এই বুঝলাম, এখনও আমাদের নাবালক-নাবালিকারা সৌভাগ্যক্রমে অ-সভ্য। তবে সভ্য হচ্ছে ক্রমে ক্রমে।

আমরা রেলওয়ে ইঞ্জিন দেখতে ছুটতাম, এখন এওরোপ্লেন নিয়ে খেলে। টি. ভি-ও এলো বলে।

রবীন্দ্রনাথ শিশুদের উপহার দেওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত খাঁটি কথা বলেছিলেন। মেয়েদের বিবাহে পণপ্রথা উঠে যাবার কথা চলছে। মেয়েদের (এবং ছেলেদের) জন্মতিথি উৎসব বন্ধ করা যায় না? আগে পুতুলের বিবাহে বড়লোকরা বিস্তর খরচ করতেন। এখন তার প্রয়োজন নেই : বাচ্চারা সবই পুতুল। এরা যখন বড় হবে তখন ঐ তাজমহলে যা দেখলাম তাই হবে। জওহরলাল মেশিন ভালোবাসেন, আর শিশুদেরও ভালোবাসেন। যে শিশু গ্যাজেট নিয়ে খেলা করবে তারা তাদের ভারতবর্ষকে এঞ্জিনীয়ারিঙ-এর সমস্যা হিসেবে দেখবে। সোশ্যাল এঞ্জিনীয়ারিঙ কথাটা আজকাল সমাজতত্ত্বে খুব চলছে। ব্যাপারটা সুবিধের নয়।

সেলাই করবার সীঙ্গার মেশিনকে গান্ধীজী পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, ওর পিছনে সীঙ্গার সাহেবের স্ত্রী'র প্রতি প্রেম ছিল। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী আজ গত— রাজত্ব এঞ্জিনীয়ারদের, তাদের মূল্যবোধের এখন জয়জয়কার। বয়ার-এর গ্রেট হাঙ্গারের এঞ্জিনীয়ার নয়—মাত্র টেকনিশিয়ন। চাকরি মিলবে—আর কি চাই! পয়দাবারী বাড়বে—আর কি চাই!

১-১১-৫৫

বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। কোথায় পড়াশুনোর কথা ভাববে তা

নয় কর্তৃপক্ষের একটা তথাকথিত জরুরী চিঠির উত্তর দিতে ডিপার্টমেণ্টের পাঁচ-ছ'জন অধ্যাপক সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ব্যস্ত রইলেন। ব্যাপারটি তুচ্ছ—ডিপার্টমেণ্টের কোন্ ঘরে কোন্ ব্যক্তি ক'ঘণ্টা ক্লাশ নেন। সেটা টাইম-টেবিলের ওপর নির্ভর করে এবং একঘরে অন্য ডিপার্টমেণ্টেরও কাজ হয়; তার ওপর টিউটরীয়াল ক্লাশের কামরা এবং তার টাইম-টেবিল তৈরি করেন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ। এই নিয়ে ছোটাছুটি চললো সারাদিন। টিউটরীয়াল বস্তুটি একটি প্রকাণ্ড তামাসা, জুয়াচুরি বললেই চলে। সর্বত্রই তাই। অক্সফোর্ডে, কেম্‌ব্রিজে আছে, অতএব আমাদেরও থাকবে। সেখানে টিউটরীয়াল কতটা সার্থক সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ব্যাপারটা কেবল অন্ধ অনুকরণের জন্য সততাকে বলি দেওয়াই নয়, তার চেয়ে গুরুতর। এটা জানলা-সাজানোর চেয়ে খারাপ। এর গূঢ়ার্থ হচ্ছে এই—বিশ্ববিদ্যালয় আর শিক্ষাকেন্দ্র নয়, শাসনতন্ত্রের এডমিনিস্ট্রেশনের শাখা মাত্র। দিনে আট দশখানা এই ধরনের নিরর্থক চিঠির উত্তর দিতে হয়, হাতে লিখে আর কেবল স্কীমই তৈরি হচ্ছে, ফল কিছুই হচ্ছে না। অধ্যাপকরা যোগী নন, যে মা ফলেষু কদাচন বলে কর্মই করে যাবেন। সাধে কি অধ্যাপকরা পলিটিশিয়ন হয়ে যাচ্ছেন। যাঁরা ফল চান তাঁরা দেখছেন যে, কর্তৃপক্ষের দরজায় ধন্না দিলে ফল হয়। তাঁরা দেখছেন দল না পাকালে ফল হয় না। তাঁরা দেখছেন কেবল পড়াশুনো করলে কেউ তাদের পোঁছে না, কেউ তাঁদের কথা শোনে না, লেকচারার হয়েই দিন কাটাতে হয়, কনভোকেশ্যনের সময় পেছনকার সীটে বসতে হয়। এ আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, এতে কোনো ভুল নেই। যে এডমিনিস্ট্রেশনের দৌরাত্ম্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছে সেই এডমিনিস্ট্রেশনই কমিটি বসান

কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিটিক্স ঢুকেছে তাই জানতে। আর প্রতিকারও সেই এডমিনিস্ট্রেশন করতে যান নতুন আইন বানিয়ে। তাঁবুর মধ্যে উট ঢুকলো আর বাসিন্দারা গেল বাইরে।

রেডিওতে জনকয়েক ছাত্র-ছাত্রী পড়ন্ত স্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে আলোচনা করলেন। নানা কারণের মধ্যে একটি কারণ স্পষ্ট হলো। আজকাল মাস্টারদের সঙ্গে ছাত্রেরা মেশামেশি করতে পারছে না। বেশ সাফ সাফ কথা শুনলাম। শুনতে শুনতে গোটাকয়েক প্রশ্ন মনে এলো। ব্যক্তিগত সম্বন্ধ জমলে স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়বে ঠিক কিভাবে? ব্যক্তিগত সম্পর্কে দু'জন ব্যক্তির প্রয়োজন হয় এবং অন্তত একজনের মধ্যে উন্নতির আকাঙ্খা প্রবল হওয়া চাই। ভালো গুরুর ভালো শিষ্য কি সর্বদাই মেলে? গুরুশিষ্য সম্বন্ধে যা গুজোব আছে তার কি সবটাই সত্য? য়ুরোপের মধ্যযুগের সে সম্বন্ধটি সব সময় মধুর ছিল না। আর আমাদের আশ্রমেও যে সবসময় সম্বন্ধটি আদর্শোচিত ছিল না তারও উদাহরণ আছে। টোলে না হয় লগুড়াঘাত চলতো না, কিন্তু পাঠশালায়, মক্তবে চলতো সকলেই জানে। (আমার অভিজ্ঞতায় বলে স্নেহ ভালোবাসা পেলে ছাত্ররা ভদ্র হয়, কিন্তু তাই পেয়েই যে তারা ভালো ছাত্র হয় তা মনে হয় না।) বেশির-ভাগ ছাত্র মাস্টারদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, যদি আসে তো চাকরির জন্য। অতএব সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত হলে স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়বে কেন?

আমি খুব কম মাস্টার দেখেছি যাঁরা ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে চান না। কিন্তু ক্লাশে সেটা অচল। লক্ষ্ণৌ-এর বি. এ. ইকনমিক্স ক্লাশে ছয়শ' থেকে আটশ' ছেলে দেখেছি; এম. এ. ক্লাশেও দেড়শ' থেকে দু'শ' পর্যন্ত। আলিগড়ে এম. এ. ইকনমিক্স ক্লাশে প্রায় একশ'।

কি করে প্রত্যেককে চেনা যায় ? তাদের আবার সকাল সন্ধ্যায় ল'ক্লাশ। সময় কোথায় তাদের ? আরেকটি কথা মনে এলো, বেশি মেলামিশির ফলে পরীক্ষার ফল ভিন্ন হবে না তো ? আমার নিজের ভাগ্য ভালো এই ব্যাপারে। আচ্ছা, কোন্ মাস্টারদের সঙ্গে মেশামিশি করলে কোন্-ছাত্রদের উন্নতি সম্ভব ? যাঁরা নতুন কথা বলতে পারেন, নতুনভাবে দেখতে পারেন, আর যাঁরা নতুন কথা শুনতে চায়, ভাবতে চায়, দেখতে চায়। শেষোক্তদের সংখ্যাই বেশি মানছি। এখন এ-যুগে নতুন কথা, নতুন চিন্তার অর্থই বর্তমান পরিস্থিতির আলোচনা, সমালোচনা, অন্তত তাই থেকে শুরু। সমালোচনা করলে কর্তৃপক্ষ বলেন, dangerous thought প্রচার করছেন। এ আমার নিজের অভিজ্ঞতা, এমন কি স্বাধীন হবার পরও। তাতে হয়তো কিছু ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয় না, কিন্তু ক্ষতি হয় নিশ্চয়, মাস্টারদের এবং ছাত্রদেরও, কারণ, পরীক্ষার প্রশ্ন সেই মামুলি।

শেষ প্রশ্ন : স্ট্যাণ্ডার্ড পড়েছে তার প্রমাণ কি ? মানদণ্ডটা কি ? আমার একান্ত বিশ্বাস স্ট্যাণ্ডার্ড ভিন্ন হয়েছে, অতএব তুলনা করা যায় না। আমরা অবশ্য বলি উচ্ছন্ন যাচ্ছে, কিন্তু প্রমাণ কি ? আমরা বলবো চোখে দেখছি পড়ছে। আমি উত্তর দেবো, আমিও দেখেছি উঁচু হয়েছে; আমারও মনে আছে একশ' ছাত্রের মধ্যে ঐ গোটা তিন-চারের স্ট্যাণ্ডার্ড ছিল উঁচু, আর বাকি সব এখন যা তাই। এসব বুড়োদের কথা, গোঁড়ামির নামান্তর !

আরো একটি প্রশ্ন : যাঁরা বলছেন ছেলে ছোকরারা গোল্লায় গেল তাঁদের নিজেদের স্ট্যাণ্ডার্ড কি গৌরীশৃঙ্গ ? যাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের গলদ খোঁজেন, তাঁরা নিজেদেরই গলদ ঢাকতে চাইছেন না তো ? এমন হয় শুনেছি। দেশের গোলমাল ঢাকা হয়

অন্যদেশের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে ; অন্তরের বিরোধ ঘোচানো হয় অন্যের সঙ্গে বিরোধে। দেশের যুবক-যুবতীর ওপর কর্তাদের এতটা দরদ আমি একটু সন্দেহের চোখেই দেখি।

২-১১-৫৫

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। এ-ধরনের শুকনো শীত লক্ষ্ণৌ-এ ছিল না, কলকাতা-বাংলা অঞ্চলে তো নেই-ই। দিনে সূর্যের তাপ এখনও খর, মিঠে নয়, হয়ও না। পৌষ মাসে মাটির বারান্দায়, কি পুঁই মাচার নিচে, কাঁথা জড়িয়ে রোদ পোয়ানো, কোলে মুড়ি নারকেল কোরা, গেলাশে খেজুর রস, আর ঘরের ভেতরে ভাঁড় থেকে নলেন গুড়ের গন্ধ ভরভর, এ কেবল বাংলা দেশেই সম্ভব। অবশ্য সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়ার জ্বরও বটে। সব আত্মকথার শৈশব অধ্যায়টিই মধুর। |স্মৃতির নির্বাচন একদেশদর্শী না হলে মানুষে বাঁচতে পারতো না।|

আজ আকাশ কোবাল্ট নীল ছিল। ঘুড়ি-পায়রা নেই বটে, কিন্তু তোতা পাখী অসংখ্য। ঝাঁকে ঝাঁকে নিমগাছে বসে, সূর্যমুখী পায় না বলে নিমফল খায়। এখানে প্রায় সব গাছই নিম, মধ্যে মধ্যে খেজুর গাছ। এম. এ. ও কলেজের “শীল” হলো খেজুর গাছ আর চন্দ্রকলা, ঈদের চাঁদ। একেবারে আরবী ব্যাপার। কিন্তু এত নিমগাছ কোত্থেকে এলো? ভারতের বাইরে কোন্

মুসলমান দেশে নিমগাছ এত প্রচুর ? যতদূর জানি ইসলাম ধর্মে-সঙ্গে নিমগাছের কোনো যোগ নেই। এইবার বুগেনভিলিয় ফুটতে শুরু হবে। এত সুন্দর, এত রকমের বুগেনভিলিয় কোথাও নাকি পাওয়া যায় না। একজন অধ্যাপকের দাবি যে, তিনি চুয়াত্তর রকমের বুগেনভিলিয়া তৈরি করেছিলেন আঠারো রকমের কানাড়া, দশ রকমের টোড়ি, আর বারো রকমের মল্লারের মতনই বোধ হয়।

এত বেশি বৈচিত্র্য, এত চুলচেরা ভাগ করার প্রবৃত্তি ব্রাহ্মণ সভ্যতা ও বাইজ্যান্টাইন সভ্যতার শেষ যুগের লক্ষণ। ক্ষুধামান্দ্যের সময় স্বাদ জাগিয়ে রাখার ফন্দী হলো ঐ আচার আর চাটনির ঘটা! যে ইমন গাইতে পারে না, সে হেম-কল্যাণ গাইতে যায়! / সহজ, সরল রুচির মধ্যে যে প্রসাদগুণ থাকে সেইটেই ধ্রুব, সেইটাই ক্লাসিক। বাকি সব খেয়াল। \

সুধীন দত্তের রচনায় এত flying buttress যে তাকে গথিক বলতে ইচ্ছে হয়। অথবা, যদ্যপি, তথাপি···ইত্যাদির প্রয়োগ কি গদ্যসুলভ যুক্তির নিদর্শন, না নিগূঢ় সত্যের সম্মুখে সততাময় মনের সাবধানী প্রতিক্রিয়া ? এই মন গুহানিহিত সত্তার একান্ত অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখতে পারে না, তাই অস্তিত্বের সাময়িক সততাকে ভেঙে ক্ষণ-ক্ষণ করতে চায় : অথচ বিশ্বাস চায়, তাই নিয়ম মানতে বাধ্য। | এ-নিয়ম একধারে সমগ্র বিশ্বকে চালাচ্ছে। সুধীনের রচনাতে যে নিয়ম পাই সেটাও প্রায় দুর্নিবার। একধারে চরাচর বিশ্ব, অন্য ধারে ছন্দ। একধারে কসমস, অন্য ধারে ক্রাফট। দুটি নিয়মের সম্বন্ধ কি ?

সুধীন, অন্যান্য কবিদের মতন বলতে রাজী নয় যে, কবিতার

ছন্দ আর বিশ্বছন্দ একই বস্তু। বিজ্ঞান-সম্মত কার্যকারণ-পরম্পরাকেও সে ছন্দের মধ্যে আনতে পারে না—কোনো কবিই পারে না, যদিও সেটা কবিতার বিষয় হতে দেখেছি। তাই সুধীনের রচনায় সম্বন্ধের দুটি গুণ চোখে পড়ে। এক—অনিবারতা, আর নৈর্ব্যক্তিকতা। যারা অতোটা নিয়ম মানে, তারা ব্যক্তিকে বাদ দিতে বাধ্য। এই মনোভাবকে সাধারণত 'এবজেক্টিভ' বলা হয়। সুধীন কবিতাকে, আর্টকে ইম্পার্সন্যাল করতে চায়। জাঁতাকলের চাপে হতাশাই উৎপন্ন হয়। হতাশা ফ্রাস্ট্রেশ্যন নয়, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাও নয়, নঙর্থক নয়, সদর্থক। ত্রিশ দশকের মনোভাব বলে একে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এটা বিষাদ; এবং এর সাক্ষাৎ প্রত্যেক ক্রান্তির মূলে পাওয়া যাবে। মধ্যযুগের অবসানের ও নতুন যুগের আগমনের মুখে এই বিষাদের ছায়া থাকে। দ্বন্দ্বটির রূপ বাস্তিক না হলেও তার প্রকৃতি নিতান্তই মানবিক, ঐতিহাসিক। তাই মনে হচ্ছে, সুধীনের রচনাশৈলীকে ধ্রুবপদ্ধতির মধ্যে ফেলা অসঙ্গত। ধ্রুবপদ্ধতির মর্ম শান্তি, নিয়মানুবর্তিতা নয়। প্রসাদ থেকেই প্রসন্নতা, কিংবা প্রসন্নতা থেকেই প্রসাদগুণ।

সুধীনের কবিতায়, গদ্যে অর্থাৎ তার বিষয়বস্তুতে, বৌদ্ধদর্শনের ছাপ পেয়েছি। সৌতান্ত্রিক কি বৈভাসিক ততটা নয়, যতটা মাধ্যমিক। দুটি প্রধান লক্ষণ, ক্ষণিকবাদ আর ডায়েলেক্টিক। 'শূন্যতা'ও খানিকটা। এবং পারমিতাবোধের প্রক্রিয়াও খানিকটা পেয়েছি তার শৈলীতে— যথা, পরিমাণ ও পরিণতিতে। রচনাকে সে 'পারফেক্ট' করতে চায়, আর তার দ্বৈততা ও বিরোধ সংজ্ঞা পরিমাণদ্যোতক। তার ডায়েলেক্টিক হেগেলীয়ান নয়, মার্কসিস্ট তো নয়ই। তার কাছে সিনথেসিস নেই, অতএব স্পাইরালও

নেই। এখানেও স্থধীন মাধ্যমিক, সন্দেহ হয়। কিন্তু স্থধীনের 'করুণা' নেই, বিষাদই আছে।

সময় নেই, নচেৎ এই বিষয় আরো ভাবা যেতো। একটা কথা খুব জোরে মনে হচ্ছে। বিদেশী সাহিত্যালোচনায় কোন কবির মধ্যে কতখানি খৃস্টান ধর্মের প্রভাব দেখাবার রীতি স্থপ্রচলিত। রবীন্দ্রনাথের রচনা-আলোচনায় উপনিষদের প্রভাব, কবীরের প্রভাব অনেকে খুঁজেছেন ও পেয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য হিন্দু দর্শনের, হিন্দু ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে বিচার বড় বেশি নজরে পড়েনি। যা কিছু তবু রবীন্দ্র সমালোচনায় আছে, যৎসামান্য কিন্তু অন্যান্য লেখকের বেলা কিছুই হয়নি। এটা নিতান্ত দুঃখের কথা। আমরা কি সবই পুরোপুরি বিদেশী? আরেকটি কথা। বৌদ্ধযুগের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে—তার কারণও আছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম তো ভারতেরই; এবং যদিও আমরা আর বৌদ্ধ নই, তবু আমরা বিশেষত বাঙালীরা, সকলেই প্রায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। (বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগরও বোধ হয় তাই ছিলেন)। শৈলী থেকে এলিয়ট-অডেন-ম্যালার্মে সকলেরই প্রভাব দেখবো, অথচ বৌদ্ধ ও ইসলামী প্রভাব নজরে পড়বে না এ কেমন চোখ? আত্মবিস্মৃতির মতন বোকামি আর নেই। আমি জনসঙ্ঘী আলোচনা চাইছি না; যা আছে তার স্বীকৃতি ও তার বিচারই চাইছি। কেবল জন-সাহিত্য, জন-সাহিত্য চিৎকার করলেই হয় না।

জন-সাহিত্য, জন-সঙ্গীত, জন-নৃত্য নিয়ে মাতামাতি করবার অবশ্য কারণ আছে। ধ্রুপদ-খেয়াল শেখা, গাওয়া শক্ত; ভারত নৃত্য অত্যন্ত কঠিন জিনিস; মেঘদূত, মেঘনাদবধ বোধের জন্য

কাঠখড় চাই। 'পীপল্‌স্‌ আর্টে' ও-সব বালাই নেই, অন্তত, তাই আমরা মনে করি। পরিশ্রম, ডিসিপ্লিন, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের পছন্দ নয়; এবং তাঁরাই এখনকার আমরা। দ্বিতীয় কারণের উৎপত্তি প্রথম কারণেই লুপ্ত রয়েছে। সেটা হলো এই যে, ধ্রুবপদ্ধতির আর্টে কোনো তেজ নেই মনে হয়: এবং আমরা তেজ চাই। কেবল তাই নয়; আমাদের ধারণা জীবন মানেই তেজ। 'সজীবতা' কথাটাই তার প্রমাণ। সেজন্য আমরা গানে বাজনায়, নাচে লম্ফ-ঝম্প দেখলেই বলি কী সজীবতা, কী ভিগ্যর! সাহিত্য-রচনা, বক্তৃতার বেলাও তাই। কিন্তু এটা আংশিক সত্য। আর্টের তেজ আর জীবনের তেজ এক বস্তু নয়। রাশিয়ান জন-নৃত্যের লম্ফ আর রাশিয়ান 'ব্যালের' উল্লম্ফনের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। একটাতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জয়, অন্যটিতে তার ক্ষয়, তার পরাজয়। আর্টের তেজ জৈব ও আধিভৌতিক তেজের চেয়ে ম্রিয়মান হতে বাধ্য; কারণ তখন যুদ্ধের অবসান হয়েছে, জয় হয়েছে, অথচ উল্লাস নেই, এসেছে বিষণ্ণতা। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের বিষাদ যুদ্ধের মধ্যে। তার বর্ণনা সঞ্জয়ের মুখে, যুদ্ধান্তে তাই আর্ট। ট্রাইব্যাল আর্ট শিকার নয়, শিকারের পরিবর্ত; প্রিমিটিভ আর্টও তাই। প্রত্যেকটাই সোফিস্টিকেটেড, অত্যন্ত।

রোমাঁ্যা রোলাঁ মিকেল-এঞ্জেলোর জীবনীতে তাঁর একটি প্রস্তর-মূর্তির ব্যাখ্যায় এই কথাই বলেছেন। বিজয়ী গ্ল্যাডিয়েটার জয়ের পরমুহূর্তে বিষণ্ণ। হাতের মারণযন্ত্র হাতেই রইলো, ব্যবহার আর হলো না।

গোলদীঘির এক বেঞ্চে বসে শিশিরবাবুও এই কথাই বলেছিলেন। 'সীতা'র অভিনয়-উপলক্ষ্যে কে একজন লিখেছিলেন যে, কেষ্টবাবুর গানে কোনো জীবন নেই, এক্সপ্রেশ্যন নেই।

তারই উল্লেখ করে শিশিরবাবু বলেছিলেন, 'কোথায় সীতা, কোথায় সীতা বলে কি কেঁদে বেড়ানো উচিত ছিল ?'

আমার অভিজ্ঞতাও তাই বলে। হালিশহরের এক পাড়ার 'প্রফুল্ল'র অভিনয়ে প্রফুল্ল এতই সজীব ও স্বাভাবিকভাবে কেঁদেছিল যে, হাসির ঠেলায় যবনিকা নামাতে হলো।

তবে এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, জীবন-স্রোতের বিপক্ষে আর্টের নৌকা বেশি দিন চালানো যায় না। এও ঐতিহাসিক সত্য যে, সঙ্কটকালে আর্টকে জীবনের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে হয়েছে, নচেৎ বাঁচেনি। তবে ঐতিহাসিকভাবেই সত্য, সৃষ্টি কিংবা উপভোগের হিসেবে নয়। এবং জীবনের অর্থ এক্ষেত্রে কর্ম নয়, কর্মপ্রবণতা--যাকে সংহতি দেওয়াটাই আর্টের ধর্ম।

১৩-১১-৫৫

পণ্ডিতজী এলেন গেলেন। লাভের মধ্যে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় অনেক টাকা পেলো। তিনি লাইব্রেরী আর হস্টেলের ভিত্ পত্তন করলেন। এখানকার চোখের হাসপাতাল খুব নামজাদা। ডাঃ মোহনলালের কৃতিত্ব তারিফ করতে হয়। সেখানেও টাকা এলো কিছু। আমাদের চান্সেলার দাউদী বোরা সম্প্রদায়ের মোহন্ত। কুবের, তবে দিতে জানেন। দু'দিনে ভদ্রলোক প্রায়

চার লক্ষ টাকা দান করলেন। সবচেয়ে মজা প্রতি ডিপার্টমেন্টের কর্তাকে এক জোড়া শাল ও মিঠাই উপহার।

পণ্ডিতজীর মেজাজ ভালো। সকালে অমৃতসর থেকে উড়ে দিল্লী, দিল্লী থেকে মোটরে আলিগড় এবং প্রায় বিশ মিনিট আগে পৌছনো। গলার আওয়াজে ও মুখে একটু যেন বয়সের চিহ্ন দেখলাম। খাবার সময় কথাবার্তার সুযোগ ছিল না। ট্রাফিক কন্ট্রোলের ঠেলায় বিকেলের চা-এ যেতে দেরি হলো।

জওহরলাল এখন লীডার অব দি হাউস ইত্যাদি—পরে তিনিই হবেন লীডার অব দি অপোজিশন। গান্ধীজীকে ভুলতে বসেছি নানা কারণে, কিন্তু জওহরলালের অবর্তমানে তাঁকে প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করতে হবে ভয় হচ্ছে। নেতার নেতৃত্বের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়তা নয়, দৈনিক জীবনে বিস্মরণীয়তা।

১৩-১১-৫৫

ডবলিউ. এ. লিউইস-এর 'দি থিওরী অব ইকনমিক গ্রোথ' ও টি. আর. ভি. মূর্তির 'দি সেন্ট্রাল ফিলজফি অব বুদ্ধিজম' শেষ করলাম। সকালে ইকনমিক্স, আর বিকেলে ও সন্ধ্যায় বৌদ্ধদর্শন। এই প্রকার শ্রম-বিভাগে আমার শরীর ও মন ঠিক থাকে। লিউইস-এর ভাষা সর্বদাই প্রাঞ্জল। এই বইখানিতে এমন একটি

বাকা নেই যা বুঝতে কষ্ট হয়। ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতা প্রচুর এবং মাথা ঠাণ্ডা। উপনিবেশের বিশেষত আফ্রিকার, হালচাল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল—নিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান নিগ্রো, এখন ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। ডোমার-হ্যারড-স্পেংলার-স্পীগেল প্রভৃতির রচনায় অনুন্নত দেশের চর্চা আছে নিশ্চয়, কিন্তু সবই যেন উন্নত দেশের এবং মাত্র অর্থনৈতিক ব্যাপারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। লিউইস-এর বইখানির বিশেষত্ব ঐখানে। কোন সামাজিক কারণে অনুন্নত দেশের উন্নতির পথে বাধা আছে ও উঠছে তার বিশ্লেষণ ও বিশদ বিশ্লেষণ এই বইখানিতে প্রথম পেলাম। অর্থাৎ লিউইস-এর মতে আমাদের দেশে প্ল্যানিং মাত্র অর্থনীতির ব্যাপার নয়, সমাজতত্ত্বেরও বটে। বহুদিন থেকে আমি এই কথা বলছি, কেউ শোনেনি। একজন ম্যাঞ্চেস্টারের অধ্যাপকের রচনা পড়ে যদি কোনো ফল হয়! এক অদ্ভুত চক্রের মধ্যে আমরা আটকা পড়েছি। আমার বিশ্বাস যে, বুদ্ধিবৃত্তিতে আমরা এখনও পশ্চিমের দাস। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্ল্যান-পীরিয়ডের পরে হয়তো দাসত্ব ঘুচবে। এতদিন অপেক্ষা করা আমার ধাতে বসে না। তবে শেকল কাটতে যেন খানিকটা রাজি হয়েছি মনে হচ্ছে।

মূর্তির বইখানি আমার খুব ভালো লাগলো। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনি সহজ ভাষা। বৌদ্ধ ডায়েলেক্টিক যে এত তীক্ষ্ণ জানতাম না। বিদেশী ডায়েলেক্টিকই পড়ে এসেছি। কী কপাল! নিজেকে অত্যন্ত শেকড়-ছেঁড়া মনে হচ্ছে। অথচ বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে যে কিছু পড়িনি, তা নয়। কিন্তু যা পড়েছি, তা প্রায় সমস্তই বিদেশীর লেখা এবং ইংরেজীতে। বিদেশী ডায়েলেক্টিকের সঙ্গে মাধ্যমিক ডায়েলেক্টিকের পার্থক্যটি আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান। সব মার্কসিস্টদের এ বইখানি পড়া উচিত।

একটা নিতান্ত মোটা কথা মনে উঠলো। মাধ্যমিক কি সত্যই বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যমণি? সত্যই কি মাধ্যমিক বৌদ্ধ দর্শনের শ্রেষ্ঠ দান, সবচেয়ে অর্থবাহী সামগ্রী? মূর্তি 'বুদ্ধিজম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তার অর্থে দ্ব্যর্থবোধ রয়েছে—দর্শন ও ধর্ম। ভালো কথা—এ দেশে দর্শন ও ধর্ম অভিন্ন। তাই যদি হয়, তবে কেবল মাধ্যমিকের দার্শনিক যুক্তি-পদ্ধতির তাড়নায় কি বৌদ্ধ ধর্মের অতোখানি প্রসার হয়েছিল? মূর্তি একটু যেন মাধ্যমিকের ওকালতি করেছেন, সন্দেহ হলো। বিদেশী মতে অবশ্য ধর্ম ও দর্শন এক বস্তু নয়। সেই হিসেবে মূর্তি ঠিকই করেছেন। (তার ওপর বইটা থীসিস থেকে তৈরি হয়েছে।) কিন্তু তা যদি হয়, তবে মূর্তির ওকালতি ভারতীয় ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, মানতে হয়। এখানে একটা গলদ আছে সন্দেহ হচ্ছে। মহাযানের সামাজিক প্রতিবেশটা পেলে খুশি হতাম। মাধ্যমিকের ধর্ম কি ছিল? অবশ্য মাধ্যমিকের ধ্যানধারণা শিক্ষার পরিচয় পেলাম। কিন্তু ক'জন লোক ঐ প্রকার 'সেণ্ট্রাল ফিলজফি'র আকর্ষণে বৌদ্ধ হয়েছিল? এই খবরটি পেলে আমি সন্তুষ্ট হতাম। আমি হয়তো অন্যায় প্রত্যাশা করছি। মূর্তি যা দিয়েছেন, সে জন্য আমি তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

অনেক সংস্কৃত কথার ইংরেজী প্রতিশব্দ শিখলাম। কুমারস্বামীর অনুবাদের মতন নয় অবশ্য। বাঙলা লেখবার সময় ব্যবহার করা যাবে।

কী অদ্ভুত অবস্থা আমাদের! বাঙলা লিখি তিন পাক ঘুরে—সংস্কৃত থেকে ইংরেজী, ইংরেজী থেকে সংস্কৃত, তার পর সংস্কৃত থেকে বাঙলা। ঐ তিন পাকই থেকে যায়—আজকালকার বিবাহের মতন।

২৪-১১-৫৫

রেডিও সঙ্গীত সম্মিলনীর কিছু কিছু গান-বাজনা শুনলাম। উদ্বোধন-সঙ্গীত মোটেই জমেনি। চন্দ্রশেখর পন্থ-এর ধ্রুপদ শুনে খুশি হলাম। চন্দ্রশেখরকে তার শৈশব অবস্থা থেকে জানি। তার মামা ও মাতামহ আমার পরিচিত ছিলেন। এলাহাবাদে হরিনারায়ণবাবুর কাছ থেকে ধ্রুপদ শিখে লক্ষ্ণৌ-এ খেয়াল শিখতে আসে। সেই সঙ্গে হিন্দী ও সংস্কৃততে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে গবেষণার কালে অসুস্থ হয়ে পড়ে। রানিখেতের কাছে দ্রোণাগিরি পাহাড়ে এক আশ্রমে থাকতো, আর ভজন গাইতো। দশ বারো বৎসর তার কোনো খোঁজ পাইনি। তার কণ্ঠ শুনে খুব ভালো লাগলো। বিশুদ্ধ উচ্চারণ, বিশুদ্ধ পদ্ধতি এবং বিশুদ্ধ ভঙ্গি। একটু যেন গলা কাঁপছিল, মনে হলো। আর হাম্বিরের মধ্যে কল্যাণ অংশটুকু যেন একটু বেশি প্রকট। তবু চমৎকার। হাম্বির নিয়ে ভাতখণ্ডেজীর সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি মনে পড়ছে। মেয়েদের মধ্যে যা শুনলাম, তার মধ্যে হীরাবাঈ-এর গায়নই আমার মন হরণ করে নিলে। দবীর খাঁ'র দরবারী কানাড়ার শেষটা কেবল ঝন ঝন করছিল। পান্নালাল ঘোষের বাঁশি আর বিসমিল্লার সানাই বাজনা চমৎকার। রবিশঙ্করের সেতারের তুলনামূলক বিচার করতে পারলাম না বলে দুঃখ হচ্ছিলো। বিলায়েৎ, আলি আকবর কি বাজিয়েছিল?

জীবনে এত সঙ্গীত-সম্মিলনীতে যোগ দিয়েছি যে, আর সশরীরে

যোগ দিতে ভালো লাগে না। রেডিওর মারফত অনেক গুণীর গান-বাজনা শুনতে পেয়েছি। তবু যেন নাক্কুর বদলে নরুণ। সামনে বসে শুনলে অনেক বেশি উপভোগ করা যায়। তবু মন্দের ভালো। লক্ষ্ণৌ-এ তবু কখনও কখনও সামনে বসে শুনতে পেতাম, লাইব্রেরী অসহ্য হলে ছুটে শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জিণকারের ঘরে যেতাম। এখানে সে-গুড়ে বালি!

এই সম্মিলনীর জন্য একটা ফরমায়েসী ইংরেজী প্রবন্ধ পাঠিয়েছি। Great masters I have heard…মুখে বলে গেলাম, স্টেনো লিখে নিলে। শুনেছি ছাপা হয়েছে। আমার নিজের পছন্দ হয়নি। ওর অনুবাদ না করাই ভালো। ডিক্টেশনের সময় কথা আসে, চিন্তা স্থগিত থাকে, অন্তত রুদ্ধ তো হয়ই। তা ছাড়া, সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার আগ্রহে মন্দা পড়েছে। শুনতে ভালো লাগে, তাও সব সময় নয়, ব্যস, ঐ পর্যন্ত। একদিন মনে হতো সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার উৎসাহ মৃত্যুদিন পর্যন্ত কমবে না এবং কমে যদি তো চিত্রকলায়, সাহিত্যে, কবিতায়। এখন দেখছি কোনো গান-বাজনা শুনতে গেলেই মনে ওঠে কে কবে ঐ গান, ঐ গৎ, ঐ রাগ কিভাবে গাইতো, বাজাতো। এমন কি এক একটি স্বর সম্পর্কেও তাই। বার্ধক্যের চিহ্ন, হয়তো বা স্মৃতির ক্রিয়া সঙ্গীতেই সবচেয়ে বেশি। প্রুস্ত-এর লেখাতেও তাই দেখি। এখন মনে হচ্ছে, প্রতি আর্টের কাল-প্রতায় ভিন্ন। স্মৃতিরও রকমফের আছে। দুটো মিশে গেলে ভোলা যায় না কেবল নয়, অভিজ্ঞতা জাগ্রত থাকে, পদ্মের মতন।

চিত্রের কাল একটি ক্ষণ, প্রমাণ ইম্প্রেসনিস্ট ছবি, যেটা পূর্বতন পশ্চিমী চিত্রকলার চরম পরিণতি। একটি ক্ষণ এই জন্য: আকাশকে

পটে বাঁধতে হলে সময়কে টুকরো করতে হয়। দ্রুতি ও স্থান একত্রে সম্ভব নয়। ভাস্কর্যও তাই, তবে তার ধর্ম হলো ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিক্ষণের সমবায়ে পূর্ণতার আভাস দেওয়া—যথা rondure (রণ্ডিয়র)। রোঁদ্যার তৈরি মূর্তির চারধারে ঘুরলে তবে তার ঐক্যের সন্ধান মেলে। স্থাপত্যের কাল হলো যুগ। এখানে যুগটাই ক্ষণ। চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য সব কলারই ঐ এক প্রয়াস—আকাশকে ধরা, বাঁধা, সময়ের একটি গণ্ডির মধ্যে পোরা—পুরে জয় করা। সঙ্গীতের প্রাণ কাল অর্থাৎ লয়, তারই ভাঙা-গড়া। সঙ্গীতের আকাশ চিত্র-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের আকাশ নয়—বাইরের বস্তু নয় যাকে কব্জায় আনতে হয়। প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতের আকাশ উপমা মাত্র। সঙ্গীতের দীর্ঘ অবকাশকেই আকাশ বলা হয়। ধ্রুপদে 'স্পেস' আছে, কারণ সেটা বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয়।

তেমনই স্মৃতিও আকাশ ও অবকাশ, অর্থাৎ কালধর্মী। বেশির ভাগ সময় কালধর্মী। কালের স্মরণ নয়, ভিত্তিটাই কাল—প্রমাণ স্বপ্ন। তাই সঙ্গীত স্বপ্নময়। গান শুনলে মেয়েরা স্বপ্ন দেখেন শুনেছি। পুরুষেও দেখেন, তবু লজ্জায় বলেন না। কারণ, কাল চেতনাহীন, চেতনার শত্রু।

গন্ধের কলা নিশ্চয় আছে। বেশি সিগারেট খেলে সে-কলার জ্ঞান জন্মায় না শুনেছি। গন্ধ-কলা উপভোগের জন্য সিগারেট ছেড়ে মদ ধরতে পারি না।

ফুল—গোলাপ, জুঁই, বেলী, চামেলী, গন্ধরাজ…সখ গিয়েছে। আগে লোকে আমার বাগান দেখতে আসতো।

এক কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে বেরিয়ে এসে দেখি, একটা গাছে তিন রঙের গোলাপ ফুটেছে, সাদা, লাল, হলদে—কলম বসিয়েছিলাম। কি যেন হয়ে গেল।

আর এক বসন্তের সকাল। বোম্বাই থেকে রাতে ফিরেছি। সকালে দেখি বাগানের পশ্চিম ধারে কাঞ্চনের বাহার। পাঁচটা গাছ ফুলে ছেয়ে গিয়েছে—একটা পাতা নেই, সব ফুল। কাঞ্চন কি চেরীর জাত? বিকেলে ছাত্রদের ডাকলাম—ইচ্ছে হচ্ছিলো ছুটি দিই। পড়ে যা হয় তা তো দেখলাম—তার চেয়ে চেরী-কাঞ্চনের ফুল দেখুক। এ-বিদ্যে শুকনো। রবীন্দ্রনাথ ঠিক ধরেছিলেন, কিন্তু অন্যে ধরে রাখতে পারলে না।

২৯-১১-৫৫

মথুরার মিউজিয়ম দেখে এলাম। বৃন্দাবন গেলাম না। যমুনা-বিহার করা গেল। মাঝি বললে, কচ্ছপগুলো বৈষ্ণব। অত্যন্ত নোংরা শহর, আলিগড়ের চেয়ে পরিষ্কার শুনলাম। একটা মন্দিরে ঢুকলাম, মোজাও খুলে। মথুরা দেখে যদি শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে ওঠা হিন্দুত্বের লক্ষণ হয়, তবে আমি অ-হিন্দু। আমার পারিবারিক সংস্কারও হতে পারে। আমরা শাক্ত-বৈদান্তিক। বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিরোধ হয়তো আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। আমাদের বাড়িতে কখনও কীর্তন গান হয়নি। রসময় মিত্রমহাশয় আমার পিতামহের ছাত্র, হিন্দু স্কুলের অধ্যক্ষপদ থেকে অবসর নেবার পর কীর্তনে মনোনিবেশ করেন। আমার বাবা দু-তিন বার তাঁর কীর্তনের আসরে উপস্থিত হন। প্রত্যেকবারই একটা না একটা

অঘটন ঘটেছে দেখে রসময়বাবু তাঁকে বলেন, 'ওহে তুমি আর এসে না।' কীর্তন ভেঙে যাওয়াতে বাবা মহা খুশি হয়েছিলেন। আমার জ্যাঠতুতো বোনের স্বামী বৈষ্ণব হয়ে যান, ফলে তিনিও হলেন। দুর্গাপূজার সময় তাঁদের নিমন্ত্রণ করা হয়নি। আমার বোন জোর করে আসেন। কর্তা-গিন্নীদের কাছে তাঁকে কি শ্লেষই না উপভোগ করতে হয়েছিল! আমার ভগ্নীপতি মোটর-চাপা পড়ে মারা যাবার খবর শুনে বাড়িতে মন্তব্য হলো, "ধর্মান্তরের অভিশাপ ভোগ করতেই হবে।" অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল। আমার বন্ধু হরিদাসকে (মডার্ন আর্ট প্রেসের হরিদাস চট্টোপাধ্যায়) বাবা অত্যন্ত ভালোবাসতেন, কিন্তু 'হরিদাস' বলে ডাকতেন না, 'ওহে, শুনছো' বলতেন। একদিন শুনলাম তিনি বলছেন, 'তুমি এত ভালো ছেলে, কিন্তু নামটি বাবা অমন কেন হলো? তবে কথাটা (অর্থাৎ হরি শব্দটি) গ্রীক ক্রীড থেকেই এসেছে মনে হয়, এই যা!' খুব খারাপ লেগেছিল।

কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ে তাঁর মৃত্যুশয্যায় কৃষ্ণভামিনী দাসীর মুলতানের রেকর্ড শোনানো। তিনি উচ্চ-সঙ্গীতের নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন। ডাক্তারে বলে গেলেন বাঁচবেন না, তাই শখ মেটাতে যাই। কৃষ্ণভামিনী তখনকার বাঙালী গায়িকার মধ্যে ভালো খেয়ালী বলে পরিচিত। রেকর্ডটা মুলতানী মনে হচ্ছে। তিন মিনিটের রেকর্ড শেষ হতে না হতে তিনি বলে উঠলেন, "উঁহু, উঁহু, উঁহু--কেবল তানই হচ্ছে। যার গলায় স্বর বসেনি, সুর বসেনি, সেই তান মারে। যার সরল রেখা হয় না, সেই রঙ চাপায়।" হয়তো ভুল, তবু একটা স্ট্যাণ্ডার্ড। প্রমথ চৌধুরীমশাইকে ঘটনাটি বলি। তিনি তারিফই করলেন।

একদিন বিজয় মজুমদারের সঙ্গেও আমাদের পরিবারের বৈষ্ণব

বিদ্বেষ সম্বন্ধে কথা হয়। তিনিও আমার পিতামহের ছাত্র ও আমার বাবার সহাধ্যায়ী। তিনি বললেন, "ওটা তোমাদের ভাটপাড়ার তন্ত্র-বেদান্তের ধারা। নবদ্বীপ যে নবদ্বীপ, সেখানেও তাই ছিল। আমার মামার বাড়ি (?) নবদ্বীপে। একবার ছেলে-বয়সে যাই। পাড়ায় কীর্তন হচ্ছে শুনতে গেলাম। ফিরতে দেরি হলো। দাদামশাই ডেকে পাঠালেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?' 'কীর্তন শুনছিলাম।' ভদ্রলোক বললেন, 'গঙ্গায় ডুব দিয়ে এসো।' "

এ-সব পুরানো কথা শোনাবার ইচ্ছে হচ্ছে। বাঙালী ভাবসর্বস্বই শুনে এলাম। কিন্তু বাংলার কৃষ্টিতে যে একটা প্রবল যুক্তি, নিষ্ঠা ও দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির ধারা আছে, সাধারণ লোকে জানে না, মানে না। ১৯২০ কি ১৯২১ সালে গান্ধীজী একবার বাঙালীকে 'ইমোশন্যাল' বলেছিলেন। প্রতিবাদ করে একটা প্রবন্ধ লিখি। মডার্ন রিভিউতে পাঠাই। ফেরত পাই। পরে ক্যালকাটা রিভিউতে বেরোয়। প্রবন্ধটি আমার কাছে নেই। আমি ঐ ন্যায়, নিষ্ঠা ও তন্ত্রের ধারা দেখাতে যাই। নিষ্ঠার ইতিহাস ঠিক দিতে পারিনি। ভাটপাড়ায় আজ-কাল শুনেছি নতুন পাণ্ডিত্যের প্রবাহ এসেছে। যদি কোনো ভট্টাচার্য নিষ্ঠার ধারা ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে লেখেন, তবে দেশের উপকার হয়। আধুনিক বাংলার প্রকট 'ইমোশন্যালিজম' বিজয়কৃষ্ণ থেকে আরম্ভ—শিশির-চিত্তরঞ্জন-এ বিকাশ, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে চরমতা, ও কিসে পরিণতি না লেখাই ভালো। সীমান্ত (ফ্রন্টিয়ার) সভ্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয় এই বাঙলার কৃষ্টি। শরৎকালের মেঘের মতন নক্সার বাহার। স্থিতিস্থাপকতা নেই। রবীন্দ্রনাথ একদিন বললেন, 'কি করবো বলো! আমরা যে কেবল অনুকরণ করতে পারি না।' গানের কথা হচ্ছিলো।

মথুরার স্থাপত্যই আমার মন অধিকার করে নিলে—কেষ্টো নয়, বিষ্টু নয়, রাধা নয়, গোপী নয়, ঘাট নয়, টিলা নয়, পেঁড়া নয়, পেতল নয়। দুটো জ্বলজ্বলে ধারণা নিয়ে ফিরলাম। (১) ভারতীয় আর্ট রিলিজিয়াস নয়, অন্য আর্টের মতনই পেগান। কনিষ্ক-হুবিষ্ক রাজার মতনই দাঁড়ায়, প্রার্থীর মতন নয়, শ্রমণের মতন নয়, পূজারীর মতন নয়। মথুরার সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে, দেবী নয়। (২) ভারতবর্ষ গ্রহণ করতে কখনও ভয় পায়নি। হে ভগবান, আর যেন না পায়! ভারতবর্ষের আন্তরিক শক্তি তার পাকস্থলীতে, ঐ মথুরার চৌবেরই মতন। কেউ কেউ নাকি একসঙ্গে দশ সের খেয়ে হজম করতে পারে।

৩০-১১-৫৫

বিশ্রী লাগছে সারাদিন। এত নিয়ম-কানুন, এত বাঁধাবাঁধিতে ভালো ছেলে তৈরি হয় না। ছাত্রদের জন্য নিয়ম না নিয়মের জন্য ছাত্র? তলা যত ভুয়ো, ওপরে তত শাসন! এত অনুশাসন-প্রিয়তা দুটি দুর্বলতার লক্ষণ: স্বাধীনতাকে ভয়—যেজন্য ডিক্টেটার-শিপের প্রয়োজন, আর আত্মবিশ্বাসের অভাব। ল' যদি আস (ass) হয়, রুলসের মিউলস হতে জৈব নিয়মে কোনো বাধা নেই। সৃষ্টির অক্ষমতায় ও একগুঁয়ে আত্মপ্রসন্নতায় rules are mules। অথচ সাধারণে বলে কিনা ছাত্ররা উচ্ছন্ন গেল, আর অধ্যাপকরা

নিরাগ্রহ ! বিশ্ববিদ্যালয়ে—যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে—অধ্যাপনা করতে গেলে মাত্র নিয়ম-কানুনে ওয়াকিবহাল হলেই খাশা চলে, পড়াশুনোর দরকার হয় না, বরঞ্চ ক্ষতি হয় সব দিক থেকে।

ব্যাপারটা গুরুতর। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যুরোক্রেসী ঢুকে সর্বনাশ করছে। এই রকম আরো বেশি দিন চললে কেবল সরকারী ডিপার্টমেন্টই হয়ে যাবে। লক্ষ্ণৌ-এলাহাবাদ তাই হয়েছে। ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশনের হাতে অনেক ক্ষমতা এসে গেল।

৪-১২-৫৫

অমল হোম চিঠি লিখেছে 'মনে এলো' সম্বন্ধে। তার কাছে ব্রজেন শীল সম্বন্ধে একটি গল্প শুনলাম। প্রশান্তবাবু, রাধাকুমুদ, ও রাধাকমলবাবুরা আরো অনেক কাহিনী শোনাতে পারেন। কিন্তু তাঁরা পণ্ডিত ব্যক্তি, বই লিখতে ও কাজ করতে এত ব্যস্ত যে, তাদের সময় নেই। গল্প বলাটাকে হয়তো একটু ছোট ভাবেন। অমল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, ব্রজেনবাবুর বইখানির নাম 'New Essays in Criticism। তার একটা অধ্যায় হলো Neo-romantic movement in Literature, তার তৃতীয় সেক্সন—The Neo-romantic movement in Bengali Literature। লেখাটা প্রথম বের হয় Calcutta Review-এ (1890—91) :

কীটস-এর ওপর তাঁর লেখাটা ১৮৮৮ সালের—Hyperion সম্বন্ধে লেখাটা 'based on a paper written in 1882—83।'

অমলের স্মরণশক্তি খুব ভালো। রেফারেন্সগুলো সে আবার গুছিয়ে রাখে। আমার অভ্যাস ঠিক উল্টো। আমার জীবনে যাঁদের দেখেছি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন মানুষ (মেয়েমানুষ নয়) হলেন সি.ওয়াই. চিন্তামণি। ১৯১১ কি ১৩ সালে রাতে খাওয়া দাওয়ার পর অতুলপ্রসাদ (সেন) বললেন, 'সি. ওয়াই তোমার কিছু ট্রিক্স দেখাও।' সি. ওয়াই-এর এক গালভরা পান, মুখের কোণে সিগারেট, তার ধোঁয়ায় এক চোখ বন্ধ। শুরু হলো ট্রিক্স। Z অক্ষর যার আদিতে সেই সব নাট্যশালার নাম; তার পর পোপ-এদের নাম, সন তারিখ। গোকরণ মিশ্র বললেন: 'কে আর তোমার ভুল ধরতে যাচ্ছে। এখন বলো দেখি বোম্বাই হাই-কোর্টের চীফ জাস্টিসরা কে কবে চাকরি করেছেন?' চিন্তামণি গড় গড় করে বলে যেতে লাগলেন। বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব বাধা দিলেন, 'ও-সব চলবে না। আমি একটা সাল বলছি—কোন্ কোন স্বনামধন্য উকীল ঐ সালে জন্মেছিল?' 'কোন্ দেশের?' 'এই অঞ্চলের।' আবার গড় গড় করে নাম উচ্চারিত হলো। অতুলদা বললেন, 'এই সালের একটা মাসে আসা যাক' সালটা আমার মনে নেই। তারও তালিকা শুনলাম। 'এবার বলো ঠিক তারিখটা।' তারিখটাও আমার মনে নেই। চিন্তামণি দু'জনের নাম দিয়ে বললেন,

'And last but not least my friend on the right': অর্থাৎ অতুলপ্রসাদ। অতুলপ্রসাদ খুব হেসে উঠলেন, 'এইবার তোমাকে পাকড়েছি। আমার জন্ম তারিখটা ভুল বলছো।' চিন্তামণির কালো মুখ বেগুনে হয়ে উঠলো। সিগারেটটা কন্কের

নতন ধরে টান দিতে লাগলেন। প্রায় আধ মিনিট পরে চিন্তামণি বললেন,

'Go and ask your mother.'

অতুলপ্রসাদ উত্তর দিলেন, 'তার প্রয়োজন নেই।' কিন্তু তিন-চারদিন পরে অতুলদা এসে বললেন, 'ওহে ধূর্জটি লোকটাকে নিয়ে পারা গেল না। চিন্তামণির ডেট্‌টাই ঠিক।' পরে জানলাম, চিন্তামণি কোনো একটা কমিটির সভ্য হয়ে বছর কয়েক আগে কলকাতা যান। একদিন অতুলদা'র মা ছেলের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তাঁর বন্ধুদের খাওয়ান—তার মধ্যে ছিলেন চিন্তামণি। এই হলো সূত্র।

চিন্তামণির কিন্তু গোখলের জীবনী লেখা আর হলো না। যে বই লিখে গেলেন সেটা তাঁর যোগ্য নয়।

ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীমহাশয়ের স্মরণশক্তিও অপূর্ব। তবে তাঁর ধারণা যে, তাঁর সহপাঠীর মধ্যে তাঁরই ছিল কম, সব চেয়ে বেশি ছিল এক মাদ্রাজীর। বোধ হয় দ্রাবিড়ীদের স্মরণশক্তি উত্তর ভারতীয়ের চেয়ে সাধারণত বেশি। ঠিক বলা যায় না।

তবে আমার সমবয়স্কদের মধ্যে নির্মল সিদ্ধান্তের স্মরণশক্তির তুলনা নেই। এমন কি ডিকেন্স-এর প্রত্যেক চরিত্রের নাম ধাম ব্যবহার তার মনে থাকে। দশ বছর পূর্বের 'প্রস্তাব' সে মুখস্থ বলে যেতে পারে।

নির্মলের সঙ্গে তর্ক করতে গেলে প্রাণ হাতে রাখতে হয়। অমন প্রীসাইজ মন আর কারুর দেখিনি। এই দুর্দান্ত স্মৃতিশক্তি তার উপকারেও এসেছে, অপকারেও এসেছে সন্দেহ হয়।

শ্রীরাধাকৃষ্ণণেরও স্মরণশক্তি অনন্যসাধারণ তার বহু প্রমাণ আমি পেয়েছি। দশ বৎসর আগে তাঁর সঙ্গে কি কথাবার্তা

হয়েছিল তা তিনি উগরে দিতে পারেন। এখানকার অধ্যাপক হাজি হাসান সমগ্র শকুন্তলা একাই অভিনয় করতে পারেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ফোটোগ্রাফিক। ত্রিপুরারিও অনেকটা তাই।

জানি শ্রেণী বিভাগ করাটা ছেলেমানুষী। তবু আমার কাছে সব ভালো জিনিসেরই একটা গ্রেড আছে। প্রকাশ করি না, কিন্তু অমলের চিঠি পেয়ে প্রকাশ হয়ে গেল। সে আমাকে চিঠি লিখে ছেলেমানুষ করে দেয়। ১৯১১ সালে এক সিনেমায় তার সঙ্গে আলাপ হয়। 'আপনি কি করেন?' 'আজ্ঞে, আমি এফ. এ. ফেল করি।' সেই থেকে এক আবহাওয়ায় মানুষ আমরা। তার বন্ধু আমার বন্ধু, আমার বন্ধু তার বন্ধু।

বন্ধুত্বের ভেতর দিয়ে আজকাল পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; বৈঠকখানাই নেই তো আড্ডা জমবে কিসে? ছেলেরা কি বন্ধুদের আজকাল বাড়ির ভেতরে আনতে পারে? আনবে কোথায়! ছেলেরা চা-এর দোকানে আড্ডা দেবে না তো কোথায় যাবে? সিনেমা আর ফুটবল দেখে কতটুকুই বা আনন্দ হয়! ননী (নীরেন) বলে মা হলো খুঁটি। হাঁ, তাঁর মা খুঁটিই ছিলেন, তাঁর একার নয়; অমন মা হয় না!

হঠাৎ যেন মনে হচ্ছে বুড়ো হয়ে গেলাম। এত পুরানো কথা মনে আসছে! শরীরটা অতোটা অপটু হওয়া নির্বুদ্ধির লক্ষণ; এ-যেন ডায়েরী হয়ে গেল!

অসুখের সময় লোকে মাগো বলে কেন? আবার 'ওগো' বলতেও শুনেছি। মা ছেলেকে, স্ত্রী স্বামীকে একটু কাবু হয়েছে দেখতে চান, অসহায় হলে বড়ই ভালো লাগে তাঁদের, কব্জার মধ্যে এসে গেল! দুর্বলের ধর্ম! কিন্তু কে বলে মা তুমি অবলে!

৫-১২-৫৫

আজ ক্লাশে দু'ঘণ্টা ধরে প্ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্টের হার কিভাবে বাড়ানো যায় তার আলোচনা করলাম। ছাত্রেরা তর্কে যোগদান করছে দেখে হর্ষ হলো। কোনো টেক্‌নিক্যাল টার্ম ব্যবহার করিনি, তাই বোধ হয় সহজে বুঝলে। নিজেদের জীবন থেকেই যুক্তিটা খাড়া করেছিলাম। একটা ছাত্রেরও চোখ যদি জ্বল জ্বল করে তবে নিজেকে সার্থক ভাবি।

বাঙলা দেশে—নাঃ, বাঙলার কথা ভাববো না। হয়তো আমি ভুল বুঝি, নয়তো তাঁরা ভুল বোঝেন। তবে এটা ঠিক যে, বাঙলা দেশে এখনও অনেক চোখে আগুনের ফুল্কি পাওয়া যায়। বুদ্ধির তীব্রতা নিশ্চয়ই ; কিন্তু কল্পনার রঙ মেশানো। আমার শ্বশুর-মশাই প্রায় ষাট বৎসর বিদেশে থেকে বাঙলায় যখন ফিরলেন তখন বলেছিলেন, 'কি মিষ্টি হাওয়া, যেন মা'র কোলে ফিরলাম।' মুচকে হেসেছিলাম। এক বৎসরের মধ্যেই মারা গেলেন।

১৩-১২-৫৫

আজ কনভোকেশন হয়ে গেল। চমৎকার বন্দোবস্ত। এখানকার ছাত্ররা নিতান্ত শান্ত। একটা টুঁ শব্দ করে না। জন

পাঁচকে অনারারী ডক্টরেট দেওয়া হলো। ইয়াজদানীকে দেওয়াতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। ভারতের এক অজন্তা নয় বহু পুরাতন হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমানী কীর্তিকে তিনি ধ্বংস থেকে বাঁচিয়েছেন। অজন্তা সম্বন্ধে তাঁর বই ও ফোলিও অতুলনীয়। এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস লিখছেন। ইয়াজদানী সাহেব দেশের গৌরব। উত্তরাধিকারী হলেই হয় না, উত্তরাধিকারকে ইনভেস্ট করতে হয়। কাল সন্ধ্যায় তাঁর বক্তৃতা পড়া হলো। আমি ধন্যবাদ দিলাম। তাঁর বক্তৃতাটি ছাপানো হবে। স্লাইডগুলো চমৎকার। অনেকে এসেছিলেন, কিন্তু ছাত্ররা ভেঙে পড়েনি। এখানে ছোট রকমের মার্কসিস্ট দল একটা আছে—তাদের কাউকে বড় দেখলাম না।

ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে এদের ঔদাসীন্য দেখে ভীষণ অস্বস্তি হয়। যারা গোঁড়া মুসলমান তারা না হয় দেবদেবীর মূর্তি দেখতে চাইবে না --এটা বোঝা যায়, কিন্তু মার্কসিস্টরা তো ইতিহাসের কিছু ধার ধারে—অন্তত তাই বলে। কিন্তু তার প্রমাণ তো পাচ্ছি না। মনিয়রের সোশিওলজি অব কম্যুনিজম সম্বন্ধে একটা বই পড়েছিলাম। নামটা ঠিক মনে আসছে না। ভালো লাগেনি এইটুকু মনে আছে। তিনি কম্যুনিজমের সঙ্গে ইসলামের তুলনা করেছিলেন। (ম্যালরো ফরাসী বিপ্লবী Saint Just-এর মধ্যে ইসলামী ধরনের মিস্টীক পেয়েছেন।) একটা মিস্টীক থাকলেও কাজ চলতো। কিন্তু এখানে কিছুই যে নেই, অতএব সব নিষ্কর্মা। অথচ সত্যকারের বুদ্ধিমান লোক এখানে রয়েছেন, বিশেষত অল্পবয়স্ক শিক্ষকদের মধ্যে। তাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রচুর, কিন্তু তবুও আগ্রহ রেডিয়েট করছে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীতের একাধিক অংশকে ভুলতে হবে।

মনে এলো।

বোধ হয়, একটু অন্যায় করলাম। দেশের অন্যান্য যুবকদের মধ্যেই বা ক'জনের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উৎসাহ আছে? যারা বিদেশী ফার্মে চাকরি করছে তারা এক অদ্ভুত জীব! ভালো ছেলে হয়তো সব সময় নয়, কিন্তু ভালো ঘরের, প্রতিপত্তিসম্পন্ন বাড়ির ছেলে তো বটেই। কিন্তু টাকা আর টাকা, আর সাহেবিয়ানা। এক আধজনের মুখে গরম গরম কথাও শুনেছি; কিন্তু সব ভুয়ো। ভারতবাসী কিনা বোঝাই যায় না। দেশের সঙ্গে তাদের যোগ যৎসামান্য। এ এক আজব শ্রেণী তৈরি হচ্ছে। পুরানো আই. সি. এস. চাকুরেরাও এত শেকড়-ছেঁড়া ছিল না---তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিল, পড়াশুনো ভালোবাসতো, করতে সময় পেতো। এদের সময়ই নেই। দেশের অন্য অবস্থানে এদের প্রয়োজন হবে নিশ্চয় যখন প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজের বোলবোলাও থাকবে না এবং সরকারের হাতে প্রয়োজনীয় ইণ্ডাস্ট্রি সব এসে যাবে। কিন্তু ন্যাশনালাইজেশনটা যদি শেষ কথা না হয়, যদি তার পরে সোশিয়ালাইজেশন বলে কোনো অবস্থা থাকে, তখন ম্যানেজারের দলের প্রকৃতিও বদলাবে। তখন টেকনিশিয়ানরা শ্রমিকদল থেকেই উঠবে এবং তাদের মধ্যে বেশি কর্মিষ্ঠরাই ম্যানেজার হবে। এখন থেকেই তার বন্দোবস্ত হওয়া চাই। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রের রূপ বদলাচ্ছে --রাষ্ট্র সমাজের কাছে চলে আসছে, নতুন শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আসতে আরম্ভ করেছে। তারা কি এরা? আমার বিশ্বাস নয়। এইপ্রকার ম্যানেজারের দল পরিবর্তনের বাধা সৃষ্টি করবে সন্দেহ হয়। এরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিরাগ্রহ। এদের সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু উন্নতির একটা অবস্থায়। দেশ বদলাচ্ছে নিতান্ত দ্রুতভাবে।

সরকারী চাকরিতে যাঁরা ঢুকেছেন তাঁদের প্রথম প্রথম উৎসাহ

থাকে। কিন্তু দু'-এক বছরেই খতম হয়ে যায়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলাও তাই। আদর্শ আগ্রহ বজায় রাখা যে কী শক্ত যাঁরা ভুগেছেন তাঁরাই জানেন। যদি খোসামোদে উন্নতি হয় তবে কাজের দরকারই থাকে না। যদি জাত, আত্মীয়তা তার ওপর জোটে তো কথাই নেই। জেলার কর্তৃপক্ষদের প্রধান কাজ মন্ত্রিবর্গের সন্তুষ্টি সাধন, স্থানীয় এম. এল. এ. কি এম. পি'র মন বুঝে চলা। এবং তাঁদের মন সর্বদা নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ নয়। এ-ক্ষেত্রে আগ্রহ কর্পূরের মতন ক্ষণস্থায়ী। ছোকরা মাস্টারমশাইদের কথা তুলতে লজ্জা হয়। স্কুলের মাস্টারী ছেড়ে কলেজের চাপরাশীগিরি করতে দেখেছি; পি. এইচ. ডি. টাইপিস্ট হয়েছে তাও জানি। ৩০।৪০ টাকায় আদর্শ অক্ষুণ্ণ থাকে না। কলেজে সেক্রেটারী কিংবা ম্যানেজার, ম্যানেজিং বোর্ডের সভ্যের বাড়ি ধর্না দিলে যদি মাইনে বাড়ে তবে আগ্রহ নিতান্তই অবান্তর হয়ে পড়ে। যদি কর্তৃপক্ষ অ-ব্রাহ্মণ হন তবে ব্রাহ্মণ শিক্ষকের আশায় ঘুণ ধরলো; যদি বৈশ্য হন তবে বৈশ্য শিক্ষকদের পোয়া বারো—সঁইয়া কোতোয়াল হলে পায় কে!

তবু উৎসাহ, আগ্রহ, প্রেরণার অভাবে কেমন করে ভারতবর্ষ উঠবে জানি না। সকলের মুখেই শুনি বেশ ঘুম হয় রাত্রে। বুঝি না কেমন করে এত ঘুম আসে। রিসার্চ স্কলারদের জিজ্ঞাসা করি—কত রাত তোমার সমস্যা তোমাকে জাগিয়ে রেখেছে? তারা বেশ ঘুমোয়। এরাই মা'র অনুরোধে বিয়ে করে। ভূপেন দত্তমশাই একবার বলেছিলেন, 'আমাদের তিন পুরুষ বিবাহ করেনি—আর তিন পুরুষ না বিবাহ করাটাই দেশের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তিনি আঠারো বৎসর বিদেশে থেকে তখন ফিরেছেন এবং দেশের হালচাল ও একটি বিশেষ ঘটনা দেখে ঐ

সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বাঙলায় হয়তো সামান্য একটু ভুল ছিল, কিন্তু মর্মটি ছিল খাঁটি।

আদর্শ অটুট রাখবার জন্য একটা মিস্টীক হয়তো চাই। অন্তত এককালে তার প্রয়োজন ছিল। মিস্টীক-এর আশ্রয় ভবিষ্যৎ. বর্তমানে ডুবে থাকলে মিস্টীক ফ্যাশানে পরিণত হয়। সব ধর্মের সব বিপ্লবের একটা মিলেনিয়াল প্রফেটিক, ইয়ুটোপীয়ান দিক থাকে। তাতে নেশা হয়, নেশায় কাজও হয়। স্বদেশী যুগে ছিল বঙ্গমাতা-ভারতমাতা। মাতৃত্বের সঙ্গে মিস্টীক-এর একটা আন্তরিক যোগ আছে। মাতৃপূজা ভারতবর্ষে সর্বত্র পাওয়া যায়, তবে বাংলা দেশে বেশি। স্বদেশী যুগে বাঙলা দেশে যে নবজীবন এসেছিল তার এক প্রধান কারণ ঐ। গানে, ছবিতে, সাহিত্যে ও কর্মে এই মিস্টীক কার্যকরী হয়েছিল। বন্দেমাতরম ছিল মহামন্ত্র। গান্ধীজীর নিজের একটা মিস্টীক ছিল, দেশ সেটাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করেছিল। পুরোপুরি গৃহীত যে হয়নি তার প্রমাণ অনেক। ভারতমাতা কিংবা দেশপিতা তৈরি হয়নি, তাই আজ ভাষাগত প্রদেশ গঠন নিয়ে এত ভয়। ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ন্যাশনালিজমও কিছু এসেছিল, তাই মিস্টীক ঠিক জমেনি। পরে এলো মার্কসিজমের মিস্টীক। কার্ল পপার-এর বিপক্ষে যত যুক্তিই দিন না, মার্কসিস্ট মিস্টীক-এর আশীর্বাদে জনকয়েক ভালো ছেলে মেয়ে গড়ে ওঠে। এটাও নানা কারণে জমলো না। এখন আসছে টেকনিকের মিস্টীক। সব তাতেই কাজ হয়েছে। তাই বলে মিস্টীকের বিপদ সম্বন্ধে অজ্ঞান হলে চলবে না। এর চারধারে একটা ঘোলাটে আলো থাকে যেটা বুদ্ধির আলোকে ব্যাহত করে। অবশ্য বিজ্ঞানেরও অনেক সময় তাই অবস্থা, কিন্তু কোনো না কোনো সময় বুদ্ধির আলোতে সেটা দূর হয়। মিস্টীক সম্বন্ধে

আমার নিজের দুটি আপত্তি : (১) এতে মানুষ পরিণত হতে পারে না। মানুষ নাবালকই থেকে যায়। যৌবন পূজা এর প্রধান আচার, যেমন হিটলারের সময়, আগে থেকেই হয়েছিল। (২) এতে নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি পায়। নিষ্ঠুরতার একটি অঙ্গ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হানি। তার চেয়ে সর্বনেশে ব্যাপার নিষ্ঠুরতার আব-হাওয়া। মিস্টীক-এর অজুহাতে যুদ্ধ খুনখারাপি, মারপিঠ, জেল, অত্যাচার সব কিছুই কিছু না, সাধারণ দৈনিক ঘটনা। যেখানে মিস্টীক সেখানেই এই দেখেছি। লোকে ধর্মের দোষ দেয়—কিন্তু দোষ মিস্টীক-এর। প্রমাণ এনার্কিজম, কাঁচা কম্যুনিজম, ইসলাম-প্রসারের কোনো কোনো অধ্যায় এবং বাঙলাদেশের সন্ত্রাসবাদ, যার বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঘরে বাইরে ও চার অধ্যায়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতার তরফ থেকে আপত্তি জানিয়েছেন। এই সব নানা কারণে আগত-প্রায় টেকনিকের মিস্টীক সম্বন্ধে আমি ভীত। এর বাহন হলো utility আর efficiency—সর্বনেশে জিনিষ।

তবু মিস্টীক চাই, প্যাশান চাই এখন এদেশে। উন্নতি এখনই চাই, সকলের জন্য চাই, এই 'সেন্স অব আর্জেন্সি' জন-সাধারণের মধ্যে ওতপ্রোত না হলে যা ছিলাম তাই থাকবো। অন্য ধারে মিস্টীক-এর সর্বনাশ সাধনের অসীম ক্ষমতা। তাকে কিভাবে সংযত করা যায় এই হলো প্রশ্ন। তার সম্পূর্ণ উত্তর জানি না তবে সমাজের ইতিহাসে আংশিক উত্তর মেলে। প্রতি সভ্যতার একাধিক শ্রেণী 'এলিট গ্রুপ' থাকে যার কাজ একটা মিস্টীক সৃষ্টি করা, তাকে রক্ষা করা, তার প্রভাব বাড়ানো, কমানো। ঠিক কিভাবে সৃষ্টি করে তা সহজে বোঝা যায় না—আর্চটাইপ থেকে উদ্ভূত হয় কেউ কেউ বলেন। কিন্তু ঠিক কিভাবে হয় এখনও জানা যায়নি। তবে একবার তৈরি হলে তার রক্ষণাবেক্ষণের

প্রক্রিয়া খানিকটা প্রকট হয়। ম্যাক্স হেব্বার, ম্যানহাইম প্রভৃতি অনেকে এই প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের ব্রাহ্মণ ও চীনেদের ম্যাণ্ডারিন শ্রেণীর প্রভাব কিভাবে ছড়িয়েছিল ও কমেছিল আমরা খানিকটা জানি। তাই থেকে আমরা কিছু শিখতে পারি। আমি ব্রাহ্মণ সমাজের পুনরুত্থান চাইছি না। সেটা ঐতিহাসিক হিসেবে অসম্ভব। মার্কসিস্ট যাকে 'ক্লাশ' বলেন সেই ধরনের কোনো পৃথক শ্রেণীর উদ্ভবও চাইলেই সম্ভব হয় না। অনেকের ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ এই নতুন ব্রাহ্মণ-ম্যাণ্ডারিন, নতুন এলিটগ্রুপ।

বিশ্বাস করতে ভালো লাগে, কিন্তু পারি কৈ? সাফ কথা এই, আমরা নতুন মিস্টীক তৈরি করতে পারিনি। যা কিছু নিয়ে চাকরিতে প্রবেশ করেছিলাম সেটা হয় বিদেশী, না হয় অত্যন্ত দুর্বল, ফিকে। তাও আমরা রাখতে পারলাম না। বুদ্ধির সততা? চরিত্রের দৃঢ়তা? ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ? বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি? আদর্শনিষ্ঠা? এর একটাও মিস্টীক নয়। জোর 'আইডীয়াল' টাইপের 'আইডীয়াল' ব্যবহার! হিন্দুত্ব? ভারতের স্বর্ণযুগ? রামরাজ্য? অখণ্ড ভারত? এর কোনটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গের প্রাণের বস্তু? যে-পরিমাণে আমরা 'বৈজ্ঞানিক' সেই পরিমাণে হিন্দুত্ব প্রভৃতি ভাব আমাদের প্রাণ থেকে বহিষ্কৃত। অতএব অন্যে, অন্য মহাপুরুষ, কিংবা অন্য শ্রেণী, যদি মিস্টীক তৈরি করে দেয় তবে জোর আমরা সেটা রক্ষা করতে পারি। অবতার নিজের খেয়ালে আসেন, যান, তাই অন্য শ্রেণীর সৃজনীশক্তির ওপর বিশ্বাস রাখতে হয়। কেবল তাই নয়, এই যুক্তি অনুসারে সেই শ্রেণী থেকে যে এলিট গ্রুপ তৈরি হবে তারাই মিস্টীক-এর সর্বনাশ সাধনের শক্তিকে সংযত করতে পারবে মনে হয়। এটা

অবশ্য আশা : এবং অন্য আশার চেয়ে সম্ভবতর আশা এই মাত্র।

তর্ক উঠবে, যে শ্রেণী মিস্টাক থেকে উঠলো,—এখানে উদ্ভাবনই সৃষ্টি—সে মিস্টীককে সেই শ্রেণী কেমন করে সামলাবে? উত্তর রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন রাশিয়া থেকে লেখা একখানা চিঠিতে। তিনি যা আশা করেছিলেন সেখানে এখন তাই হচ্ছে। লোকে যাকে সেখানকার শ্রেণী-বিভাগ, বুরোক্রেসী বলে তার আদত কথা হলো এই : যারা স্রষ্টা তাদেরই একাংশের পরিণত স্তর সৃষ্টির অস্থুরের ধ্বংসবীজকে নষ্ট করতে সমর্থ। তাদেরই একাংশ—অন্যের ভিন্ন-স্তরের অধিকাংশ নয়।

২৪-১১-৫৫

ট্রেনে সহযাত্রীর বদভ্যাসগুলো অতি সহজেই ধরা পড়ে। জাতীয় চরিত্র বলে কোনো বস্তু নেই : কিন্তু জাতীয় আচার-ব্যবহার, অভ্যাস-অনভ্যাস-বদভ্যাস আছে এবং সেগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাঁরা তথাকথিত সভ্য, যাঁরা প্রথম শ্রেণীতে, ঠাণ্ডা গাড়িতে, এমন কি হাওয়া জাহাজে সফর করেন তাঁদেরও 'সভ্যতা' নিমেষে খসে পড়ে। ইতার্সি স্টেশনে বেলা সাড়ে সাতটার সময়ও বার্থ থেকে উঠতে অনিচ্ছা জানাতে

ঢোলপুরের একজন সামন্ত আমাকে বলেছিলেন 'আপনি নিশ্চয়ই বাঙালী।' সকাল আটটা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকবার অধিকার আছে জানিয়েছিলাম। আর্চার (ইবসেনের আর্চার) একবার পাঞ্জাব মেলে কলকাতায় আসছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে এক ভীষণ তর্ক শুনলেন। এক স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে, খবরের কাগজওয়ালা কি একটা ব্যাপার নিয়ে এক বাঙালী সহযাত্রীর সঙ্গে তর্ক বাধিয়েছে। আর্চার ইংরেজ সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কোথায়?' 'বর্ধমানে।' 'সেটা কোথায়?' 'বাংলায়।' 'That's why'- গল্পটি আমি প্রমথ চৌধুরীমহাশয়ের কাছে শুনেছিলাম। এই রকম বহু দৃষ্টান্ত দিতে পারি। ট্রেনে চড়তে হয়তো উত্তর প্রদেশের, বিশেষত লক্ষ্ণৌ-এর কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কাশ্মিরী ও নবাবদের সঙ্গে চড়াই উৎকৃষ্ট। আমার আন্তরিক বিশ্বাস অমন ট্রেনের ভদ্রতা অন্য কোনো প্রদেশবাসীর অভ্যাসে নেই। আমি যাদের সম্বন্ধে লিখতে যাচ্ছিলাম তাঁদের নাম উল্লেখ করতে পারলাম না। নিজেদেরই নিন্দা করা ভালো, যদি নিন্দা করতেই হয়। পয়সাতে সব কিছুই আসে, ট্রেনের ভদ্রতা আসে না। (হাওয়া জাহাজের জানলার পাশে বসবার জন্য মিংক—সেবল কোটপরা মহিলাদেরও ছুটতে দেখেছি, অসভ্যতা করতে দেখেছি। মনে হয় যেন মাটি ছাড়লেই অভদ্রতা এসে জোটে; আর গতিতে সেটা বাড়ে। জেট প্লেনের কালে ভদ্রতা একেবারেই লোপ পাবে।) নতুন জগতের কাল নিতান্ত অ-সামাজিক, নিতান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীময়। ভদ্রতা রক্ষার জন্য গোরুর গাড়ি, পাল্কি, নৌকো—জোর জুড়িগাড়ি, জাহাজই ভালো, তা লোকে একে ফিউডালই বলুক আর যাই বলুক। অবশ্য উটের গাড়ি নয়, যেটা রোজ সকালে সন্ধ্যায় আলিগড়ের রাস্তায় দেখি। ওটা ট্রাইবাল—

সভ্যতার পূর্বাবস্থার, কৃষিকর্মের, ক্ষেত-খামারির আগের অবস্থ
মরুভূমির ব্যবস্থা। একদম অচল !

১৫-১১-৫৫

ট্রেনে মির্সিয়া এলিয়েড (Mircea Eliade)-এর The Myth of the Eternal Return নামে ফরাসী বইখানি ইংরেজী অনুবাদ পড়লাম। বইখানির বিলেতে সুখ্যাতি হয়েছে ভদ্রলোক রুমানীয়ান, এখন ফ্রান্সে থাকেন। কলকাত বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি পড়েছিলেন।

তাঁর মতে ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণার ক্রমবিবর্তনে তিনটি পর্যায় আছে। (১) ঐতিহ্যবদ্ধ সমাজে ইতিহাসের অর্থ আর্চটাইপাল কর্মগুলির স্থিতি ও অনবচ্ছিন্নতা। অর্থাৎ মানুষ তখন প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টির ভাগী। এই অংশটা পড়তে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে এলো। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ গায়ত্রী মন্ত্র ভালোবাসতেন এবং সর্বদাই এমন ঘরে শুতে চাইতেন যার পূর্ব দিক খুব খোলা। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'সৃষ্টির আদিম ক্ষণে উপস্থিত ছিলাম না, সেই অনুপস্থিতির ক্ষতিপূরণ করি প্রতিদিনের সৃষ্টির অংশীদার হয়ে।' তিনি প্রায়ই বলতেন যে, সূর্য তাঁর ভাগ্যদেবতা, রবি থেকেই রবীন্দ্র। তবে কি সূর্যই তাঁর আর্চটাইপ ছিল ? সেই-

জন্মই কি তিনি বৈশাখের, আলোর ভক্ত ছিলেন? জানিনা। সেই কারণেই কি তাঁর সৃজনীশক্তি অতো অফুরন্ত ছিল? প্রতিদিন যেন তাঁর ভাণ্ডার ভরে উঠতো। কিন্তু এই ধরনের ব্যাখ্যার মধ্যে যতটা মোহ আছে ততটা যুক্তি নেই। এ সেই ইয়ুং-এর কালেক্টিভ অন-কনসাস আর আর্চটাইপ! শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় আর্চটাইপের যে তালিকা দিয়েছেন তার একটাও কোনো দিন মনের কোনো স্তরে খুঁজে পেলাম না—অথচ ব্রাহ্মণ সন্তান!

(২) দ্বিতীয় পর্যায় হলো সভ্য সমাজের। এর মধ্যে একটি ধারা হলো চক্রবৎ আবর্তনের। চাকার মতন কাল ঘুরছে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগের মধ্য দিয়ে। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, এড্ডা (Edda), প্লেটনিক ধারণা এই ধরনের। (বৌদ্ধ ধারণা এক প্রকার ছিল না : ব্রাহ্মণরা পুরুষকারে বিশ্বাসী ছিলেন, কালাতীত হতে চাইতেন : বেদান্ত তো মিথ্যা বলেই উড়িয়ে দিলেন।) অন্য ধারা হলো চাকার পরিবর্তে লাইনের। অর্থাৎ ট্রেনে চড় আর সামনে এগিয়ে চলবে। এই ধারণার ভিত্তি হলো উন্নতি—প্রোগ্রেস, পরিণতি, মিলেনীয়াম। দৃষ্টান্ত—হিব্রু ও খৃস্টান ধর্ম। তার মধ্যে পাপ বোধ এসে ঢুকলো। অর্থাৎ ইতিহাস আরম্ভ হলো স্বর্গ থেকে বিদায় হতে, আর শেষ হবে শেষ দিনে, ভেঁপু বাজলে। তাই ইতিহাসের কাজ হলো রিডেম্পশন ও যীশুতে বিশ্বাস। এই মতের অনেক সুবিধা এবং সে সুবিধা পশ্চিম প্রাণপণে ভোগ করছেন, অন্তত এতদিন করে এসেছেন।

"A straight line traces the course of humanity from the initial fall to final redemption. And the meaning of this history is unique, because the Incarnation is a unique fact."

হেগেল-মার্ক্স-এর পথ ডায়েলেক্টিকাল। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যে, এঁদের মতবাদে ধর্মের ছাপ রয়েছে—সেই স্বর্ণযুগ—কেবল সেটা পিছনে নয়, সামনে, সেই রিডেম্পশন—কেবল যীশুতে বিশ্বাসের সাহায্যে নয়, আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে। Universal Spirit-এর প্রকাশ ঐতিহাসিক ঘটনায়—এই ফরমূলায় হেগেল পেলেন ছুটি, আর ছুটি দিলেন এই জগতের জনমানবের দুঃখ-কষ্টকে। কিন্তু মার্ক্স এই ধরনের ফাঁকি দিতে পারলেন না। The Terror of History-র হাত থেকে মার্কসিস্ট পরিত্রাণ পেলেন বর্তমান জগতের Historical Evil-কে (ক্যাপিটালিস্ট-ইম্পীরিয়ালিস্ট সিস্টেমকে) ইতিহাসের মাত্র একটি পর্যায় ভেবে—যে পর্যায়ে উন্নতি হয়েছে, যার অন্তরেই ধ্বংসের বীজ রয়েছে, যার অবসান হবেই হবে এবং যার দ্রুত অবসানের সাহায্য করা নতুন মানুষের, তথা নতুন শ্রেণীর একান্ত কর্তব্য। অর্থাৎ ব্যাপারটা necessary ও temporary Evil।

আধুনিক মানুষের পক্ষে ঐতিহ্যবদ্ধ সমাজের প্রত্যয় গ্রহণ এক প্রকার অসম্ভব। দু'-চারজন যে পারবেন না তা বলছি না। আর্চটাইপ উবে গিয়েছে, এবং বিশ্বাস? একমাত্র বিশ্বাস আত্ম-শক্তিতে ও বিজ্ঞানে। প্রতি ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা ইতিহাসের ওপারে আছে এ-কথা বিজ্ঞান আমাদের মানতে দেবে? দেবে না কিছুতেই। তখন এই Terror of History-র হাত থেকে বাঁচবো কিসে? যখন ভূত থেকে কখনও কখনও ভগবান হন তখন হয়তো আশা আছে। কিন্তু সে ভগবান কি প্রেমের ভগবান?

মহাবিপদ অথচ বইখানি পড়বার সময় বিস্তর কথা মনে আসছিল—এখন ভুলে গেলাম। মনে এলোর বাইরে বহু মনে পড়লো-না থাকে—সে-বহু আপাতত লুপ্ত হয়। পরে কখনও

ভুড়ভুড় করে উঠবে। যতটুকু মনে আসে ততটুকুও লিখতে পারি না। এবং সব কথাই বিশদভাবে গুছিয়ে লিখতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আমার এই ধরনের লেখায় নেই।

১৬-১২-৫৫

অলডাস হাক্সলের The Genius and The Goddess ভালো লাগলো, অথচ ভালো লাগলো না। মার্টেন্স আইনস্টাইনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। নিশ্চয়ই আমার ভুল। কেটি-মার্টেন্স-এর স্ত্রী সেই জ্যাকণ্ডার হাসির নায়িকা। রিভার্স, যিনি গল্প বলছেন, তাঁর মতামত অনেকটা হাক্সলের নিজের সন্দেহ হয়। রুথ মার্টেন্স-এর কিশোরী মেয়ে রিভার্সের-এর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, কাচা কবিতা লিখছে। কাম ও দর্শনের মিশ্রণ মুখরোচক নিশ্চয়—ভাষা চমৎকার, মন্তব্য চমকপ্রদ, তবু মন-প্রাণ দুই-ই অতৃপ্ত থেকে গেল। অলডাস হাক্সলে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসেন না সন্দেহ হয়। দরদী না হলে অবজেক্টিভ হওয়া যায় না। ভদ্রলোকের রাগ আছে, অনুরাগ নেই বলবো না, কপটতা, ভান, মিথ্যাচরণকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেললে সততার ওপর যতটা অনুরাগ প্রমাণিত হয় ততটা। বিদ্রূপাত্মক রচনার বিপদ ঐখানে। শেষে বিদ্রূপের প্রধান যন্ত্র ক্ষুরধার বুদ্ধিকে ত্যাগ করতেই হয় নচেৎ ঐ আধ-কাঁচা আধ-পাকা নভেল লেখাই সার। হাক্সলের 'মেচিওরিটি'

এখনও আসেনি। খাসা লেখা, চোখাচোখা মন্তব্য, চন-মন করে ওঠে মনটা—বাস, ঐ পর্যন্ত। ভদ্রলোকের বয়স ৬১।৬২, কিন্তু এখনও কামমুক্ত নন। এঁর দ্বারা সাধন-ভজনের মুক্তি অসম্ভব। কে মুক্ত হলো বা না হলো তাতে অবশ্য আসে যায় না। কিন্তু নভেলিস্ট হিসেবেই তাঁর কাছে প্রত্যাশা—সেটা ভঙ্গ হলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। এবং আমি অন্তত ভাবছিলাম যে, নতুন সংযমের ফলে তাঁর আর্টের পরিণতি হবে। তা এখনও হয়নি একটু ঘন হয়েছে নিশ্চয়, তবে সেটা ছোট আকারের জন্য না কি আর কিসের জন্য বুঝতে পারলাম না। বইটি নভেলেট্ হলেও ছোট গল্পের মতন তীক্ষ্ণ।

১৭-১১-৫৫

কুমারের ধারণা যে, 'মনে এলো'র কিছু কিছু অংশ অস্পষ্ট ও খাপছাড়া হচ্ছে।* যুক্তি দিয়ে ও ভদ্রভাবেই তার বক্তব্য বললে ছেলের কাছে সমালোচনা শোনার মধ্যে একটা গৌরববোধ আছে। তার মত এই : যে কালে 'মনে এলো' প্রকাশিত হচ্ছে তখন প্রকাশ এক্সপ্রেশনের ধর্ম রীতিনীতি মেনে চলতেই হবে—অর্থাৎ যুক্তির ফাঁক থাকলে এমন কি মূল্যবান মন্তব্য ও বক্তব্যও অসার্থক হবে অবশ্য সব রচনার ধর্ম এক নয় এবং আমার চিন্তা লাফিয়ে চলে, পাঠক ও শ্রোতার জ্ঞান আমি ধরে নিই অনেকখানি, তবু যখন

রচনা ও সেটা যখন প্রকাশিত হচ্ছে, যখন সকলে পড়ুক, বুঝুক চাইছি তখন আমার আরো বিশদ করে লেখা উচিত।

আমি এই ধরনের উত্তর দিলাম। একজনের কাছে যেটা শক্ত অন্যের কাছে সেটা সহজবোধ্য। পাঠক সম্প্রদায় বলে এমন কোনো হোমোজীনাস পদার্থ নেই যার মানসিক আগ্রহ একই ধরনের সমানভাবে তীব্র। বোঝবার ক্ষমতা ভদ্রতার খাতিরে সমপর্যায়ের মেনে নিচ্ছি। একজন সাইকলজীর ফীল্ড থিওরী জানেন, কিন্তু ইকনমিক্স-এর নতুন কথা জানেন না, তেমনই উল্টোটা। আবার কেউ বা সাইকলজী, অর্থনীতি, ইতিহাসের নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত, অথচ, ছবি, গান সম্বন্ধে উদাসীন। আমি একত্রে সকলের সন্তোষবিধান কিভাবে করবো? যদি সব ভালো জিনিসেই আমার আগ্রহ থাকে, তবে পাঠকের সন্তোষ-বিধানের জন্য কি নিজেকে সঙ্কীর্ণ করবো? দ্বিতীয় উত্তর: আমি প্রবন্ধ লিখছি না, একটা বিষয় ধরে গোড়া থেকে শেষ কথা লিখছি না, জার্নালও লিখছি না, রোজনামচাও লিখছি না। অবশ্য ডায়েরীর মতন খানিকটা নিশ্চয়—তাও একটু অন্য ধরনের। এমিএল কিংবা মার্সেল-এর জার্নালগুলিতে তাদের দার্শনিক মতামতের অভিব্যক্তি বেশ খোলাখুলি; কিন্তু জীদ-এর ডায়েরীতে যে মতামত আছে সেটাকে খুঁজে বার করতে হয়। জীদ-এর ভাষা অবশ্য সহজ, কিন্তু তবু অত পাদটীকা কেন? এই ধরনের ডায়েরীতে বস্তুর জিনিষ ধরে নিতে হয়, প্রিজিউম করতে হয়। ডা ভিঞ্চির নোট-বুক বোধগম্য? আমি ফর্মের কথা বলছি, ওঁদের সঙ্গে নিজের তুলনা করছি না। ব্যাপারটা আসলে এই: নানা চিন্তা, নানা মনোভাব, নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, নানা ভয়-ভাবনার টানাপোড়েনে ব্যক্তিত্বের নক্সা; সেই ব্যক্তিত্বের নক্সা নিতান্তই বিশেষ; অন্য

কারণে নয়, মাত্র পারমুটেশন-কম্বিনেশনের জন্য। একটি নক্সা অন্য নক্সার জুড়ি কখনই হতে পারে না। এই নক্সাই হলো 'স্টাইল' : Style is the man। এখানে ব্যক্তিত্বের ছক্-ছাঁদটাই হলো আগ্রহের বস্তু। সেটার প্রতি আগ্রহ না থাকলে যত বিশদ-ভাবেই লিখি না কেন কিছুতেই কিছুই হবে না। সহজ হবে কিন্তু আর কিছু নয়। সবই যে উর্ণনাভের জালের মতন জ্যামিতিক হবে, ঝক-ঝক করবে, এমন বাধ্যবাধকতা প্রকৃতির নিয়মে নেই। মৌমাছির বাসাও জ্যামিতিক, কিন্তু পাখীর বাসা? কেবল দাঁড়কাক, শকুনির বাসা না হলেই হলো। এই প্রকার ইয়ুক্লীডিয়ান মনোভাবের দৌরাত্ম্য কোনো গতিশীল মন স্বীকার করে আর নেবে না।

এত কথার পর তবু আমার যুক্তিতে ফাঁক থেকে গেল। প্রবন্ধে বক্তৃতাতে, কথাবার্তায় আমার মন লাফিয়ে চলে। সকলেরই বোধ হয় তাই। আর্টের কাজ, রচনাশৈলীর অর্থ ফাঁক ভরানো, খাজ করা। এই কি একমাত্র কাজ, একমাত্র অর্থ? তা বোধ হয় নয়। নচেৎ 'মনে এলো' সম্পর্কে এত চিঠি পেলাম কেন? বিমলা, সাগর প্রভৃতি বিচক্ষণ সাহিত্য-রসিকরাও বলছেন লোকের মনে ধরেছে। সব পাঠকের মন সব বিষয়ে নয় অবশ্য। কিন্তু কাটা-কাটি হয়ে দাঁড়ায় একটা।

১৯-১২-৫৫

তিনটি চিত্রপ্রদর্শনী দেখলাম। বহুদিন কলকাতার চিত্রপ্রদর্শনী

দেখিনি, তাই খুব উৎসুক হয়েছিলাম। প্রথমেই ঝগড়ার গল্প শুনলাম: মন গেল খিঁচড়ে। আমরা দলাদলি না করে পারি না। তবু ঝগড়ার পরও একটা কিন্তু থেকে যায়, থিতোয়। ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির প্রদর্শনীর স্মৃতি ভেসে উঠলো। সে-চাঞ্চল্য এলো না—তবু নবীন শিল্পীর দল সে-যুগের শিল্পীদের মতনই মুক্ত হতে চাইছেন। তাঁরা চেয়েছিলেন নিরাগ্রহতার, অজ্ঞানতার কবল থেকে মুক্ত হতে, মুক্তি দিতে। এঁরা চাইছেন তাঁদের হাত থেকে মুক্তি পেতে। প্রমাণ বিষয় নির্বাচনে ও রঙ-এর বাহারে। জল-ধোয়া থেকে এঁরা তেলের ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়েছেন, চিত্রের চিত্র-সুলভ, অর্থাৎ চিত্রের প্রচলিত বিষয়ের গণ্ডি এঁরা কাটতে চাইছেন। এ সঙ্কল্প জীবনের চিহ্ন। তার পরও কিছু আছে। সেটা কতটা সফল হয়েছে ধরতে পারলাম না। যেখানে ভারতীয় বিষয় ও আঙ্গিক থেকে পৃথক সেখানে বিদেশী আঙ্গিকের ছায়া পড়েছে। আর্টে দেশ-বিদেশ নেই কখন? যখন দেশ-বিদেশের ঐতিহ্য, পরম্পরা ধুয়ে পুঁছে গিয়েছে। অন্যান্য আর্টের মধ্যে চিত্রেই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যায় দেখেছি। সাহিত্যে একটু দেরিতে, কারণ ভাষা নিজের ধর্ম ছাড়তে চায় না। স্থাপত্যে—গৃহ-স্থাপত্যে আবহাওয়ার জন্যে ঐতিহ্য বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকে। সঙ্গীতের পরিবর্তনে দীর্ঘকাল লাগে। পশ্চিমী সঙ্গীতের রঙ আমাদের সঙ্গীতে কতটুকুই বা লেগেছে! তাই দু'-তিনশ' বছরের পরও আর্টে দেশ-বিদেশ রয়েছে মানতে হয়। বরং সেটা যদি মানি তবে প্রদর্শনীর চিত্রে নবজীবনের লক্ষণ লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে, হলো কী? অথচ এও জানি, ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির ধারা কখনও জোরে বয়নি, অজন্তার পর থেকে সে ধারায় মন্দা পড়েছে এবং চেষ্টা করলেও তাকে জীবন্ত

করা যাবে না। তা যদি না যায় তবে চিত্রে দেশ-বিদেশ এক হয়েই যাক। তখন ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর সার্থকতাকেই কিন্তু প্রাধান্য দিতে হবে। আর যদি জীবন্ত করা সম্ভব হয় তখন প্রথামত পারম্পরিক আঙ্গিককে ধুত্তোর বলে ফেলে দিলে চলবে না। এই সব নানা কথা মনে উঠলো এইজন্য যে, কোনো প্রদর্শনীতেই একটা কোনো সূত্র কি দৃষ্টিভঙ্গী খুঁজে পেলাম না। ব্যক্তিগত চিত্রকর সম্বন্ধে ভালোমন্দের বিচার সম্ভব। মনে মনে বিচার যে করিনি তা নয়। আমি প্রদর্শনীর সার্থকতা ও উৎকর্ষ সম্বন্ধেই বেশি ভাবছিলাম। কুমারস্বামী ও ম্যালরো প্রদর্শনীর বিপক্ষে যে সব আপত্তি তুলেছিলেন তার মধ্যে অনেকগুলিই অখণ্ডনীয়।

তবু এ-দেশে এই সময়, যখন চিত্র সম্বন্ধে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহের মতন কোনো সার্বজনীন আগ্রহ জন্মায়নি তখন ঐ আগ্রহ প্রসারের জন্য প্রদর্শনী চাই-ই চাই। তার পরও অন্য কথা ওঠে। ছবির বিক্রি তো বেশি দেখলাম না। আর, বিক্রি বেশি না হলে চিত্রকররা বাঁচবে কি করে? আধুনিক ঢঙ-এর চিত্রের না হয় একটা snob-value আছে যার মূল্য স্নব-রা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু অন্য সাদা-মাটা ছবির খরিদ্দার সাদা-মাটা লোক—তাদের প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত। সরকার মানুষ কিনতে তৎপর, ছবি কিনতে নারাজ। ও নিয়ে হা-হুতোশ করে কোনো ফল নেই। সরকারী আর্টে আর্টিস্ট-এর স্বাধীনতা খর্ব হয় এই ধরনের বড় বড় বিদেশী মতামত কপচিয়েও লাভ নেই। ঐ ধরনের সমস্যা এখনও এদেশে মাথা চাড়া দেয়নি। এখনকার সমস্যা বিক্রি বাজারের। ছবির দাম কমাতেই হবে। আমি জানি, এই প্রস্তাবে চিত্রকররা ক্ষুব্ধ হবেন—এবং তাঁদের ক্ষোভ নিতান্তই যথার্থ। আমি জানি, যাঁদের পয়সা আছে তাঁরা কিভাবে খরচ করেন, ছবি কিনতেই তাঁদের

মত আপত্তি। আমি জানি, একটা মনের মতন ছবি আঁকতে চিত্রকরের কত সময় লাগে, যে-সময়ের মধ্যে তাঁকে স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণ করতে হয়। আমি এও জানি যে, ছবির দাম রুচির ওপর নির্ভর করতো এককালে। এককালে, কিন্তু এ-কালে নয়। এ-কালে ছবির বাজার আছে যেখানে দর-দস্তুর হয় অন্য সামগ্রীর বাজারের মতন। লণ্ডন-প্যারিস-নিউইয়র্ক-এমারস্টারডামে ছবির ব্যবসাদার আছে, চিত্রকরের গীল্ড আছে। অর্থশাস্ত্রে ধরা পড়েছে যে, ধনিকতন্ত্রে শ্রমিকের শ্রমের দান নিয়ে কোনো প্রাইস থিওরী সম্ভব নয়, কলেক্টিভ বারগেনিং—দুই শ্রেণীর সমবেত শক্তির কস্তাকস্তির ওপরই নির্ভর করে। এই সমবেত শক্তি চিত্রকরদের গড়ে তুলতেই হবে। অনেক চিত্রকর বলবেন, 'হঁা, আমরা কী মুটে মজুর নাকি যে, ইয়ুনিয়ন করবো। আমরা দেবতার সন্তান—আমাদের জাতই আলাদা।' বিস্তর লোকে—বিশেষত পলিটিশিয়ানরা —সমর্থনও করবেন। তাঁরা ধুয়ো তুলবেন, 'আর্টের সর্বনাশ হলো, আর্টিস্টদের মধ্যে আবার শ্রমিক আন্দোলন কেন!' ঠিক এই ধরনের মন্তব্য সাংবাদিকদের সম্বন্ধে শোনা গিয়েছে—ভাগ্যি কোনো ফল হয়নি! নতুন আইনে কর্মী-সাংবাদিকদের নিজেদের তাগিদে তাঁরা শ্রমিক বলে পরিগণিত হয়েছেন। অধ্যাপকদের মধ্যে ইয়ুনিয়ন গঠনের প্রয়াস চলছে। পাছে সেটা সফল হয় এই ভয়ে অনেক পলিটিশিয়ানরা বলছেন, 'শিক্ষক হলেন মিশনারী—কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সব আবার কি!' যেন মিশনারীরা হাওয়া খেয়ে ধর্মপ্রচার করে, যেন তাদের সঙ্ঘ নেই। যেন অধ্যাপকদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধ এম্পলয়ার—এম্পলীই-এর সম্বন্ধ নয়। যেন চাকরির শর্ত নেই, যেন চাকরি যায় না! ব্যাঙ্কের কেরানীও আগে ভাবতেন যে, তাঁরা পৃথক ভদ্রশ্রেণী। সে-ধারণা ঘুচেছে তাঁদের।

তবেই তাঁদের চাহিদার কিছু অংশ মিটেছে। আমার বক্তব্য এই যে, চিত্রকররাও শ্রমিক—ওয়ার্কার্স। ইন্টেলেকচুয়াল ক্লাশ বলে পৃথক কোনো জন্তু নেই। পণ্ডিতজী বলেন, We are all condemned to hard labour—কথাটা খানিকটা সত্য। বাকি সত্যটা এই We are all workers। তাই যদি হয় তবে আর্টিস্টরা সঙ্ঘ, গীল্ড, ইয়ুনিয়ান তৈরি না করে কিভাবে এই ধনিকতন্ত্রের যুগে বায়ারস মার্কেটকে সেলার্স মার্কেটে পরিণত করবেন জানি না। সরকারের কম্ম নয়, তোমার-আমার সাধ্য নয়, দায়িত্ব আর্টিস্টদের নিজেদের। তাঁরা যে পৃথক ভদ্রশ্রেণী সেটা ভুলতেই হবে। ওস্তাদ কি ফিল্ম-এর গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ রোজগার করছেন নিশ্চয়—কিন্তু ঐ কেউ কেউ! হাজার গাইয়ে খেতে পাচ্ছে না যে!

৩১-১২-৫৫

সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করা আমার স্বাস্থ্যে কুলোয় না। যে-সব ওস্তাদের গান শুনতে চাই তাঁদের মার শেষ রাত্রে। প্রথিতযশাদের মধ্যে একমাত্র বড় গোলাম আলির গান শুনতে ব্যগ্র। যা শুনেছি তাতে আশ মেটেনি। এ ক'বৎসর নাকি তিনি অদ্ভুত ভালো গাইছেন।

যাঁরা নতুন উঠছেন তাঁদের মধ্যে সালামৎ ও নজাকৎ-এর

তারিফ শুনলাম। তবে আগামী শুক্রবার জ্ঞান ঘোষের বাড়িতে তাঁরা গাইবেন ও আমি যাবো। পাকিস্তানেই এখন ভালো গাইয়ের দল—ভারতের শ্রেষ্ঠ গুণীরা বাদ্যকর। শুনলাম, পাকিস্তানের গাইয়েরা কলকাতা আসতে ভালোবাসেন এবং অনেক টাকা রোজগার করেন। খুবই আনন্দের কথা। সঙ্গীতে অন্তত মিলটা থাকুক। ভারতের বাজিয়ে গুণীদের আদর পাকিস্তানে আছে কিনা জানি না। তবে উর্দু কবিদের খুবই আছে জানি। যতদিন সঙ্গীত ও সাহিত্যে এইপ্রকার কদরের আদান-প্রদান থাকবে ততদিনই মঙ্গল।

একটা সন্দেহ উঠেছে মনে। বরাবর শুনে এসেছি, বলে এসেছি যে, চারুকলাই মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। সেখানে মিল থাকলে অন্য গরমিল বেশিদিন থাকে না। তাজমহল, দরবারীকানাড়া, গালিব-হালি তো সকলেরই উপভোগ্য ছিল—পোলাও-কালিয়ার, কিংবা সেরওয়ানি-চুড়িদারের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। দেশী পূজা-আচ্ছা, আচার-ব্যবহারও না হয় ভুললাম। তবু, হিন্দুস্থান পাকিস্তান হলো কেন? কেন কাশ্মীর নিয়ে ঝগড়া? কেন পাকিস্তান হিন্দুস্থানের প্রতি রোষবশত এমন কাজ করে বসেন যেটা তাঁর নিজেরই স্বার্থের বিপক্ষে? কারা করেন, কেন করেন? পলিটিশিয়ানরা নিশ্চয়ই। ঘেন্না ধরে গিয়েছে ঐ পলিটিশিয়ান জাতটার ওপর। ১৯৫৩।৫৪ সালে পশ্চিমী য়ুরোপের ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করতাম, 'তোমরা তো যুদ্ধ চাও না, তোমরা তো ডিমক্রাট, পলিটিশিয়ানরা তো তোমাদের কথা শুনতে বাধ্য, তবু তোমাদের সরকার যুদ্ধের জন্য সর্বদাই তৈরি হচ্ছেন, যার ফলে প্যারিসের রাস্তায়, সীন নদীর পুলের তলায় হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ শীতের রাত কাটিয়ে দেয়। তোমাদের দেশে সাধারণ মানুষের স্থান কোথায়

তবে ?' উত্তর পেতাম, সদুত্তর পাইনি। উত্তর, ভেস্টেড ইন্টারেস্ট-গুলোই সরকারকে চালায় এবং যুদ্ধই তাদের পক্ষে সবচেয়ে লাভবান ব্যবসা। (আমার প্রথমে ধারণা ছিল যে, এই যুদ্ধের কণ্ট্র্যাক্টর-এর দল গত একশ' দেড়শ' বছর মাত্র দেশের সর্বনাশ করে ফুলেছে। ওমা, তা নয় দেখলাম। নেপলিয়নের যুদ্ধের সময় তাই, রোমের পিউনিক যুদ্ধেও তাই। আর সেদিন পড়লাম, আর্মাডা থেকে পরিত্রাণ পাবার সময়ও তাই। মহাভারতের যুদ্ধে, রাম-রাবণের যুদ্ধেও কি ওঁরা ছিলেন ?) এইসব পড়ে শুনে কেবল ডিমক্রেসীতেই বিশ্বাস থাকে না তা নয়, রাষ্ট্রের ওপরও বিশ্বাস চলে যায়।

তা বলে এনার্কিস্ট হতে পারি না। বর্তমান এনার্কিস্ট লিটারেচার যা পড়েছি তাতে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারিনি। অত্যন্ত অবাস্তব, নিতান্ত অনৈতিহাসিক মনে হয়েছে। আসল কথা রাষ্ট্র ও সমাজের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হওয়া চাই। স্বাধীন ভারতবর্ষের এই বিষয়ে অনেক সুবিধা ছিল। আমাদের সমাজ ছিল শক্তিশালী, আর রাষ্ট্র নতুন। রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী আমাদের সচেতনও করেছিলেন। তবু কিছু হলো না। রাষ্ট্রশক্তিই বেড়ে চলেছে, আর সমাজ যাচ্ছে হুড়মুড় করে ভেঙে। ফলে স্টেটিজম্ই হুড়হুড় করে বাড়ছে। য়ুরোপেরও যা দশা, আমাদেরও তাই হবে। আজ না হয় পরশু। ভেবেছিলাম, আমাদের মেয়েরা রুখে দাঁড়াবে; তাও হলো না; তাঁরা গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পচা বিলেতী স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে মুখে তাঁদের নাল পড়ে। রাষ্ট্রের হুকুমে তাঁরাও হাসিমুখে ছেলেদের যুদ্ধে পাঠাবেন। কেউ বলবেন না 'যাসনি বাছা।' একে ইতিহাসের দুর্মর গতি আমি কখনও বলবো না। বুদ্ধি খাটিয়ে ইতিহাস যারা তৈরি না করতে পারে তারাই ইতিহাসের 'গতি' কপচায়। গচ্ছতি ইতি জগৎ—এ-কথা কাকপক্ষীরাও

জানে। অদৃষ্টবাদীরা মানুষ নয়। অর্থাৎ বুদ্ধি থাকলেও তাঁরা বুদ্ধি খাটাতে রাজী নয়।

বছর দুয়েক আগে ঢাকার একটি মেয়ের মুখে অতি সুন্দর রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনবার পর রাত্রে এইসব নানা কথা মনে হয়েছিল।

কিন্তু হয়তো আমারই ভুল। সঙ্গীত-টঙ্গীত সবই হয়তো বাজে! আত্মার সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে হয়তো তার কিছুই সম্বন্ধ নেই! হয়তো আত্মা-হৃদয় সবই মিথ্যা! সত্য হয়তো শক্তি, 'পাওয়ার্'। হয়তো এ-যুগের চাঁদ মুশল। হয়তো, হয়তো, হয়তো, সবই আমার 'হয়তো'।

২-১-৫৬

বছর কাটলো। গত বৎসরের প্রধান ঘটনার তালিকা ও বিশ্লেষণ পড়লাম। বছর এলো, গেল, কি হলো? সতু সেনের ধারণা কিছুই হয়নি আমাদের দেশে। জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে আমাদের সরকারের বহুদিন লাগবে। অথচ এই সতু ভেলোরের হাসপাতালের সুখ্যাতিতে শতমুখ। সেটি নাকি একটি আমেরিক্যান মহিলার প্রেরণায় সম্ভব হয়েছে। সে এক রোগীকে নিয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালের প্রত্যেকেই সজ্জন ব্যক্তি, একেবারে আপন করে ফেললে। শুনেও সুখী হলাম। এই সতু, যে ও যার

আত্মীয় স্বজন জেলে পচেছে, যার আদর্শনিষ্ঠার তুলনা নেই, তার মনোভাব কেন এমন হলো ? কেন আমাদের দেশ তার চরিত্রের, বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করলে না ! হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে তার Sons of the Soil নামে একটা নক্সা পড়লাম। খাশা লেখা। সে এখন বেড়িয়ে বেড়াক, দেশের প্রকৃত বিবরণ দিক। তাকে আলিগড়ে নিজের কাছে রাখবো ভাবছি। গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে ঘুরবে, আর মধ্যে মধ্যে লিখবে।

(অধ্যক্ষ) সতীশ চট্টোপাধ্যায়—যাঁর ঋণ আমি জীবনে শোধ দিতে পারবো না—তিনি আমাকে ১৯১১।১২ সালে বলেছিলেন, 'You will dig your grave by your pen.' (নামের কবর না দেহের কবর বলেননি।) এখন দেখছি সাহিত্যই হলো বাঙালীর manifest destiny।

ভূপতি চৌধুরী একটি ঘটনার কথা আমাকে বলেন। শান্তিপুরের কাছে কোথায় এক রেফিউজী কলোনি বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ে, ভেসে যায়। সেটা দেখতে ভূপতিকে পাঠানো হয়। সে কেবল সাহিত্যিক নয়, একজন ভালো এঞ্জিনীয়ার-ডিজাইনার-টাউন প্ল্যানার। পর্যবেক্ষণের সময় বাস্তুহারার দল তাকে লম্বা লম্বা কবিতা দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। সর্বহারা কথাটির বেশি প্রয়োগ ছিল। মোটের ওপর কবিতাগুলি—একটা নয়, অনেকগুলি মন্দ হয়নি। (মন্দ কবিতা লেখা রবীন্দ্রনাথের পর অসম্ভব—পাঠের কথা ভিন্ন।) কিন্তু ঐ বাস্তুহারা সর্বহারা কবির দল ভাঙা চালাঘর তখনও পর্যন্ত তোলেননি, বাড়ির মধ্যে জল কাদা তখনও সাফ করেননি। ইংরেজ সৈন্য ছত্রমঞ্জিলের অন্দরে প্রবেশ করছে : ওয়াজিদ আলির মা, বাদশাজাদী, ছুটে এসে ছেলেকে বললেন, বেতমীজ বে-সহবৎদের শিক্ষা দিতে। ওয়াজিদ আলি শা তখন

সকালের রাগ শুনছিলেন প্রিয় ওস্তাদের মুখ থেকে। মাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আম্মা, মিয়াঁ সাহেবের টোড়ির টুকরোটা শেষ হোক।' স্ত্রীলোক অমনই অধীর হয় তিনি জানতেন, কিংবা তাঁর মূল্যজ্ঞান বাঙালীদের মতনই টনটনে ছিল বোধ হয়। আগে কবিতা, না আগে ভাঙা চালা আর নোংরা উঠোনের সংকার? আগে টোড়ির টুকরো, না আগে মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা? ওয়াজিদ আলি শা'র বাঙলা দেশ ছাড়া অন্যত্র নির্বাসন অ-যথা হতো। তাঁর জুতো কেউ ঘুরিয়ে দেয়নি বলে তিনি পালাতে পারেননি এ-কথাটা মিথ্যা। টোড়ির টুকরোর জন্যই রাজ্য গেল এই ঐতিহাসিক সংবাদ সেই সভার শেষ গায়ক এক শত বৎসরের ওস্তাদ আমাকে দিয়েছিলেন। আমি এই সংবাদটাই বিশ্বাস করি। আমার ধারণা পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ হেরে গেলেন নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ শুনতে শুনতে। ওটা না পড়লেও পারতেন, লোকে—অর্থাৎ ঐতিহাসিকরা বলবেন—কিন্তু আমি বলি, না পড়ে, কিংবা না শুনিয়ে, অতএব না শুনে, উপায় ছিল না।

৩-১-৫৬

প্রার্থনা নামে ভবানীপুরের এক সঙ্গীত-চক্রের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। জনকয়েক পাড়ার ছেলে মিলে তৈরি করেছে।

হল্‌টি মারহাট্টা নিবাসের, সুন্দর। বাঙলা দেশে কিছু তা হলে গড়ে উঠছে—ভাঙছে তবু গড়ছে। জাফর বলে একটি বোম্বাই অঞ্চলের অল্পবয়সী ছেলের সেতার শুনলাম। তৈরি হাত, এখনও বুদ্ধি পাকেনি। সাঙ্গীতিক বুদ্ধির একটা বিশেষ অর্থ আছে। তার ভিত্তি ওজন জ্ঞান, মান জ্ঞান। সেই ভিত্তির ওপর রাগের ইমারত কতখানি উঠতে পারে তার জ্ঞান· এই বুদ্ধির আরেকটি নিদর্শন। সাঙ্গীতিক বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ চিহ্ন হলো প্রয়োগ কৌশল। ব্যাপারটা operational আসলে। তার ওপর সৃষ্টি। এই সৃষ্টির ডিজাইন, আর্কিটেক্টনিক (architechtonic) আছে। অতি ধীরে, গড়িয়ে, গড়িয়ে একটা একটা স্বর থেকে অন্য স্বরে যাওয়াটা সৃষ্টি নয়। আধ ঘণ্টা পরে না হয় অস্থায়ী শেষ হলো, কণ্ঠ না হয় পঞ্চমে এলো বেশ লাগলো। কিন্তু কী বেশ লাগলো ? সুরেলা গলা শুনলাম, ওস্তাদের ও শ্রোতার ধৈর্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া গেল, রাগও খানিকটা খুললো। এটা যেন উদ্বোধন, আরাধনা, কিন্তু দেবী কি অবতীর্ণা হলেন ? তার আগেই তাঁকে অলংকারাকীর্ণা করা হয়েছে। যদি অবতরণের আভাসও এসে থাকে তবু ধৈর্যচ্যুতি কিংবা শ্বাস ফুরিয়ে যাবার ভয়ে ওস্তাদ আরম্ভ করলেন তান, অজস্র তান, মুস্কিলের তান, সঙ্গে বাঁয়াতবলার চটাপটি। ভদ্রলোকের মেয়ে এই গোলমালে অদৃশ্য হলেন। তার পর হাততালি। সোনার সজারু বালিকা বধূ এই অবসরে মূর্ছিতা হলেন। রাগ হলো এক প্রকারের স্থাপত্য। যে ধীরে ধীরে রাগ, কিংবা গানটা গড়ে, তুলতে পারে তারই সাঙ্গীতিক বুদ্ধি আছে। এরই প্রক্রিয়া হলো অঙ্গ-সংস্থান শব্দ-সংস্থান ইত্যাদি। এই বুদ্ধি যার নেই সে বড় ওস্তাদ হতে পারে না। আবার বলছি, বুদ্ধি থাকলেই যে বড় গাইয়ে হবে তা নয়, কারণ গান-বাজনা প্রয়োগশিল্প। মধ্য যুগের বিদেশী

দার্শনিকরা যাকে, tact, prudence বলতেন সেটাই প্রয়োগশিল্পের প্রধান কথা। বেহালায়, সানাইতে বাঁশিতে, এমন কি কণ্ঠে সেতারের অনুকরণ, কিংবা সরোদে বীণার কাজ দেখানো tactlessness, imprudence-এর চিহ্ন। অবশ্য সাধারণ বুদ্ধি থাকা চাই নচেৎ শ্রোতার সঙ্গে বনিবনাও অসম্ভব। জাফর কেন, বহু তথাকথিত ওস্তাদেরও সাঙ্গীতিক বুদ্ধির কমতি লক্ষ্য করেছি। আর্ট আর ক্রাফট-এর পার্থক্য, কল্পনা-প্রেরণা আর বুদ্ধি কিংবা ক্রিয়ার পার্থক্য—এ সব পণ্ডিতী বোকামি।

৪-১-৫৬

এণ্টালির সাংস্কৃতিক সঙ্ঘে গেলাম। অর্ধেনদা আর আমি ছিলাম প্রধান অতিথি। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রধান সভাপতি। ধ্রুপদী অমর ভট্টাচার্যমশাই উদ্বোধন করলেন। এঁর সঙ্গে বহু বৎসর পরে দেখা হলো। বোধ হয় ইনিই বাংলা দেশের শেষ পাকা ধ্রুপদী। অনেক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তার সুযোগ পেলাম। বিসমিল্লা সানাই বাজালে। চমৎকার। বিসমিল্লা সানাই-এর নতুন রূপ দিয়েছে। খেয়াল ও তারের যন্ত্রের সংমিশ্রণ। সঙ্গতও বাঁয়াতবলার ছাঁদে। পান্নালালও তাই করেন। সানাই, বাঁশের বাঁশির 'জান' কম, তাই অন্য সাজের আশ্রয় নিতে বাধ্য। সানাই

রোশনচৌকির অঙ্গ। বাঁশির প্রতিবেশ খোলা মাঠ। বিবাহ-বাসরে রোশনচৌকির পরিবর্তে রেডিওর, ফিল্ম-এর গান হয়—আর খোলা মাঠ রইলো কোথায়? বাসর থেকে আসরে, মাঠ থেকে হাটে আনলে স্বভাবের পরিবর্তন ঘটবেই।

মণ্ডপটি চমৎকার সাজানো। এমন রুচি আমাদের সময় ছিল না। ভারতের অন্য দেশেও দেখিনি। ডাকের কাজ যে অতো সুচারু হতে পারে জানতাম না। শুনলাম পরিকল্পনাটি দেবব্রত-বাবুর, কিন্তু কাজ দেশী, গ্রামের লোকদেরই, যারা বংশানুক্রমে ডাকের সাজ করে আসছে। পটভূমি মোটা পাটির—যেটা রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম বিচিত্রার দেয়ালে বসান। (মোটরে বেত-পাটির রেওয়াজ কিন্তু রথীবাবু চালাতে পারলেন না।) ঠিক পিছনকার চতুষ্কোণ নক্সাগুলো কিন্তু আমার পছন্দ হয়নি। ডাইনের প্রোসিনিয়মের অঙ্কিত শঙ্খবাদিনীর রঙ-এর রেশকে ভারসাম্য দিতে ও তার জের টানবার কিছু দরকার ছিল। কিন্তু চতুষ্কোণ সাধারণত দীর্ঘায়িত রেখার জের টানতে অক্ষম। চতুষ্কোণের স্থিতিস্থাপকতা ও রেখার লীলায়িত গতি সাধারণত বিরোধী। তা ছাড়া দর্শকের ঠিক চোখের সামনে ঐ চতুষ্কোণের উগ্র রঙ-সমাবেশ ডাকের কাজের শুভ্র শুদ্ধতাকে নষ্ট করবার ভয় ছিল। সে যাই হোক, বাঙলার কারুশিল্পের এমন মনোহর আধুনিক রূপ আমার চোখে পড়েনি।

আমাকে বক্তৃতা দিতে হলো। অনভ্যাসের বশে অনেকগুলি ইংরেজী কথার প্রয়োগ করলাম। খারাপ লাগছিল। রাগ-রাগিণীর চিত্ররূপের বর্ণনা ও বিচার ছিল অর্ধেন্দার বিষয়। বিষয়টি তাঁর নিতান্ত প্রিয়। কিন্তু আমার প্রাথমিক সন্দেহ দূর এখনও হলো না। রাগের কাব্যরূপ ও চিত্ররূপ তার নিজের রূপের

অনুবাদ মাত্র এবং সে-অনুবাদ নিতান্তই ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। গাইবার কিংবা বাজাবার সময় কোন্ ওস্তাদ ঐ চিত্র, ঐ কাব্যরূপের স্মৃতি পোষণ করেন, কোন্ শ্রোতার মনে ঐ রূপের প্রতিফলন হয়? দেশী সঙ্গীতে, বিলেতী প্রোগ্রাম-সঙ্গীতে সম্ভব খানিকটা, কেননা সেখানে গল্পের, কবিতার, সাহিত্যের, এমন কি চিত্রের আমেজ থাকে। কিন্তু রাগ বিস্তারে? স্ত্রীরূপ অতি সহজে পুরুষের আকার ধারণ করতে পারে—আর হরিণ, ময়ূর সব ছুটে পালায় এক তানে! আর ভাব? তার রূপ সম্বন্ধে অধিকাংশ মনোবৈজ্ঞানিকরা এখনও সন্দিহান। আমার একবার, বহু বৎসর পূর্বে এই বিষয়ে জানবার ইচ্ছা হয়—কোনো কিছু স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। Psychology of musical emotions বোধ হয় সাহিত্য, চিত্র, রস ও ভাবের সমগোত্র নয়। আমার সন্দেহ রয়েই গেল। তবু অর্ধেন্দুদা যা বলেন তাই মূল্যবান। আর্টে অমন সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত মানুষ দেশে খুবই কম।

৭-১-৫৬

কাল রাতে ঝঙ্কারের বৈঠকে সালামৎ আর নজাকৎ আলির খেয়াল শুনলাম। ওঁরা মুলতানী (পাকিস্তানের) ঘরানা। পূরিয়ার সঙ্গে কেদারা মিশিয়ে খেয়াল গাইলেন। সুরেশ

চক্রধর্তী একটি চমৎকার নাম দিলেন, কেদূরিয়া। খুব হাসলাম। খুব রেওয়াজ করেছেন ওঁরা এই অল্প-বয়সে। অতো অল্প-বয়সে অতি রেওয়াজের কৃপায় কণ্ঠের মিষ্টত্ব ইতিমধ্যে কমছে; তানের বহর খুব, স্বর ও তালের ওপরও বেশ দখল। কিন্তু কিছু হলো না। হয় কেদারা না হয় পূরিয়া গাইলেই হতো, বুঝতে পারতাম, আনন্দ পেতাম। এই প্রকার বাহাদুরি কেনবার প্রয়াস আমার কাছে ছেলেমানুষী মনে হয়। ভাতখণ্ডেজী একবার একজন ওস্তাদকে হাম্বির গাইয়ে বোকা বানিয়েছিলেন। ওস্তাদ লম্বা চওড়া কথা কইছিল—যত সব কূট রাগ নিয়ে গলাবাজি করছিল। পণ্ডিতজী নিতান্ত বিনম্রভাবে, করযোড়ে হাম্বিরের মতন একটি ছোট্ট, সোজা রাগ তাঁর মতো আনাড়ির জন্য গাইতে অনুরোধ করলেন। 'বেসক জরুরু' বলে ওস্তাদ হাম্বির শুরু করলে। মুখড়াটি বেশ হলো। তার পরই স্বর থেকে ওঠবার সময় কেদারা! ভুল হচ্ছে আর পণ্ডিতজী ঘাড় নাড়ছেন, বাহবা দিচ্ছেন। ওস্তাদ না বুঝে আরো ভুল তান দিতে লাগলো। আমাকে পণ্ডিতজী পরে বলেছিলেন 'প্রচলিত রাগেরই বিস্তারে কৃতিত্ব ধরা পড়ে।' যে মেয়ে রাঁধতে জানে না সেই খানিক গুড়, লঙ্কা মশলা ঢালে। পান সাজার বেলাও তাই। জরদা-জাফরাণ-মুক্তোর- গুঁড়ো-সোনা চাঁদির পাতা মোড়া পান তীর্থযাত্রীদের জন্য। কাশীর রইসরা মুখে দেন না। মিষ্টি-চা, বাঙলা কীর্তন আর অ-প্রচলিত মিশ্ররাগ একই মনোবৃত্তির পরিচয়।

এত উপকার সত্ত্বেও সঙ্গীত সম্মেলনগুলি সঙ্গীতরুচির অন্তরের মূল্যজ্ঞানকে নামিয়ে দিচ্ছে মনে হলো।

আজ আলিগড় ফিরবো। একটু যে ভয়, মন খারাপ হচ্ছে না তা নয়। মিঠে রোদ, আকাশে-বাতাসে মাদকতা আছে এই

শহরের। কলকাতায় নানা অসুবিধা, তবু, তবু এ শহরের মূল্যজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হয়নি মনে হয়। এ-শহরের ছেলে-ছোকরারা খেতে পায়নি, তবু তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় জনকয়েক তো নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, তবু নতুন কথা শুনতে চায়, চারুকলায় অনুরাগী। বাঙলা দেশকে তোলা অসম্ভব নয়—Theoretically অবশ্য।

১৭-১-৫৬

কলকাতায় হিস্ট্রি কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন দেখে এলাম; এখানে জিওগ্রাফির প্রথম ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার দেখছি। সাধারণত, এই ধরনের সম্মেলন একপ্রকার বিরাট তামাসা। তামাসা বটে, কিন্তু মজা নেই। প্রোগ্রাম এতই ঘন যে, কারুর সঙ্গে কোনো বিষয় আলোচনা করবার সময় কেউ পায় না। কেবল খাওয়া-দাওয়া আর ঘোরাঘুরি। সামাজিক মূল্যও কমে আসছে। কে কার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়! সকলেই বড়দের পিছনে ছুটছে! ছেলে ছোকরারা, যারা কাজ করছে, উঠছে, যারা উপদেশ চায়, যাদের উপদেশ দরকার, তাদের স্থান জাতুগণ্ডির বাইরে। আর যাঁরা অনুষ্ঠানকে নিজেদের হাতে রাখতে চান তাঁরা নীরবে স্বনির্বাচিত হয়ে যাচ্ছেন। কনফারেন্স না ছাই! সব 'পাওয়ার' পলিটিক্স-এর রকমফের।

তবু কলকাতার হিস্ট্রি কংগ্রেস খুবই ভালো লাগলো। কেবলই নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, এতটা কেন ভালো লাগছে : এককালে ইতিহাস পড়তাম ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঐ দরজা দিয়ে ঢুকতাম, কোণে পানের দোকানে মিঠে খিলি কিনতাম, সেনেট হাউসে আশুবাবুকে দেখতাম—তারপর সব যোগ ছিন্ন হয়ে গেল : গত চল্লিশ বছরে মাত্র দু'বার আশুতোষ বিল্ডিং-এর মধ্যে গিয়েছি : একবার দ্বারিক ঘোষ বক্তৃতা দিতে নিয়ে যান, আর একবার 'খোঁজ পরিষদের' একটা সভায়। ব্যস—আর কোনো যোগ নেই : মায়া কাটানোই মঙ্গল, কিন্তু কাটে কই ? এখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দা শুনলে মন খারাপ হয়ে যায়। তা যাক গে !

সম্মেলনের দুটি জিনিস চোখে পড়লো। সজ্জার ও বেশের সুরুচি এবং বুদ্ধিদীপ্ত মুখচোখ। অনেকদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরঞ্জামে সুরুচির পরিচয় পেলাম। আর অতোগুলি বুদ্ধিমাখানো চেহারাও অনেকদিন দেখিনি। কিন্তু সব বেঁটে মনে হলো : ছাত্র-ছাত্রীরা, অর্থাৎ স্বেচ্ছাসেবকের দল, তারাই যে বাস-ট্রাম পোড়ায় সন্দেহ পর্যন্ত হলো না। স্বাস্থ্যহীনও তো নয় ! ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে লাগলো। খবরের কাগজে কিছুতেই ভুল লিখতে পারে না, আর নেতারা নিশ্চয়ই ভেবে চিন্তে কথা বলেন। আমারই মরীচিকা দর্শন !

নির্মল সিদ্ধান্তের অভ্যর্থনা, ডাঃ সুরেন সেন ও পানিক্করের বক্তৃতা সবই ভালো লাগলো। নির্মল সিদ্ধান্ত বললেন, কলকাতার রাস্তায় স্বাধীনতার সংগ্রাম চলেছিল। আমারও বিশ্বাস তাই, কিন্তু বিধানবাবু কি সায় দেবেন ? অনেকদিন পরে হরেনবাবুকে (রাজ্যপাল) দেখলাম। তিলমাত্র পরিবর্তন হয়নি। একেই বলে মানুষের মতন মানুষ !

পানিক্করের অভিভাষণে অনেক মূল্যবান মন্তব্য রয়েছে। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি, মুখ খুললেই নতুন কথা ঝরে পড়ে ও সেই শুনে মন চাঙা না হয়ে যায় না। কিন্তু, কিন্তু, কোথায় যেন 'কিন্তু' থেকে যায়। প্রাদেশিক মনোভাব ইতিহাসে অচল ; ভারতবর্ষের ঐক্য ধরতে হবে ; তার আভ্যন্তরীণ আর্য-অনার্য সভ্যতার আদান-প্রদান যে এখনও চলছে বুঝতে হবে ; ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক প্রতিবেশকে বাড়াতে হবে ; কেবল রাজনৈতিক ইতিহাস লিখলে চলবে না---প্রত্যেক কথাটিই মূল্যবান। কিন্তু একটি মন্তব্য ধরা যাক। প্রাদেশিক মনোভাব নিতান্ত খারাপ সকলেই জানে—ওটা মরা ঘোড়াকে ঠ্যাঙানো। কিন্তু যদি সামাজিক ইতিহাস লেখাই কাম্য হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন অংশের সমাজকেই টয়েনবীর ভাষায়, intelligible field of observation হিসেবেই মানতে হবে। তারপর অবশ্য গড়ে তোলা—সে-কাজ শক্ত, এতই শক্ত যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস-রচনার কল্পনা সরকারকে ত্যাগ করতে হলো। সমগ্র ভারতকে যদি 'ইন্টেলিজিবল ফীল্ড' ধরা যায় তা হলে সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে দাঁড়ায় কি? জাতিপ্রথা ও সংস্কৃত পুঁথিপত্রের ইতিহাস। জাতিপ্রথার ইতিহাসকে না হয় আর্য-অনার্য ইত্যাদির 'acculturation process' হিসেবে ধরা গেল, না হয় পুঁথিপত্রের, সাহিত্যের, দর্শনের ইতিহাস সব জানা গেল—তা এখনও জানা যায়নি—তবু কি ভারতের ঐতিহাসিক ঐক্য হৃদয়ঙ্গম হলো? আমার সন্দেহ হয়, অনেক কিছুই বাদ পড়ে গেল। আসল জিনিসটাই এতে ফস্কে যায়—সেটা ভারতের মেটিরিয়াল ক্যলচরের ইতিহাস। একেই তো আমাদের ঐতিহাসিকরা সমাজতত্ত্ব ছোঁবেন না—তাঁরা নৃতত্ত্বকেও দেখতে পারেন না—তার ওপর ভারতের মেটিরিয়াল ইকনমিক হিস্ট্রি! ও যে

একেবারে মার্কসিজম্! তাই বোধ হয় পানিক্করের 'পিরেন' পর্যন্ত এসে থেমে গেলেন। কিন্তু ও-দেশের ঐতিহাসিকরা পিরেনকেও অতিক্রম করেছে। আমি অন্তত ৭।৮টি প্রবন্ধ পড়েছি যেখানে তাঁর মধ্যযুগ ও ফিউডালিজম সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলিকে নথির সাহায্যে নাকচ করা হয়েছে। ব্যাপারটা আমার মতে এই, ভারতের সংস্কৃতি বলে একটা বস্তু আছে। যদিও তাঁকে ঠিক ধরা ছোঁয়া যায় না। সেই সংস্কৃতির ইতিহাস সোশিওলজি অব নলেজ-এর অঙ্গ, তথাকথিত ইতিহাসের অঙ্গ নয়। সেই সোশিওলজি অব নলেজ-এর মেটিরিয়াল ভিত্তি না জানলে তার ডাইনামিক্স বোঝা যায় না। এবং ইতিহাস ব্যাপারটাই ডাইনামিক, রাজা-রাজোয়াড়ার কীর্তিকলাপের ব্যাক ড্রপ নয়। এ-সবের ইঙ্গিত পানিক্করের অভিভাষণে নেই।

এখানে ভূগোলের আন্তর্জাতিক সেমিনার চলছে। ভারতের বাইরে ১৬।১৭টি দেশের প্রতিনিধিরা এসেছেন। খুব জমজমাট। বন্দোবস্ত চমৎকার। এখানে হোটেল নেই, তাই প্রত্যেক অধ্যাপককে কিছু কিছু অতিথি সর্বদাই রাখতে হয়। আমরাও নতুন মুখ দেখবার আশায় রাজী হই। ভিন্ন ভিন্ন শাখায় সেমিনার বিভক্ত হয়েছে। একাধিক প্রবন্ধ শুনলাম, অনেক কিছু শিখলাম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের এককালে খুবই নাম ছিল। আবার, এইবার থেকে হবে। একটি লেকচারার, তার আবার একটা ফুসফুস নেই, সমগ্র কনফারেন্সের কর্ণধার। যেমন পরিশ্রমের শক্তি, তেমনই বুদ্ধিমান, তেমনই মাথা ঠাণ্ডা ও কর্মিষ্ঠ। কলের মতন চালাচ্ছে। অথচ মুনীস্ লেকচারার এবং তাই থাকবে চিরটাকাল হয়তো, যদি অবশ্য বেঁচে থাকে। জাকীর সাহেব এখানে Institute for the study of arid and

semi-arid zone স্থাপনার প্রস্তাব করলেন। মিশরের একজন বিখ্যাত ভৌগোলিক বক্তৃতা দিলেন। প্রসঙ্গত বললেন, স্পিরিচ্যুয়েল জিওগ্রাফি চাই। যদি ভৌগোলিক প্রতিবেশের সঙ্গে মিথ, সিম্বল, লেজেণ্ড, এমন কি দার্শনিক মনোভাব, অর্থাৎ ভূয়োদর্শনের সম্বন্ধ নিরূপণ—এই ধরনের ব্যাপার ভূগোলের বিষয় ও উদ্দেশ্য হয় তবে তার অর্থ বুঝি। কিন্তু তিনি আরো কিছু বোঝেন কথাবার্তায় মনে হলো। ভদ্রলোক মহাপণ্ডিত। আরব-বাণিজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছেন। বইখানি পেয়েছি। রুশ-ভৌগোলিকদে ররিজিয়নাল প্ল্যানিং নিয়ে প্রশ্ন করলাম। সদুত্তর পেলাম না। ভাষার বাধাই বোধ হয়।

গোটাকয়েক কারণে প্রশ্নটি তুলেছিলাম। (১) মনে আমার পানিক্করের বক্তৃতায় ভারতীয় ঐক্য-বোধের আবেদনের জোর ছিল। কেবল ঐক্য বললেই তো চলবে না, তার শক্তিরও একটা পরিমাণ চাই। ভারতীয় ঐক্য-বোধের জোরের চেয়ে ধর্ম, ভাষা ও জমি-সংক্রান্ত ঐক্য-বোধের জোর বেশি দেখেছি, যথা, পাকিস্তান এবং অন্ধ্রদেশের জন্ম। (ভয় হচ্ছে, ভাষাগত ঐক্য-বোধের অন্য প্রমাণ শীঘ্রই পাবো।) রুশদেশে এই সমস্যার অনেকখানি নিরাকরণ হয়েছে। তার মর্ম-কথা কর্ম-প্রেরণার শক্তির আধিক্য। অর্থাৎ নতুন জীবনের প্ল্যানিং। (২) রাশিয়ার সেই প্ল্যানিং-এর এক অবস্থায় regional planning-এর balance খোঁজা হয়। তার খবর আমরা বেশি কিছু জানি না। রাশিয়ার মধ্যে একাংশ উন্নত, অন্যাংশ অনুন্নত। তাদের মধ্যে যে লেন-দেন চলে তার মূলতত্ত্ব যা ওলীন্ বলেছেন তাই, না আর কিছু? মার্কসিস্ট অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির খবর পাওয়া যায় না। আমি জানতে চেয়েছিলাম।

(৩) এস. আর. সি. রিপোর্ট পড়ে পর্যন্ত আমার প্রাণ টুগ্-বুগ্ করছে। রাধাকমলবাবু রিজিয়নালিজম নিয়ে অনেক কিছু লিখলেন, বই-এর পর বই লেখাই সার হলো, তাঁর নিজেরই উপকার হলো। দেশের লোক তাঁর ভাষা বুঝতেই পারলে না, অন্য কোনো ফলই হলো না। তারপর কোপলাণ্ড সাহেব ভারতবর্ষকে রিভারবেসিন অনুসারে ভাগ করতে চাইলেন। ভাগ হলো, কিন্তু নদীর জল নিয়ে এখনও পাকিস্তানের সঙ্গে ঝগড়া চলছে। তার ওপর এই এস. আর. সি. রিপোর্ট, যার মধ্যে ভৌগোলিক রিজিয়নালিজম-এর সঙ্গে ভাষাগত রিজিয়নালিজম জট পাকিয়ে রয়েছে। এখন আবার পণ্ডিতজী বলছেন, রিজিয়নাল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হলে ভালো হয়। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এমন দুর্দশা যে, আমরা অমনি গিলে ফেলেছি। কিন্তু ব্যাপারটি কি এই নয় যে, আমরা সমবেত কর্মের মধ্যে ঐক্য পাইনি? তাই ভাষা, জাতি, দেশ, অর্থাৎ প্রদেশ, শ্রেণী 'রিজন' প্রভৃতির মধ্যে ঐক্য চাইছি এবং পাচ্ছি, কারণ সেগুলিই তো এতদিন রয়েছে! এই ধরনের ঐক্য একপ্রকার স্বাভাবিক, তাই তার জোর এত বেশি। সংস্কৃত, সংস্কৃত করে চেঁচালে কি হবে! নব-ভারতের একমাত্র শক্তিশালী ঐক্য-বোধ আসতে পারে সমবেত সৃজনের সাহায্যে। অর্থাৎ, আমাদের প্ল্যানিং এখনও জমেনি, মাটিতে পৌঁছয়নি, শেকড় গাড়েনি। মুমূর্ষু ভীষ্ম বাঁচতে পারেন একমাত্র পাতালের উৎস থেকে যে জল ওঠে, তাই সেবন করে। কলের জলে বৃদ্ধ পিতামহ বাঁচেন না। হয়তো হবে, ভারতের ঐক্য-বোধ আসবে, কোনো না কোনোদিন আসবে নিশ্চয়। তারপর রিজিয়নাল ব্যালান্স নিয়ে মাথা ঘামাবো। রাশিয়ান প্ল্যানে ওটা পরে আসে—যখন

নিখিল সঙ্কল্পকে কার্যকরী করা হয় তখন। (ওটা প্ল্যানের ব্রেক-ডাউন।)

. এইসব ভয় ভাবনা মনে ছিল। ভূগোলে ও জাতীয় সংগঠন নামে যে সেমিনার হয়েছিল তাতে যোগ দিলাম। বেশি কিছু শিখলাম না। আলোচনার স্তর উঁচু ছিল না, ঐ যেমন দেশী কনফারেন্স-এ হয় তেমনই। আরো দু'দিন চলবে, দেখি·····

১৭-১-৫৬

মালিক মনসুর নামে একজন গায়কের গান রেডিওতে শুনলাম। পূর্বে তাঁর নামই শুনিনি। রেডিওর কাছে কৃতজ্ঞ। রেডিওর অনেক দোষ আছে কিন্তু অ-খ্যাত গুণীকে খুঁজে বার করার এক গুণে সব দোষ ঢাকা পড়ে। শুনলাম নীলকণ্ঠ বোয়ার কাছে প্রথম নাড়া বাঁধেন, তারপর ভুর্জি খাঁ'র কাছে। আলাদিয়া খাঁ'র ঘরানাই মনে হলো। সেই মুশকিলের তান, আলাপ বাদ দিয়ে গান শুরু করা, সেই গঠন-চাতুর্য। একেবারে অঙ্ক, কোনো ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। অতো শক্ত তানের মধ্যে রাগভ্রষ্ট হলো না, স্বরচ্যুতি, স্বর-ভঙ্গ হলো না। জয়েৎশ্রী ও নন্দ গাইলেন। অনেকদিন পরে জয়েৎশ্রী শুনলাম। আমার খুব ভালো লাগলো, কিন্তু বোধ হয় অন্যের পছন্দ হবে না। অতো ডিজাইনের কারিগরি কি জনপ্রিয় হবে? অথচ এই সত্যকারের খেয়াল। হঠাৎ চোখে ভেসে উঠলো

মন্দ্রি^ঁয়ার একটা ছবি। যে যাই বলুন, আমাদের উচ্চসঙ্গীত নিতান্তই অ্যাবস্ট্র্যাক্ট—তাই বাখ উপভোগ করা আমাদের পক্ষে খুব শক্ত নয়। নিজের এই অভিজ্ঞতা। কি জানি কেন, কথা জড়ানো সাহিত্য মাখানো, সাহিত্যিক রসে চোবানো সঙ্গীতের প্রসারে আমি একটু ভীত হয়েছি। ঐ সাহিত্যের আশীর্বাদেই মেয়েরা ঢুকে পড়েছেন, কেবল আসরে নয়, সঙ্গীতের মধ্যে। 'ও মা, কি মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে সব!' খুরশেদ আলি বলতেন, 'ঠুংরি মেয়েদের জন্ম নয়।' অর্থাৎ, ঠুংরিটাও নয়।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রাণ কথার মাধুর্য নয়, কথা ও সুরের সঙ্গতিও ততটা নয়, যতটা গানটির ডিজাইন। কথা বাদ দিয়ে, কেবল স্বরবর্ণের সাহায্যে সুরটি গাইলেই বোঝা যায়। অবশ্য কথা অতুলনীয়, সঙ্গতিও অচ্ছেদ্য, তবু তারও অধিক হলো ডিজাইন, যেটা ধারণ করছে, অর্থাৎ ধর্ম। দক্ষিণীর এক বার্ষিক উৎসবে আশুতোষ কলেজে এই ধরনের কথা প্রমাণ সমেত বলেছিলাম মনে পড়ছে।

প্রথামত উচ্চসঙ্গীতে রাগের একটা বড়, মোটা কাঠামো থাকে, তারই মধ্যে গাইয়ে-বাজিয়েকে বিচরণ করতে হয়। সেই সময়টুকু তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের অবসর। কৃতিত্বের রঙ হলো ভাব, এক্সপ্রেশন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গান এক একটি 'ডিজাইন,' সেইটিই কাঠামো, সেইটিই এক্সপ্রেশন। তার ওপর ব্যক্তিগত এক্সপ্রেশন চাপালে বিপদ ঘনিয়ে ওঠে। হয়ে পড়ে ন্যাকামি। ন্যাকামির মানে আদিখ্যেতা, অর্থাৎ আধিক্য। আমার মনে হয়, এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুর নিয়ে ছিনিমিনি করতে দিতে গররাজি ছিলেন। দিলীপ ঠিক ধরতে পারেনি। আরো অনেকেই পারেন না। বেদমন্ত্রের উচ্চারণে শুদ্ধতার ওপর অতোটা জোর দেওয়া হতো

কেন আমাদের ভাবা উচিত। ঐ প্রকার শুদ্ধতার একটা সৃষ্টির দিক আছে। যে-যুগে আর্চটাইপ তৈরি হচ্ছে, সিম্বল তৈরি হচ্ছে, তখন পুনরাবৃত্তির অর্থ সৃষ্টি, শুদ্ধ আবৃত্তির অর্থ শব্দ সৃষ্টি। একজন চীনে আর্টিস্ট একটি ছবিই জীবনভোর এঁকে গেলেন, "Until it became a masterpiece"। এনায়েৎ খাঁ'র হাতে একই পিলু, একই কাফি বহুবার শুনেছি, প্রতিবারই নতুন, প্রতিবারই সৃষ্টি। শুদ্ধতার ওপর অতোটা জোর দেবার অবশ্য অন্য একটা সামাজিক দিক আছে। ঐ জোর দিয়েই উচ্চ শ্রেণী, এলিট গ্রুপ,—যেমন ব্রাহ্মণ, উলেমা, ম্যাণ্ডারীণ, নিজেদের শ্রেণী আধিপত্য বজায় রাখে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে যদি ঐ ধরনের দলীয় স্বার্থ তৈরি হয়ে থাকে, তবে তাকে ভাঙাই উচিত কিন্তু সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ আবৃত্তির সৃষ্টিশক্তি যেন না ভেঙে যায়। তার মধ্যে একটা ভূমিকা প্রতিষ্ঠার ক্রিয়া চলে। শব্দের সাহায্যে ঐতিহ্য বেঁচে থাকে, আবার শব্দের সাহায্যেই ঐতিহ্য পুনর্জীবিত হয়। তন্ত্রের জপতত্ত্বে অনেক গভীর কথা আছে।

ঘরানার গূঢ়ার্থ এই শব্দতত্ত্ব। তাই উজীর খাঁ'র শিষ্য আলাউদ্দীন, তাঁর শিষ্য আলি আকবর, রবিশঙ্কর, তিমির, নিখিল, এঁদের সম্বন্ধে ভুল হবার জো নেই, এঁরা কোন্ ঘরানার। আধ মিনিটেই বোঝা যায় তাঁদের জাতি। অবশ্য পার্থক্য আছে। আজ কয়েকদিন যাবৎ এঁদের নিজেদের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে চেষ্টা করছি। এখনও স্পষ্ট ধরতে পারিনি। তবে খানিকটা এই ধরনের মনে হয়। আলি আকবরের বাজনার প্রধান কথা ছন্দ, লয়; তার রাগিণী লয়-ময় (যেমন সৃষ্টি ব্রহ্মময়, আনন্দময়)। রাগিণী ফুটছে ছন্দিত হয়ে। তার প্রতি অংশ ছন্দে বাঁধা। তাই তার জীবন তার শ্বাস প্রশ্বাস।

নক্সাগুলো নেচে সামনে আসে, নেচে চলে যায়। এই ছন্দের মধ্যেই তার ভাব, এক্সপ্রেশন ছন্দই ভাব। ব্যাকানালীয়ান নৃত্য নয়, ডায়োনিশিয়ানের জাতি, আরো সুচারু। আলি আকবর, নাটকত্ব ফোটায় এই শব্দপ্রাণ বাদনের সাহায্যে। সরোদের প্রথামত ড্রামাটিক টেকনিকে সে সন্তুষ্ট নয়, সে তারও অধিক বাজায়। আমার কাছে তার বাজনার প্রতিটি অংশ মূর্ত হয়ে ওঠে। তার ডিজাইনটা এত সুন্দর যে, নিজের ছন্দের তাগিদেই সেটি রূপ পায়। ছন্দ এখানে স্রষ্টা, তার বাজনা শুনতে শুনতে বুঝতে পারি কর্তারা কেন ছন্দ নিয়ে অতো বাড়াবাড়ি করতেন। ছন্দ তার ইনস্কেপ্।

রবিশঙ্কর 'হরফ', 'ফ্রেজ', 'ইডিয়ম', 'বাক্য' 'বোল'-এর রাজা। এমন স্পষ্ট হরফ, ফ্রেজ, বাক্য (সেণ্টেন্স) আমি জীবনে শুনিনি। এত স্পষ্ট, যেন মনে হয় রাগিণীর পটভূমি থেকে বেরিয়ে এসে, চোখের সামনে দাঁড়ালো। এই বেরিয়ে এসে দাঁড়ানো আধুনিক আর্টের একটি প্রধান লক্ষণ। এতে একটু পশ্চিমী আমেজ থাকে নিশ্চয়— রবিশঙ্কর পশ্চিমের অনেক ভালো জিনিস হজম করেছেন। তাঁর বাজনা শুনলে আমার পূর্ব বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, সঙ্গীত মনের অন্য স্তরের ভাষা। সাহিত্য ছাড়া অন্য, তবু ভাষা। তার হরফ, ফ্রেজ, ইডিয়ম, বাক্য থাকবেই ! এই নক্সা ততটা ছন্দপ্রাণ নয়, যতটা ভাষাপ্রাণ। অবশ্য দু'জনের সব গুণই আছে, আমি কেবল আমার কাছে যতটুকু বিশেষত্ব মনে হয় তাই ভাবছি। রবিশঙ্করের ভাব, এক্সপ্রেশন, সিণ্ট্যাক্সের ওপর বেশি নির্ভর করে। তাই একটু বেশি ইণ্টেলেকচুয়েল মনে হয়। তার বাজনা আমাকে একটু বেশি মন দিয়ে শুনতে হয়। শুয়ে শুয়ে ভাবি, কি করে প্যারাগ্রাফ তৈরি করলে। দু'জনের কেউই 'ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট' নয়, দু'জনেই স্রষ্টা— নতুন রাগ সৃষ্টির দিক থেকে এবং পুরাতন রাগের বিকাশের দিক

থেকে। এটা মস্ত মিল। তার চেয়েও বড় মিল যে, তারা একই ঘরানার দুই শাখা।

বিলায়েৎ-এর কথা পৃথক। এক বছরেরও ওপর তার বাজনা শুনিনি—খুবই শুনতে ইচ্ছা হয়। তার পিতা আমার বন্ধু ছিলেন, আমাকে 'ভাই সাহেব' বলতেন। তার পিতামহের বাজনাও আমি একাধিকবার শুনেছি। তাঁর ঘরানার সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধের প্রয়োজন। বাজনায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পৃথিবীর সব সঙ্গীতের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারে এই বিলায়েৎ, এই আলি, এই রবির কৃপায়। ধন্য এমদাদ-এনায়েৎ, ধন্য উজীর-আলাউদ্দীন। ঘরানার মধ্যে একসঙ্গে ঐক্য ও বৈচিত্র্যের সমাবেশ! 'আধুনিক' সঙ্গীত এর কাছে বড্ডই 'পার্ভেন্যু' ঠেকে। এটা আভিজাত্যের কথা নয়, জীবনধর্মের মূল সূত্র।

সেই কতদিন আগে এডমণ্ড বার্ক পড়েছিলাম—আবার পড়তে মন চায়। সঙ্গীত-আলোচনা কথার মারফত হয় না ঠিক। তাই ঠিক ঠিক লিখতে পারছি না।

১৯-১-৫৬

দিল্লী গেলাম কাজে, লাভ হলো ছবির একজিবিশন দেখে। শেরগিল ও রবীন্দ্রনাথের বহু ছবি একত্রে দেখতে পেলাম। এক-

দিন আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ একজন বড় চিত্রকর ছিলেন, ভারতবর্ষের আধুনিক চিত্রকলার তিনিই গুরু এবং যে-কথা আমি বহু পূর্বে বলেছি, 'Tagore, a Study' বই-এ চিত্র-কলার ভিতর দিয়ে তাঁর মনের এমন সব অংশ রূপায়িত হয়েছে যা কবিতায় হয়নি এবং যাদের সন্ধান না জানলে রবীন্দ্রনাথের সম্যক প্রতিভা কখনই বোঝা যাবে না। এ যেন ভিন্ন জগৎ, এ-জগৎ কমনীয়তার, নমনীয়তার, লিরিক মাধুর্যের নয়। এ-জগৎ অন্ধকার ভেদ করে জোরে বেরিয়ে আসছে, তাই ঘন রঙ। এখনও রূপ পায়নি, তাই বীভৎস, খামখেয়ালী, ভয়ঙ্কর, জৈব। শক্তি তার নগ্ন—denizens of the deep। মেয়ের মুখ পুরুষের মুখ থেকে, মানুষের মুখ জন্তুর মুখ থেকে তখনও বিভিন্ন হয়নি। হাঁ, ফুল রয়েছে। সেটাও আদিম, বুনো, মালির তৈরি কাটা ফুল নয়। এ ছবিতে ভয়ঙ্করের ছায়া রয়েছে। হয়তো অতোটা মার্জিত সভ্যতা, অতোটা বৈদগ্ধ্যের ক্ষতিপূরণ। কিংবা হয়তো প্রতিভার মূলে ভয়ঙ্করের ভিত্তি থাকে। রবীন্দ্রনাথ শক্তিপূজার পূজারী ছিলেন না। কিন্তু শক্তিকে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, এই দেখে আশ্চর্য লাগে। তাই বা লাগবে কেন? এইটেই তো প্রতিভার পক্ষে স্বাভাবিক। অনেক প্রমাণ মনে পড়ছে। দান্তের নরকদর্শন থেকে দা ভিঞ্চির নোটবুক, ফাউস্টের দ্বিতীয় ভাগ।

অমৃতা শেরগিল-এর অভিব্যক্তিটি নিতান্ত মধুর। প্যারিস থেকে গোরখপুর। একাডেমিক পদ্ধতি ছাড়বার সাহস পেলেন দেশের মাটি থেকে। শেষ দিকের ছবিতে গভীরতা আসছিল। বেঁচে থাকলে হয়তো যামিনীদা'রই মতন মাটির ভাঁড়ে রঙ চড়াতেন। হুসেনের নতুন ছবিগুলিতে ডিজাইন আছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি

চোখে পড়লো তাঁর রঙ-এর জ্ঞান। সত্যই অপূর্ব। সতীশ গুজরালের ছবি খুব শক্তিশালী। ঢঙ না হয়ে যায়! যে সব ছবি পুরস্কার পেয়েছে, তার মধ্যে দুটির নক্সা পুরাতন হলেও নতুনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। খানকয়েক ছবি ছেড়ে দিলে সব ভালো ছবিগুলিই রিয়ালিজম বর্জন করেছে। ভাস্কর্যের নমুনা কম—শঙ্খ চৌধুরীর একটি কাজ সত্যই উচ্চ শ্রেণীর। আবার দেখতে হবে। অনেক দেখবার পর তবে ভাবগুলো থিতোয়। আমার সামনে যামিনীদা'র একটা গলির ছবি রয়েছে। দেখে আশ মেটে না—যতই দেখি, ততই নতুন মনে হয়। অর্থাৎ ছবিটি ভালো। সীজানের ছবি নাকি বহুবার দেখলে তবেই হৃদয়ঙ্গম হয়। গভীরতার স্তর বহু। ধাপে ধাপে নেমে যাও। কিন্তু আবার ফিরে আসা চাই।

এইবার বোধ হয় আমরা আধুনিক চিত্রের মর্ম ধরতে শিখছি। বন্ধু কপুর তার বাড়িতে গার্দে বলে একজন নতুন চিত্রকরের ছবি দেখালে। পুরোপুরি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট নয়—তবে ঐ জাতের। রঙ-এর সমাবেশ খুবই ভালো লাগলো। এতদিনে একটা কিছু হচ্ছে তা হলে। তবে দিল্লী, তবে জয়পুর হাউস ঐ যা। বরদা ও মুকুলবাবু একটা নতুন বাড়ি না করে ছাড়বেন না। আমাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের আগ্রহ দেখে মন খুশি হলো। তাঁরা একটা মুঘল মিনিয়েচারের বই প্রকাশ করেছেন। যেমন ছাপা, তেমনই গেট-আপ। ভাবতেই পারিনি যে দেশী ছাপা।

সব দিক থেকেই জীবনের স্পন্দন অনুভব করছি। স্বদেশী যুগের তীব্রতা হয়তো নেই—কেমন করেই বা থাকবে—ওটা ছিল বাংলা, এটা সমগ্র ভারত—তার ওপর, বয়সের মরণ-টান যাবে কোথায়?

জাকির সাহেব চিত্রকলার ভক্ত। কেবল বলছেন একটা আর্ট

গ্যালারি করতে। আমাদের লাইব্রেরীতে অনেক ভালো ভালো আর্ট-এর বই ও ফোলিও আছে। ছেলেদের বেশি আগ্রহ নেই—অথচ প্রতি বৎসর একজিবিশন হয়। ও জন্যে আর খাটতে পারি না। নিজে নিজে দেখি, তাতেই মন ভরে ওঠে। তবে ব্যাপারটা কম্যুনিকেশন-এর। আনন্দ না ভাগ করলে সত্যকারের উপভোগ হয় না। আমি মিস্টিক নই।

২০-১-৫৬

ইণ্টার-ইউনিভার্সিটি বোর্ডের বাৎসরিক বৈঠক হলো। দেশের প্রায় সব ভাইস-চ্যান্সেলারই এসেছিলেন, পুনা ও বোম্বাই ছাড়া। শ্রী রাজ্যপাল মুন্সী উদ্বোধন করলেন। ইংরেজী ভাষা ত্যাগ করলে দেশের ক্ষতি হবে তাঁর মত। সভাপতি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারেরও সেই কথা। শ্রোতারা খুব খুশি। আনন্দের একটা গোপন উৎস হলো হিন্দীর বিপক্ষ মনোভাব। এক উত্তর প্রদেশ, বিহার আর মধ্য প্রদেশ ছাড়া প্রায় সর্বত্র, বিশেষত এই আলিগড়ে সেটা প্রকট। দোষ দিই না, যে-হিন্দীর প্রচলন হচ্ছে, যে-হিন্দীর প্রসার হচ্ছে ও যে-ভাবে হচ্ছে তাতে মন যায় চটে। কিন্তু সমাজতত্ত্বের দিক থেকে একটা কথা মনে ওঠে। এই বিপক্ষতার পিছনে একটা শ্রেণীগত স্বার্থ লুকিয়ে আছে। সেই 'আমরা ও তাঁহারা'র বিবাদ। আমরা, ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্য-

বিত্তেরা, চিরকালই ওপরে থাকবো, আর তাঁরা, ইংরেজী না জানা, হিন্দীভাষী (এ অঞ্চলের কথাই বলছি), নিম্ন শ্রেণীরা সমাজের নিচেই থাকবেন, এ-অবস্থা বেশি দিন চলবে কি ? ইংরেজীর মাধ্যমে বেশি খবর (ইনফর্মেশন) পাওয়া যায়, কিন্তু জ্ঞান ? সে-জন্য চাই চিন্তা এবং সে-চিন্তার জন্য নতুন সংজ্ঞা (টার্মস), নতুনভাবে সাজানোর প্রয়োজন। এ কাজগুলি ইংরেজী ভাষায়, পরের ভাষায়, বই-এর ভাষায় হয় না। ব্যাপারটা দাঁড়ায় কেবল মাতৃভাষায় নয়, জনগণের মুখের ভাষায়। ইংরেজী ভাষা জনগণের মুখের ভাষা হতে যতদিন লাগবে, তার চেয়ে অনেক কম দিন লাগবে হিন্দী জনগণের মুখের ভাষায় পরিণত হতে। ভাষার তর্কে চিন্তার সঙ্গে জনগণের ব্যবহারিক জীবনের তথা ভাষার সম্পর্কটির বিচার একেবারেই হচ্ছে না। টেকনিক্যাল শব্দের কি হবে ? সত্যেন (বোস) তার একটি চমৎকার উত্তর দেয়—হিন্দু দর্শনের টেকনিক্যাল শব্দের ব্যাখ্যাই তো এতদিন আনন্দের সঙ্গে করে আসছি ও তাতে গৌরববোধও করেছি, তবে বিদেশী টেকনিক্যাল শব্দের প্রতিশব্দের ব্যাখ্যায় আপত্তিটা কি ? আমি আর একটু বলি : ইকনমিক্স-এ শত শত টেকনিক্যাল শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে—যে নতুন একটি শব্দ চালু করাতে পারলে সেই পণ্ডিত, ধুরন্ধর। অবশ্য নতুন শব্দ প্রয়োগের মধ্যে একটা প্রিসিশনের দিক আছে নিশ্চয়। কিন্তু এই সব নতুন কথার আভ্যন্তরীণ প্রত্যয়টি কি আমাদের কাছে বাস্তব ? আমি ডজন ডজন নতুন শব্দের দৃষ্টান্ত দিতে পারি যার অর্থ মাত্র আক্ষরিক, শাব্দিক মাত্র, বাস্তব নয়, সৎ নয়। অথচ এই চলছে, এরই নাম পাণ্ডিত্য! এক প্রকার হিংটিং ছট মাত্র। ফল ? এ কান দিয়ে শোনা আর ও-কান দিয়ে বেরোনো। ফল ? দেশ চালাচ্ছে সরকারী লোক যারা অর্থনীতির অধ্যাপকবৃন্দের চেয়ে

দেশের সঙ্গে যোগ রাখে, যোগ রাখতে বাধ্য। আমি একটা ছোট জেলায় থাকি, অর্থনীতির বহু নতুন বই ও পত্রিকা পড়ি, কিন্তু আমি জানি যে, তহশীলদার-কানুনগোরা জেলার লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানে। তারা linear equation, production co-efficient counter-varling power, long-term projection, indifference curve, physica l balance, Domar-Harrod equation. Cobb-Douglas theorem-এর খবর রাখেন না, কিন্তু পয়দা বারীর সব খব ই তাঁরা জানেন, বোঝেন। Consumption-schedule তাঁরা তৈরি করতে পারেন না, কিন্তু সালিয়ানার খরচ-খরচা তাঁদের নখদর্পণে। কারণ তাঁরা মাটির সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের ভাষা জনগণের ভাষা। আমরা পৃথক, আমাদের ভাষাও পৃথক—অতএব পৃথকই থাকা উচিত—যুক্তিটা এই ধরনের, মনে মনে, মুখে নয়; তাই কারুর মুখে ইংরেজী ভাষার ভারতীয় প্রয়োজনীয়তা শুনলে হাততালি বেজে ওঠে।

২২-১-৫৬

জীবনে কত ভাইস-চ্যান্সেলারই না দেখলাম। আমার কাছে আশুবাবুই দেশের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার ও শেষ। অনেক ভালো পণ্ডিত ভাইস-চ্যান্সেলার দেখেছি। জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী, আচার্য নরেন্দ্র

দেব, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, অমরনাথ ঝা, স্যার মাইকেল গয়ার, জাকির হোসেন—কিন্তু আশুবাবুর জাতের নয়। অনেক ঘটনা মনে পড়ছে—দুটি বিশেষ করে। এই দুটো সংযুক্ত তাই বোধ হয়। অধ্যাপক সতীশ রায়, আশুবাবুর ভগ্নীপতি, অত্যন্ত স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। তিনি নাকি আশুবাবুকেও ভয় করতেন না। তেমনই পরীক্ষক হিসেবেও তাঁর বদনাম ছিল—তাঁর হাত দিয়ে ফার্স্ট ক্লাশ গলতো না। আমি সেবার ইকনমিক্স-এ এম-এ. দিচ্ছি। দিনকয়েক পূর্বে বাবা মারা গিয়েছেন, মাথাটা খালি হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, পাশের বাড়ির উকীলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইকনমিক্স-এ দিতে যাচ্ছ, বেশ, বেশ—ভারি শক্ত বিষয়, পরীক্ষক কে আজকের পেপারে? সতীশ রায় নয়তো? 'জানি না মশাই, তবে শুনেছি তিনি খান দু'-এক পেপার দেখবেন।' 'তবেই হয়েছে—পরীক্ষা দিও না।' পরে শুনেছিলাম ভদ্রলোক সতীশবাবুর কাছে একাধিকবার ফেল হয়েছিলেন। যাই হোক পরীক্ষা তো দিলাম। অর্ধেক প্রশ্ন যথামতো ছেড়ে দিলাম। শেষ-দিনে ফিরে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের হায়েত খাঁ লেন-এর বাড়ির উঠোনে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। 'কিরে, কেমন হলো,' 'পাবো সেকেণ্ড ক্লাশ, পাওয়া উচিত ফার্স্ট।' যাই হোক, মাস দেড়েক পরে একদিন দুপুর বেলা কে কড়া নাড়লো—দেখি এক প্রায় বৃদ্ধ ভদ্র-লোক হাতে ছাতা ও ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। 'তোমার নাম ধূর্জটি?'

'আজ্ঞে হাঁ, আপনি?'

'আমার নাম সতীশ রায়।'

'তুমি অমুকদিন বিকেল সাড়ে চারটায় আমার সঙ্গে লাইব্রেরীর পাশের ঘরে দেখা করবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'একটু দরকার আছে, আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবো।'

ঠিক সময় গিয়ে হাজির—সতীশবাবু আশুবাবুর ঘরে নিয়ে গেলেন। খালি গা', পাশে জ্ঞানবাবু দাঁড়িয়ে, সামনে রেকাবীতে সন্দেশ। সতীশবাবু বললেন, 'এই ধূর্জটি, কি বলবার বলো।'

'অঃ তুই!'

তার আগে পরিচয় ছিল।

'তোকে পড়াতে হবে জুলাই থেকে—এখন থেকে তৈরি কর—রোজ লাইব্রেরীতে আসবি, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়বি—দেখিস ফাঁকি দিসনি।'

'আজ্ঞে না।'

'ভেবেছিস কি—অক্সফোর্ড—কেম্‌ব্রিজ সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই ফার্স্ট ক্লাশ পাবি? যা পড়গে যা।'

কিছুদিন পরে পরীক্ষার ফল বেরুলো—আমি তখন এলাহাবাদে। কলকাতায় ফিরলাম চাকরিতে যোগ দেবার জন্য। ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছিলাম—কিন্তু আশুবাবুর কৃপায়। শুনলাম কিছু নম্বর কম ছিল—কমিটিতে আশুবাবু বলেছিলেন, 'ওর ফার্স্ট ক্লাশ পাওয়া উচিত।'

রোজ লাইব্রেরী যাই, আর পড়ি। একদিন সন্ধ্যাবেলা এমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে চোরাবাগানের দিকে গান শিখতে যাচ্ছি—পথে পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে দেখা, বললেন, 'তাই তো হে! আমরা জানি তুমি আসছো, কিন্তু আজ বিকেলে কর্তা আরেকজনকে বসালেন। একবার দেখা করে এসো।' মনটা গেল বিগড়ে। যাই হোক, ভোর বেলা হাজির। 'কি হলো স্যার?'

'ওরে শোন, তুই সংস্কৃত জানিস?'

'আজ্ঞে না।'

'নিশ্চয়ই জানিস, বামনের ছেলে, ভাটপাড়ায় বাড়ি না তোর ?'

'আজ্ঞে না, পাশের গ্রামে।'

'ঐ একই কথা। তুই সংস্কৃত কলেজে এখন ঢুকে পড়, পরে নিয়ে আসবো আমার কাছে। আমার টাকা নেই জানিস তো ?'

'আমি আপনার কাছে কাজ করতে চাই। আপনি তো আমাকে কথা দিয়েছিলেন।'

'সে-কথা রাখবো, এখন নয় !'

তারপর মিনিট খানেক গম্ভীর থেকে বললেন, 'তুই যদি জানতিস কেন ওকে চাকরি দিলাম···তোর তো হাঁড়ি চড়ানো নেই !'

তাঁর চোখ ছলছল করে উঠেছিল। নমস্কার করে চলে আসছি হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আমি লাইব্রেরীতেই না হয় কাটাতাম !' বাঘের থাবাটা পিঠে পড়লো। চাকরি তিনি আমাকে দিতে পারেননি, দেননি নয়। তখনও রাগ হয়নি, এখনও অভিমান নেই। কিন্তু সেই দিন বুঝেছিলাম কত বড় হৃদয় মানুষটার। তাঁর বিপক্ষে অনেক কথা শুনতাম, পড়তাম। কিন্তু সে-সব দোষই নয়, অতো বড় হৃদয় অস্বাভাবিক, তাই আমরা সাধারণ লোকে সহ্য করতে পারতাম না। বিদ্বান হোন আপত্তি নেই, ভালো জজ হোন আপত্তি নেই, কিন্তু চাপরাসীকে মানুষ ভাবা, যার হাঁড়ি চড়ানো তার হাঁড়ি চড়াবার সুযোগ দেওয়ার জন্য নিজের কথার খেলাফ করা—এগুলোর ক্ষমা লোকে করবে কেন ?

এই ঘটনার পরিশেষ আছে আরেকটি ঘটনায়। লক্ষ্ণৌ-এ শীঘ্রই চাকরি পেলাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে পড়ছি। ঘাড়ে থাবা পড়লো। ফিরে দেখি কর্তা।

'কিরে তুই লক্ষ্ণৌ গিয়েছিস ?'

"আজ্ঞে হাঁ—তবে লাইব্রেরীতে ছুটি পেলেই আসি।'

'আমার লাইব্রেরীতে কিছু নেই, টাকা নেই, কেউ দেয় না, দেবে না, এক হাতে সকলের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। তোকে বুঝি রাধাকুমুদ নিয়ে গেল?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'সকলেই ছেড়ে চলে যাচ্ছে। Rats leave first when the ship sinks.'

'But Sir I was never on board.'

'ওরে আমি কি চাই যে, তোরা সব চলে যাস? কিন্তু কি করবো বল? কাউকে মাইনে দিতে পাচ্ছি না—ক'মাস হয়ে গেল, তারা কি করে খাচ্ছে কে জানে! আশ্চর্য হয়ে যাই তাদের loyalty দেখে।'

খানিক পরে বললেন, 'ঠিকই করেছিস।'

এই ঘটনার পরও আরো একটি ছোট্ট ঘটনা আছে, লক্ষ্ণৌ-এর স্টেশনে কনভোকেশন এড্রেস দিয়ে ফিরছেন, স্টেশনে গিয়েছি।

'কিরে, কবে আসছিস?'

'যেদিন ডাকবেন।'

'তোর মন বসেছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে?'

তাঁর চোখের আলো বদলে গেল। Rats leave first when the ship sinks—

আমার ইউনিভার্সিটি—আমার প্রোফেসার—আমি মাইনে দিতে পাচ্ছি না—আমার প্রতি লয়্যালটি, তারা কেমন করে খাচ্ছে. চোখ ছলছল—কোন্‌টা প্রধান? অহংজ্ঞান, না হৃদয়ের ঐক্য সাধন?

নিশ্চয়ই শেষেরটা। এই ধরনের emotional indentification গান্ধীজীর ছিল, নেপলিয়নের ছিল, লেনিনের ছিল, আশুবাবুর ছিল। সত্য কথা এই : তাঁর মৃত্যুর সংবাদে যতটা আঘাত পাই ততটা আঘাত আমি আর কোনো মানুষের মৃত্যুতে পাইনি। কেন এমন হয়েছিল এখনও ঠিক জানি না। যেমন হৃদয়, তেমনই তেজ, তেমনই বুদ্ধি, তেমনই কর্মদক্ষতা—এমন সমাবেশ দুর্লভ। নিশ্চয়ই, কিন্তু আরো কিছু। সেটা কি? ক্যারিসমা? তার উপাদান?

আচার্য নরেন্দ্র দেবকে বাঙালী কেবল পলিটিশিয়ান, সোশিয়ালিস্ট দলের নেতা হিসেবেই জানে, তাও বেশি নয়। তাঁর নানা দিক দেখবার ও জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মানুষ হিসেবে তিনি যাকে বলে লিবারেল; এমন কি অনেকের মতে লিবারেলের মতনই দুর্বল। নির্মম সিদ্ধান্তে আসতে অক্ষম, অপর পক্ষের যুক্তির মান্য দিতে সদা তৎপর, অন্যের অপদার্থতা জানা সত্ত্বেও ক্ষমাশীল, ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে values কিংবা principles নিয়ে মারামারি সেখানে তিনি অচল অটল। তিনি বলেন মূলতঃ তিনি ডিমক্রেট। মহাত্মাজী তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, বোধ হয় একমাত্র তাঁরই জন্য একবার মৌনব্রত ভঙ্গ করেছিলেন, তবু জীবনে ভায়লেন্সের স্থান ও সামাজিক অভিব্যক্তিতে শ্রেণী-বিরোধের অস্তিত্ব নিয়ে আচার্যজী তাঁর কাছ থেকে সরে এলেন। লোহিয়াকে তিনি পুত্রের মতন ভালোবাসেন, জয়প্রকাশ ও অশোক মেটাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, তবু লোহিয়ার প্রতি কঠিন হতে তাঁর সঙ্কোচ হলো না, জয়প্রকাশের সঙ্গে ভূদান ও সর্বোদয় ও অশোক মেটার সঙ্গে

সরকারী সহযোগ নিয়ে মতভেদ হ'লো। সোশিয়ালিস্ট সাহিত্যে অমন সুপণ্ডিত দেশে নাই। লেনিন তিনি তন্নতন্ন ক'রে পড়েছেন। স্ট্যালিনিজম তিনি বরদাস্ত করেননি, কিন্তু একদিনও তাঁর মুখে ঘৃণাসূচক মন্তব্য শুনিনি। সাধারণত ভারতীয় সোশিয়ালিস্টদের স্বাভাবিক এনার্জি সোভিয়েট, কম্যুনিজম ও দেশ-বিদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি ঘৃণায় এতটাই খরচ হয় যে, দেশকে বুঝতে, ভাবতে, নতুন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে প্রায় কিছুই বাকী থাকে না। আচার্যজীর কিন্তু তা নয়। কম্যুনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপ তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন—এবং অনেক ভদ্রলোকই ক'রে থাকেন—তবু ঘৃণার কোনো লক্ষণ তাঁর বাক্যে শুনিনি, কর্মে দেখিনি।

আমার কাছে তাঁর প্রকৃত মূল্য তাঁর মনুষ্যত্বে এবং তাঁর পাণ্ডিত্যে—দুই-এর অপূর্ব মিলনে। বৌদ্ধদর্শনে তিনি মহাপণ্ডিত, প্রায় সব মূল গ্রন্থই তাঁর পড়া। 'বৌদ্ধধর্মের রূপরেখা' বইখানি এখনও ছাপাখানায় পড়ে আছে—বেরুলে দেশের অত্যন্ত উপকার হবে। ঐ বিষয়ে তাঁর একাধিক বক্তৃতা শুনেছি—অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুচিন্তিত বক্তৃতা। এশিয়ার নব-জাগরণ ও জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তাঁর একটি ছোট লেখা আছে। অনেকেই জানে না। জেলে লেখা। কিন্তু আমি ঐ বিষয়ে ছয় কি সাতটি বক্তৃতা শুনি। পারফেক্ট, যেমনই তথ্য, তেমনই তত্ত্ব, তেমনই সাজানো, তেমনই ভাষা। আচার্যজীর মতন একত্রে হিন্দী, উর্দু ও ইংরেজী বক্তা দেশে নেই। দেড় ঘণ্টা তাঁর দম—এবং তার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা সত্যই অতুলনীয়।

ভাইস-চ্যান্সেলার হয়ে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টোন' বদলে দেন। প্রতিষ্ঠানটি নানা কারণে উচ্ছন্ন যাচ্ছিলো। তিনি অল্পদিনে টেনে

তুললেন। ছেলেদের নিয়ম ভঙ্গের প্রবৃত্তি বদলে গেল, অধ্যাপক-বৃন্দের আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা, অধ্যয়ন বৃত্তি, গবেষণার প্রতি ঝোঁক ফিরে এলো। গত দশ বছরে যা হয়নি তা আরম্ভ হলো। সকলে বুঝলে এটা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার, গুরুশিষ্য, জনসাধারণ-শিক্ষক শ্রেণীর যোগস্থল। বুকের ওপর থেকে জগদ্দল পাথর যেন সরে গেল, সকলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ক্লাব, সমিতি, বক্তৃতা, প্রদর্শনী—একটা না একটা কিছু রোজ লেগেই আছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের এক বৈঠক করেছিলেন। পুরো এক সপ্তাহ চলেছিল। বিষয় ছিল 'ভারতীয় সাহিত্যে সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষণ ও বিচার।' দিল্লীর অনুরোধে তিনি লক্ষ্ণৌ ছেড়ে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে গেলেন। বহুদিন তিনি কাশী বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ছিলেন। বিদ্যাপীঠ তাঁর মানসপুত্র—একত্রে দেশাত্মবোধ ও স্কলারশিপ চলেছে সেখানে—কর্মের সঙ্গে পাণ্ডিত্য সেখানে কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। কিন্তু এবার যেখানে গেলেন সেটা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। অসংখ্য কাজ, অসংখ্য দোষ, অসংখ্য সুযোগ—কাজের চাপে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শেষে ছেড়ে দিলেন।

আমার মতে তাঁর মতন স্কলার ও সজ্জন ব্যক্তির পলিটিক্স থেকে দূরে থাকাই ভালো ছিল। তা তিনি মানেন না—কিন্তু আমার ও অন্যান্য অনেকের তাই বিশ্বাস। তিনি একজন ভারতরত্ন, দিলে হয়তো নেবেন না, তবু, আনঅফিশিয়লি তাই। জাকির সাহেব সম্বন্ধে পরে লিখবো—এখন নয়, কারণ এখন তিনি আমার ভাইস-চ্যান্সেলার। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের এই বিষয়ে কৃতিত্বের একটি দৃষ্টান্ত জানি। ১৯৪২ সালে সরকার হিন্দু ইউনিভার্সিটি তুলে দিতে চান। তাঁর একটি মাত্র কথায় সম্ভব হয়নি।

২৬-১-৫৬

বোম্বাই-এ গোলমাল বেধেছে। গুলী চলেছে শুনেছি। বিশ্রী ব্যাপার! যা পড়লাম তাতে মনে হয় বোম্বাই মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত এবং তারই রাজধানী হওয়া উচিত। অবশ্য সব খবর আমি জানি না।

দুটি কথা মনে হচ্ছে। (১) ঝগড়াটা ঠিক Linguism-এর ব্যাপার নয়—অর্থাৎ মারহাট্টা বনাম গুজরাটি নয়। নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে হিন্দীর প্রসার বাড়ানো হচ্ছে, তাই প্রাদেশিক ভাষার ওপর সেই ভাষা-ভাষীর নজর বেশি পড়ছে—ভয় হচ্ছে যে, মাতৃভাষা নষ্ট হবে। সেই ভয় প্রকাশ পেলো অন্য রূপে, গুজরাটিদের বিপক্ষে, সরকারের বিপক্ষে, আইন-কানুনের বিপক্ষে। ফলে মনে হচ্ছে যেন কেউ ভারতের ঐক্য চাইছে না, ঐক্য সাধনে বাধা দিচ্ছে। তা নয়। (২) ভাষা নিশ্চয়ই প্রাণের বস্তু, কিন্তু প্রাণ-ধারণের জন্য, প্রাণ পূরণের জন্য, প্রাণ প্রসারের জন্য অন্ন চাই, অর্থ চাই। ভাষা প্রাণ, কিন্তু অন্ন ব্রহ্ম। সেই অন্নের সন্ধান জনগণের কাছে পৌঁছয়নি। পৌঁছয়নি বলেই পাকিস্তান সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের চিন্তা এখনও র‍্যাশন্যাল-ইকনমিক নয়। অন্য ভাষায়, আমাদের প্ল্যানিং আমাদের মনকে অধিকার করেনি। ওপর থেকে এসেছে তাই। যদি নিচের থেকে উঠতো তবে প্রাণ ব্রহ্মে লীন হতো—ভাষার ঝগড়া ছেলেমানুষী ঠেকতো। এটা প্ল্যানিং-এর কমতি।

২৮-১-৫৬

শিক্ষিত-বেকার সমস্যার কথা উঠলো। খবর এই: দেশে ম্যাট্রিকুলেশন ও তার ওপর শিক্ষাপ্রাপ্ত বেকারের সংখ্যা আপাতত সাড়ে পাঁচ লাখ। (মোটে?) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার শেষে ঐ ধরনের বেকার আরো সাড়ে চৌদ্দ লাখ বাড়বে; অর্থাৎ প্রায় বিশ লাখ হবে। এটা আদমসুমারীর হিসেবে। কাজ (এমপ্লয়মেণ্ট) ঐ দ্বিতীয় যোজনার ফলে তৈরি হবে দশ লাখ পাবলিক সেক্টরে ও দু' লাখ প্রাইভেট সেক্টরে। (যদিও প্রাইভেট সেক্টরের ইনভেস্টমেণ্ট ঐ সময় পাবলিক সেক্টরে ইনভেস্টমেণ্টের আড়াই গুণের বেশি হবে। ব্যাপারটি মজার।) ইতিমধ্যের অবসরে, মৃত্যু প্রভৃতি বাদ দিয়ে তবু সাড়ে পাঁচ লাখের ওপর শিক্ষিত বেকার জমা হবে পাঁচ বছর পরে। অর্থাৎ এখনও পাঁচ লাখ তখনও পাঁচ লাখ? যথাপূর্বম তথাপরম? বা রে প্ল্যান! অবশ্য যদি না তাদের জন্য ইতিমধ্যে নতুন এমপ্লয়মেণ্ট তৈরি করা হয়—যথা কুটিরশিল্প ইত্যাদি। কুটিরশিল্পে মাত্র দেড় লাখ এসে যাবে এই হিসেবে। আর সব কো-অপারেটিভ, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল, ট্রান্সপোর্ট, আরো কত কি! খরচ হবে ১৩০ কোটি টাকা সাড়ে পাঁচ লাখ বেকারের জন্য। অর্থাৎ মাথা পিছু পাঁচ বছরে আড়াই হাজার টাকা। ছোট শিল্পের হিসেবে ৮৪ কোটিতে দেড় লাখ কাজ— অর্থাৎ দু' হাজার আশি টাকা। এ হিসেবে বেকার সমস্যা সমাধান হয় না আমার মতে। কুটিরশিল্প, ছোট শিল্প, কো-অপারেটিভের

এমপ্লয়মেণ্ট পোটেনশিয়ালের পাকা খবর কারুর কাছে নেই। তা ছাড়া, যে পাঁচ লাখ সেই পাঁচ লাখ থাকলে মালটিপ্লায়ার এফেক্টের অর্থ হয় না। আপাতত আমার মনে একটা ভীষণ খট্‌কা থেকে গেল। কো-অপারেটিভ অনুষ্ঠানের প্রসার শুনলে হাসি পাবে যারা জানে তাদের প্রত্যেকের। আমি ঐ ডিপার্ট-মেণ্টের বহু লোককে চিনি, দু' চারজন ছাড়া কেউ নিজের কাজে আস্থা রাখে না। আরো কড়া মন্তব্য শুনেছি ঐ ডিপার্টমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত উচ্চকর্মচারীদের মুখ থেকে। তবু এই পরিস্থিতিতে অন্য কি সদুপায় হতে পারে বুঝি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শহুরে ছাত্ররা গ্রামে কি ছোট শহরে গিয়ে কো-অপারেটিভ খুলবে? মনে তো হয় না। তবে সেকেণ্ডারী এডুকেশনের শিক্ষা যদি প্রকৃত হয়, সর্বাঙ্গীণ ও সম্পূর্ণ হয়, তবে সেই গ্রাম ও গণ্ডগ্রামের ছেলেরা শহুরে চাকরির দিকে ঝুঁকবে না। কিন্তু তা কি হবে? উত্তরপ্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার সমিতির সভ্য ছিলাম। ঐ প্রশ্নই আমাকে উত্যক্ত করতো।

আমাদের evil paradox হলো এই : আমরা গরীব তাই হেভি ইণ্ডাস্ট্রিজ আমরা চালু করতে পারবো না, অথচ আমাদের হেভি ইণ্ডাস্ট্রিজ নেই তাই আমরা গরীব। এই প্যাঁচ থেকে রাশিয়া কেটে বেরিয়েছে, টোট্যালিটেরিয়ানিজমের জোরে ততটা নয় যতটা ইকনমিক থিওরীর (মার্কসিজমের) প্রয়োগে। অবশ্য সেখানে অবস্থার দুর্বিপাক ছিল। (কার-সাহেবের মতে সেইটেই প্রধান।) আমার মতে দুটো মিশে ঐ হয়েছে। সে-তুলনায় আমাদের থিওরী নেই, অথচ খানিকটা দুর্বিপাক আছে। আমাদের কিছু কুড়িটা বিপক্ষের দল আক্রমণ করছে না। তবু দুর্বিপাক দারিদ্র্যের। সনাতন দারিদ্র্যে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়—যদি না

আমূল বিপ্লব হয়। আমাদের বিপ্লব শক-থেরাপীর জাতের নয়। একটু মিঠে ছিল। তাই মিক্সড ইকনমি। ঐ কথাটিকে দেশ থেকে তাড়াতে হবে। নতুন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পলিসির ব্যাখ্যান চাই। অবশ্য ভেতর-ভেতর বদলাচ্ছে—তবু খোলাখুলি পলিসি, স্টেটমেণ্ট চোখের সামনে থাকলে পরিবর্তনের সুবিধা হয়। দিক পাওয়া যায়। লাঠির যে-কোনো দিক ধরে সাপ মারা যায়, সরু দিকটা ধরলে অবশ্য সুবিধে হয়। কিন্তু লাঠির মাঝখানটা ধরলে লাঠি ঘোরানোই হয়—পাঁয়তাড়াই সার, সাপ মরে না। সাপ অর্থাৎ দারিদ্র্য ও তার জারজ সন্তান শিক্ষিত-বেকার সমস্যা। ভারতবর্ষের 'ইকনমিক সমস্যা' কেমন যেন জারজ-জারজ মনে হয়।

একটা নিজের সম্বন্ধে মজার খবর শুনলাম। পুণার ইকনমিক কন্‌ফারেন্স থেকে ফিরে এসে বন্ধু বললেন, 'ডি. পি. সাহাব, নতুন ইকনমিস্টরা সকলেই আপনাকে কন্‌ফারেন্সে চায়—এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা ভাবেন, আপনি সমাজতাত্ত্বিক।' এবং আরো কিছু সুখ্যাতি-অখ্যাতি। উত্তর দিলাম, 'আমার এক বন্ধু কাবুলে গিয়ে বাংলা গান, আর দেশে কাবলী গান শোনাতেন। যখন সমাজ-তাত্ত্বিকরা ধোঁয়া ছড়ায় তখন আমি ইকনমিস্ট—কারণ ইকনমিক্স-এ যতটা বুদ্ধির শাসন ততটা এক জুরিসপ্রুডেন্স ছাড়া অন্য কোনো সমাজবিজ্ঞানে নেই। আবার যখন ইকনমিস্টরা অঙ্কের ধোঁয়া ছাড়েন, তখন তাঁদের সামাজিক রিয়ালিটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমি কোনো লেবেল চাই না, প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। একটি জিজ্ঞাসু ছাত্র হিসেবেই জীবন কাটিয়ে এসেছি, এখনও তাই চাই। এই আমার গুরুদের শিক্ষা। আমি মানব-জীবনের ছাত্র, তাই অল্পবয়স্ক ইকনমিস্ট কেন, অল্পবয়স্ক সাহিত্যিক, চিত্রকর, গায়ক-বাদক সকলেই আমাকে সমগোত্রের ভাবে।

প্রাপ্তবয়স্কদের আমি অপমান করছি না—তাঁরা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তাঁরাও ছাত্র—তবে তাঁরা প্রধানত বিদ্বান ও বিশেষজ্ঞ, যা আমি মোটেই নই। এটা বিনয় নয়, সত্য ও সত্য দম্ভ। সে-দম্ভের অন্যদিক হলো এই : আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু, পরশু না হয় তরশু—অবশ্য তার পর নয়—প্রত্যেক যুবক-ইকনমিস্টকে আজ আমি সমাজ সম্বন্ধে যা খাপছা খাঁপছা বলছি, সেগুলোকেই গুছিয়ে নক্সা তৈরি করতে হবে। জীবন বাদ দিয়ে পাণ্ডিত্য আমি অনেক দেখেছি ভাটপাড়ায়—আর ইকনমিক জার্নালের পৃষ্ঠায়। ও-সব বুদ্ধির চালাকি জীবন ধরে ফ্যালে। অবশ্য আপাতত আমি ধোবিকা কুত্তা, না ঘরকা না ঘাটকা। কিন্তু এই কুত্তাগুলো খুব ভালো ওয়াচডগ হয়, অন্তত গাধাকে ঘরে পৌঁছে দেয় কাপড় সমেত।' এই ধরনের কথা কইলাম—ভাষা হয়তো একটু ভিন্ন ছিল!

এক বন্ধুর মুখে শুনেছি যে, প্রথম যুদ্ধের সময় রামবাগানে একটা গানের খুব চলন হয় : "শসা-কলা নয়তো যাদু যে চিরে-চিরে ভাগা দেবো।" জ্ঞানের ভাগকরণ বুদ্ধির বেশ্যাবৃত্তি এবং তথাকথিত বিশেষজ্ঞতা রক্ষিতার সামিল। বেশ্যাদের অপমান করছি না। আমি Women of the Street পড়েছি। তাদের জীবন নিজের গণ্ডিতে সম্পূর্ণ—অর্থাৎ তাই বিশেষজ্ঞ—তারা জীবনধারায় ভাসতে চায় না—এই হলো ঐ অদ্ভুত বইখানির সারকথা। সত্যিকারের বিশেষজ্ঞ আমাদের দেশে খুবই কম, ও-শ্রেণী নেই বললেই চলে। যা দু'-একজন দেখেছি তাঁদের আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি।

বাড়ি এসে আমেরিকান 'Poetry'-র নতুন সংখ্যায় ক্লদেলের কবিতার অনুবাদ পড়লাম। গঙ্গাস্নানের মতন মনটা শীতল ও

দেহটা শুদ্ধ হলো। অধ্যাপকের জীবনে রবীন্দ্রনাথ কেন এলেন বুঝি না। কিন্তু যখন এসে গিয়েছেন তখন তিনি থাকবেন, ক্যাল্ডরের An Expenditure Tax পড়বার পরও।

১-২-৫৬

মার্থা গ্রেহামের সঙ্গে কথাবার্তা রেডিওতে শুনলাম। কলকাতায় দৃষ্টান্ত সমেত বক্তৃতা শুনেছিলাম। বক্তৃতা দেন ভালো, কথাবার্তার ভঙ্গিটাও ভালো, কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। লাঠি ফিরে এসে নিজেদের ঘাড়েই পড়ছে। আমেরিকাকে আমরাই এই ধরনের আধ্যাত্মিকতা, মিস্টিসিজম শিখিয়েছি। এখন আমেরিকানরাই এসে জল ও ধোঁয়াসমেত যোগধর্মের ব্যাখ্যা শোনাচ্ছেন। এবং আমরা চেটে খাচ্ছি। আমেরিকানরাই একমাত্র দোষী নন—স্টেলা ক্র্যামরীশের ইণ্ডিয়ান আর্টের ব্যাখ্যা আমার কাছে অত্যন্ত ধোঁয়াটে লাগে। হয়তো আমিই একেবারে অ-ভারতীয়, 'নাস্তিক' হয়ে গিয়েছি। খুব সম্ভব তাই, কিন্তু কুমারস্বামীর রচনাই বা আমাকে অতো মুগ্ধ করে কেন? অবনীবাবু তো সহজ, সরল ভাষায় বোঝাতেন এবং আমরা বুঝতেও পারতাম। বোধ হয়,

দেখে শুনে আমার এই ধারণা হয়েছে, আমাদের চারুকলা, শিল্প, সাহিত্যের মূল্য ঐ সবের প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। প্রথমে অন্তত সেই হিসেবে দেখি—দেখা উচিত মনে হয়—পরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ক্রিয়াকাণ্ডের অবহেলা সম্পূর্ণ বোধের শত্রু। দর্শন নিশ্চয় আছে, সেটা কিন্তু পরে। Existence is prior to essence—তাই তো মনে হয়।

সম্ভবত আমি অন্যায় করছি। বক্তৃতা দিতে গেলে, গুরুগম্ভীর কেতাব, থিসিস লিখতে গেলে ঐ ধরনের বড় বড় কথার প্রয়োজন হয়। টিউটনিক প্রোফাণ্ডিটি, ইণ্ডিয়ান উইজডম, কেমন যেন ধাতে বসে না। প্রমথ চৌধুরীর শিক্ষা?

৩-১-৫৬

বীরেনের (বীরেন গাঙ্গুলী) নিখিল ভারতীয় ইকনমিক এসোসিয়েশনের আটত্রিশ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ পড়লাম। ছেঁদো কথা মোটেই নেই, তাজা, ঝরঝরে, মনটা জেগে উঠলো। নাম দিয়েছে 'Rethinking on Indian Economics'। নামটি সার্থক হয়েছে। অনেকদিন ধরে সে এই ধারায় চিন্তা করছে জানি। গুছিয়ে এই প্রথম লিখলে। অবশ্য শেষ কথা নয়—অনেক মন্তব্যের যাচাই দরকার। তবু আমার খুব ভালো লেগেছে।

বীরেন এগ্রিগেট-বিশ্লেষণের গলদ কোথায় ধরেছে ; পুরানো মার্জিনাল বিশ্লেষণে তার মন ভরছে না ; থিওরী ও প্র্যাকটিসের পার্থক্য তাকে পীড়া দেয় ; তথাকথিত ডাইনামিক বিশ্লেষণের মডেল-সৃষ্টির সঙ্গে বাস্তব জগতের পরিণতির মিল খুঁজে সে পায় না। অথচ এতদিনকার বিশ্লেষণ পদ্ধতি ছাড়তে সে পারে না। অনুন্নত দেশের অর্থনীতির যুক্তি যে একদম ভিন্ন মানতে তার বুদ্ধিতে বাধে। তাই সে cairness (কেয়ার্নস্)-এর নন-কম্পিটিং গ্রুপকে ভিত্তি করে এগিয়ে চলতে যাচ্ছে। সুখের খবর, একাধিক আধুনিক অর্থশাস্ত্রীরা ঐদিকে দৃষ্টিপাত করছেন। অতএব বীরেনের সমর্থন আছে। এই নন-কম্পিটিং গ্রুপের একটা ভাগ ধরে সে তার অভিভাষণ গঠনমূলক করে তুলেছে। সে-ভাগ হলো শহর (আর্বান) ও গ্রামের সেক্টর। বীরেনের কৃতিত্ব হলো এই দুটো সেক্টরের সম্বন্ধকে ফুটিয়ে তোলা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের আধুনিক বিশ্লেষণের সাহায্যে। স্টালিনের মতামত উদ্ধার করে সে অভিভাষণ শেষ করেছে। এই বিশ্লেষণে কোনো গোঁড়ামি নেই, সমাজতত্ত্বের সাহায্য নিতে সে ভয় পায়নি, যদিও সাবধানে নিয়েছে। আমার কাছে এই ধরনের নতুনত্বের সাহস অত্যন্ত মূল্যবান। অনেকে আবছা-আবছা, আলগোছে, খাপ-ছাড়াভাবে এই ধরনের কথা বলেনি তা নয়। মার্কস্ এক জায়গায় বলেছেন (ঠিক কোথায় ও কি ভাষায় মনে পড়েছে না) যে, এই শহর ও গ্রামের বিরোধ সমাজের প্রাথমিক বিরোধ। অন্যত্র কিন্তু লিখছেন যে, এই বিরোধ শ্রেণীবিরোধের নামান্তর। সে যাই হোক, terms of trade unilateral transfer, transfer-loss প্রভৃতি প্রত্যয়ের প্রয়োগ সুষ্ঠু হয়েছে।

এইদিক থেকে সেই গ্রামকে শহরের উপনিবেশ বলতে দ্বিধা করেনি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বীরেনের আইডিয়া ছড়াবে কি করে ? সংখ্যার সমর্থনও দরকার। দু' চার জায়গায় কিছু খটকা থেকে গেল— বিশেষত শ্রমিকদের পাওনার (ওয়েজেস) বেলা। মার্শ্যালের horizontal supply curve of labour (অর্থাৎ constant cost) কি করে গ্রাম্য শ্রমিকের বেলা বেশি প্রযোজ্য বুঝলাম না। সে লিখছে :

"In India the horizontal supply curve of labour in agriculture has prevented any relative rise in real earnings in agriculture."

—তাই কি ? 'curve' কি করে 'prevent' করে ? ওটা না হয় ভাষার দোষ, কিন্তু ব্যাপারটা earnings না wages ? Relative wages আর relative earnings কি এক বস্তু ? এ-সব ছোট আপত্তি নিশ্চয়। মোট কথা, খুব খুশি হলাম।

৪-২-৫৬

টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট একটি ঐতিহাসিক রচনার বিশেষ সংখ্যা বার করেছে। (৬ই জানুয়ারী ১৯৫৬)।

কেমন চমৎকার লেখে—পড়তে পড়তে হিংসে হয়। পরিচয় যদি আগের মতন চলতো, তবে হয়তো এই মানের লেখার প্রচলন হতো। বাংলায় 'ইতিহাস' নামে একটি ত্রৈমাসিক বেরোয়—এই সংখ্যার সমালোচনা হওয়া উচিত সেখানে। নিশ্চয় হবে। ফ্রান্স, ইটালি, রাশিয়া, জার্মানীতে ইতিহাস-রচনার ঢঙ কেমন বদলাচ্ছে, জানতে ইচ্ছে হয়। ভারতবর্ষে কি হয়েছে ও হচ্ছে মোটামুটি তার খবর পাই; অন্তত একটা আন্দাজ করতে পারি। প্রতুল (গুপ্ত) হেসে বলবে, অবশ্য গোপনে,—'কিছুই হচ্ছে না'। নিশ্চয়ই কিছু হচ্ছে—তার প্রমাণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখা হলো না। The dog did not bark, Watson। আর কিছু হোক আর না হোক, শিবাজী-আওরঙ্গজেবের বিবাদটা থেমেছে। এবার মহাগুজরাট ও মারহাট্টা এম্পায়ারের তুলনামূলক বিচার না হলেই বাঁচি। নীহার রায় তো বাঙালীর ইতিহাস লিখে ফেললে! বক্তিয়ারের পর বাংলার কি হাল-চাল হলো, জানতে ইচ্ছে হয়। কালীপ্রসন্নবাবু রাখাল-বাবুর পরও কিছু লেখা যায় নিশ্চয়।

ঢাকার বাংলার ইতিহাস কেমন যেন খাপছাড়া। কেমব্রিজ হিস্ট্রীর মডেল এখন অচল। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই তা অনুভব করছেন। টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট-এর এই সংখ্যায় তার উল্লেখ ছড়ানো। আমাদের মতন অনৈতিহাসিকদের কাছে সাধারণ ইতিহাসই কদর পায়। নরেন্দ্র সিংহমহাশয় ইকনমিক হিস্ট্রীর বই লিখছেন শুনে এলাম। তিনি নিশ্চয়ই পস্টানের প্রবন্ধটি পড়বেন ছাপাবার পূর্বে। তপন রায়চৌধুরী নতুন কি লিখবে কে জানে! প্রতুল গুপ্ত এবার পেশোয়াদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসুক। ওটা প্রায় অন্ধ গলি।

৫-২-৫৬

এডোয়ার্ড শীলস দিল্লী থেকে সকালে এসেছিলেন। শিকাগোর অধ্যাপক এবং টলকট পার্সন্স-এর সঙ্গে ভালো কাজ করেছেন। আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে থিওরিস্ট কম, তাঁদের মধ্যে এই দু'জন ও মার্টন এবং হোমানকে আমার পছন্দ। একটু জার্মান গন্ধ আছে, তা হোক। শীলস ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীরা কি ভাবছে, কি করছে, তাদের স্থান ও ক্রিয়া জানতে চান। সকালে অধ্যাপক হবীব, নুরুল হাসান, অমলেন্দুর (বসু) সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম—বিকেলে উঠন্ত বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে। ভদ্রলোক অনেক নোট নিলেন। আত্মতৃপ্তি হলো দু'কারণে: (১) আমার লক্ষ্ণৌগোষ্ঠীর সুখ্যাতি শুনে। তিনি বললেন, বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তারা এখনও জীবন্ত। বেঁচে থাক বাছারা। (২) ভদ্রলোক আমার আট-দশটি প্রবন্ধ ও দু'খানি বই পড়েছেন। মজা এই যে, প্রবন্ধগুলির—একটির ছাড়া—কোনো রিপ্রিণ্ট নেই যে, তাঁকে উপহার দেবো। তিনি নিজেই যোগাড় করে কিছু এনেছেন, তাইতে সই করে দিলাম। তাঁর অভ্যাসটি অ-ভারতীয়, আমার কাজটিও অ-ভারতীয়।

দেশাত্মবোধের ইতিহাস কিভাবে আধুনিক ভারতীয় পাণ্ডিত্যের অভিব্যক্তির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে বললাম। দৃষ্টান্ত দিলাম ইতিহাস রচনা ও ইকনমিক চিন্তার। ডাঃ নুরুল হাসান প্রথমটির ব্যাখ্যা করলে চমৎকার। হবীব সাহেব মধ্যযুগীয় ও আধুনিক মনোভাবের

পার্থক্য দেখালেন। অমলেন্দু সাহিত্যের দিক থেকে কিছু বললে। কথাবার্তা তো বেশ চললো, কিন্তু আমাদের দেশে 'ইন্টেলেক্চুয়াল ক্লাশ' বলে কিছু আছে কি? শিক্ষকের দলকে কি নতুন ব্রাহ্মণ বলা চলে? দেশের 'আইডিয়াল প্যাটার্ন' পণ্ডিতদের দ্বারা নির্নীত নয়, আপাতত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী দ্বারাই হচ্ছে, শীঘ্রই এঞ্জিনীয়ারদের দ্বারা হবে এবং পরে টেকনিশিয়ানদের দ্বারা। ইন্টেলেক্চুয়াল বলতে আমি মোটামুটি গোটাকয়েক জিনিস বুঝি: সে এমন লোক যার চিন্তার ছাঁদে বুদ্ধির টানা-পোড়েন, বয়নটাই বেশি কার্যকরী হয়। সেজন্য প্রথমত অন্য প্রকৃতির মানুষের থেকে তার পার্থক্যটা নজরে পড়ে। তা ছাড়া, তার বুদ্ধি চর্চার জাত ও ধরনই এমন যে, সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে সব-সময় খাপ খায় না। তার বিষয়টি দৈনিক জীবনের সাধারণ বিষয় থেকে একটু আলাদা। এইপ্রকার নানা পার্থক্যের সমাবেশে ইন্টেলেক্চুয়াল মানুষটিকে ভিন্ন মনে হয়। তার কার্যাবলীর ছক বেঁধে দেয় সমাজ; তাই সমাজের গঠন ও কাজ (স্ট্রাকচার ও ফাংসন) যেমন যেমন বদলায় ইন্টেলেক্চুয়াল দলের গঠন ও কাজও তেমনই বদলে যায়। এই সামাজিক ও কার্যগত পার্থক্য বুদ্ধির স্বভাবের পার্থক্যের সঙ্গে মিশে নির্লিপ্ততার ভাব তৈরি করে। এরই নাম ডিট্যাচমেণ্ট, নিষ্কামভাব, মা ফলেষু কদাচন ইত্যাদি, বুদ্ধিচর্চার জন্যই বুদ্ধি, ডিসইণ্টারেস্টেডনেস, নিছক পাণ্ডিত্য। ইন্টেলেক্চুয়ালরা বিশেষজ্ঞ নাও হতে পারেন। তাঁদের পরীক্ষা হয় জীবনের অন্য দিক, অন্য নক্সা, অন্য ছাঁদের দিক থেকে। সামন্ত যুগ ও ধনতন্ত্রের যুগের ইন্টেলেক্চুয়াল এক জন্তু নয়। ভারতের বর্তমান অবস্থায় সব যুগই বর্তমান, অথচ নতুন যুগের দিকে আমরা যাচ্ছি। প্রথমটির জন্য ইন্টেলেক্চুয়ালদের মনে ও-

কাজে এত সংশয়, এত বিরোধ, এত নিষ্ফলতা ও অরাজকতা। এবং এগুচ্ছি তাই পা টলোমলো করছে। কোথায় যাচ্ছি তা জানি না, তাই খানিকটা দিশাহারা।

অন্যেরা, পলিটিশিয়ানরা, বলছেন তাঁরা জানেন। অন্তত চালাবার শক্তি তাঁদেরই হাতে। এঁরা কিন্তু বুদ্ধিচর্চাকে একটু অবিশ্বাস করেন। গান্ধীযুগের আন্দোলনের প্রকৃতিই তাই ছিল। তার ওপর ইংরেজের আশীর্বাদ তো রয়েছেই। ও-জাত শুদ্ধবুদ্ধির বিপক্ষে। (ফরাসীরা তা নয়, অন্তত প্যারিসের ফরাসীরা তো নয়ই।) ইন্টেলেক্চুয়ালদের সঙ্গে পলিটিশিয়ানদের যোগসাধন করছেন পণ্ডিতজী। (আর করতে পারেন আমার জানিত'র মধ্যে আচার্য নরেন্দ্র দেব ও ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ।) এই যোগের একটি মজার ফল লক্ষ্য করেছি। পণ্ডিতজীই এখন বুদ্ধিজীবীদের লীড দিচ্ছেন। বৈজ্ঞানিকরাই এখন তাঁর সংযোগ থেকে ফয়দা ওঠাচ্ছেন বেশি—ইকনমিস্ট ও সংখ্যাতাত্ত্বিকরা ওঁদের একটু পিছনে আছেন। সেজন্য বিজ্ঞানের কতটা উন্নতি হয়েছে জানি না, কিন্তু ইকনমিস্ট ও সংখ্যাতাত্ত্বিকদের কিছু যেন হবো-হবো হচ্ছে সন্দেহ হয়। পণ্ডিতজীকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি—তাঁর values গুলি আমার, আমার জাতের। তিনি আমারই to the power n.—তবু এই আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিতে চিন্তার এমন কিছু অগ্রস্থতি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। তাঁর নেতৃত্বে আমরা নীত, তাঁর গৌরবে আমরা স্ফীত হচ্ছি। এর বাইরের রূপটা আমার নজরে পড়েছে, আমার ভালো লাগেনি। তাঁর নেতৃত্ব ব্যতীত বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর সামাজিক স্থান অত শীঘ্র যতটুকু উঠেছে ততটুকুও উঠতো না নিশ্চয়ই। তবু, তবু যেন কোথায় খিচ লাগছে, টান পড়ছে আমার মনে। কিছুদিন আগে পণ্ডিতজীকে এই ধরনের ইঙ্গিত

দিই—তিনি উত্তর দেন, দোষটা কি? দোষ এই,—এতে জনকয়েক ইণ্টেলেক্‌চুয়ালের খাতির বাড়বে, বুদ্ধির চর্চা ফলাও হবে না সন্দেহ হয়। কথায় কথায় পণ্ডিতজী, কথায় কথায় আশুবাবু, কথায় কথায় গুরুদেব, কথায় কথায় বাপু, কথায় কথায় 'কর্তা' যদি কই, তবে নিজের কথা জমবে কখন, কইবো কখন? কেমন যেন ব্যাপারটা গুলিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য বুদ্ধিজীবীরাই বা এতদিন কি করে এসেছি, এখনই বা কি করছি তা নয়। তবু যেন···

অর্থাৎ, দেশে ইণ্টেলেক্‌চুয়াল ক্লাশ তৈরি হয়নি এখনও— কনফারেন্সের হাজার হাজার ডেলিগেট সত্ত্বেও। ওগুলো এখন তামাসা। হওয়া উচিত কিনা তাও জোর করে বলতে পারছি না। ইচ্ছেটা হোক—তবে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, আশুবাবু, বাঙালীর নামই ধরছি—এঁরা কি কেউ ইণ্টেলেক্‌চুয়াল ছিলেন? না, কিন্তু পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ছিলেন। খুব পড়তেন, লিখতেন, দেশের বুদ্ধির স্তর তুলে ধরলেন—অর্থাৎ এঁরাই যা কিছু করলেন। এই হিসেবে ইণ্টেলেক্‌চুয়াল ক্লাশের প্রয়োজনই দেখি না। কিন্তু ওঁরা তো ফুজিয়ামার মতন ভুঁইফোড় নন, ওঁরা পর্বতশ্রেণীর উচ্চশিখর, যার বরফের ওপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রঙিন আলো পড়ে সমতলভূমির সাধারণ মানুষের চোখ ঝলসে দেয়। এই উচ্চ শিখর ও সমতলভূমির মাঝখানে পাহাড়ের গায়ে ইণ্টেলেক্‌চুয়ালদের বসতি। বেশি বরফ পড়লে উপত্যকায় নামে, সেখানে গরম পড়লে আবার উঁচুতে পালিয়ে যায়। ব্যস এই তাদের দৌড়—সাধারণত। সামুদ্রিক উপমায়, কোটি কোটি প্রবালের স্তূপে প্রবাল দ্বীপ সমুদ্র থেকে দু'-এক ইঞ্চি ওপরে ওঠে—সেই দ্বীপের মধ্যে খানিকটা মিঠে পানির পুকুর, ঢেউ নেই,

হাঙর-কুমীর নেই—কিছু নারকেল গাছ আর পাখি। গগ্যাঁর মতন থাকতে পার এখানে, তো মরতে হবে সেখানে। ঐ লোকটি ইন্টেলেক্চুয়াল শ্রেণীর চরম প্রতীক—এই তাঁর জীবনের নতুন ব্যাখ্যা। সেখানে থাকতে পারা যায় না, অথচ 'এটল'-এর নিরুদ্বেল শান্তি চাই—এই দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বুদ্ধির অতিরিক্ত অনুভূতির প্রয়োজন ওঠে। আর না হয় পালান সাধারণ সার্থক জীবনের নিচে। পালাবার আরো পথ আছে, কিন্তু এইটেই প্রশস্ত। এ-যুগে এ-সভ্যতায় ইন্টেলেক্চুয়াল হলেন মার্জিন্যাল ক্রীচার। কিন্তু অন্য যুগে, অন্য সভ্যতায় তিনি অতো বিচ্ছিন্ন থাকবেন না—কিন্তু একটু দূরত্ব বরাবরই থাকবে, এবং থাকা উচিত। এ-যুগের স্বাধীনতাই হলো মার্জিন্যাল—যেমন রেল-লাইনের ইস্পাতের সামান্য একটু ফাঁক।

∴

৬-২-৫৬

খানকয়েক মজার চিঠি পেলাম। দুটি ছাত্রীর, একটি ছাত্রের। বিবাহ হচ্ছে—আশীর্বাদ চায়নি, একটু যেন কিন্তু কিন্তু ভাব, যেন অন্যায় কিছু করতে যাচ্ছে। অর্থাৎ একটা ইচ্ছে ছিল পড়াশুনো নিয়েই থাকবে, আইডিয়া রিসার্চ নিয়েই জীবন কাটাবে। নিজেকে খানিকটা দোষী মনে হচ্ছে। এখন বুঝেছি

বিবাহ হলো মেয়েদের মেনিফেস্ট ডেস্টিনি। বিবাহটাই রিপু, কাম নয়।

একটি ছাত্রী বলতো, 'ও-সব' আমার দ্বারা হবে না, অর্থাৎ বিবাহ সংসার ইত্যাদি। অবশ্য বিয়ে হলো—বিয়ের সময় সে কী কান্না! ওমা, দু' বছর না ঘুরতে ঘুরতে দেখি কি না স্বামীকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। একদিন আমার বাড়ি নিয়ে এলো স্বামী বেচারিকে। কি ধমকানিটাই আমার সামনে তাকে না দিলে!

এ-দেশে মেয়েদের রিসার্চ করা ইন্টেলেক্চুয়াল হওয়া খুব শক্ত, প্রায় অসম্ভব। হওয়া উচিত কিনা তাই জানি না। ওদের গড়ন-পেটনই আলাদা। সমাজ? কোনো সমাজেই চায় না—চায়নি। রাশিয়ার এক মহারথীর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'আপনি কি পার্টির, কিংবা কোনো সমিতির সভ্য?' তিনি বললেন, 'আমার ছ'টি ছেলেমেয়ে, সময় কোথায়?' উত্তরটি আমার মা-জ্যাঠাই-খুড়ী-পিসীরাও দিতে পারতেন—দিতেনও।

তার অর্থ নয় ঘরই মেয়েদের জগৎ। নিশ্চয় নয়। ঘর তাঁরা গোছাতে পারেননি, এই দশ হাজার বছরে। মেয়েদের জগৎ বাইরে। বাইরের জগৎ তাঁরা নিশ্চয়ই পুরুষের চেয়ে ভালো চালাতে পারবেন। তাঁরা অন্তত হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করতে পারবেন না।

সারা বিকেল এ-ঘর থেকে ও-ঘরে খানকয়েক বই আনতে হিমসিম খেলাম। এক একখানা বই দেখি আর মনে পড়ে কবে কিনি, কবে পড়ি। কত বই আধখানা পড়ে ভালো লাগেনি, কতকগুলো একাধিকবার পড়েছি। কোনোটার শেষ সাদা

পাতায় মন্তব্য লেখা, নিজের সুবিধে মতো নোট আর সূচীপত্র। অনেকগুলো টাটকা রয়েছে এখনও। লাইব্রেরী থেকে নিয়ে প্রথম পড়ি, খুব ভালো লাগলো, পরে নিজে কিনে ফেললাম। এর মধ্যে সম্পত্তিজ্ঞান রয়েছে বৈকি! সাজাতে পারলাম না। শেলফের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ানো—এ-বই ও-বই ঘাঁটা—বেশ মৌজে থাকা যায়। তার পুরো খবর দেবার সাধ্য আমার নেই। 'জয়েস' হয়তো পারতেন। 'আর্ট' হতো না সম্ভবত। কার হাতে আর্ট হতো ভাবছি। লেসলি স্টিফেন? ভারি ভারি। অগস্টিন বিরেল? মন্দ নয়। হ্যারিসন? একটু ভিক্টোরিয়ান ওজন। ফরস্টার? হাঁ, রস আছে। এবিংগার হারভেস্ট বইটা খুঁজে পাচ্ছি না। পান সম্বন্ধে তাঁর রচনা লক্ষ্ণৌ-এর পান খাওয়ার মতনই মুখরোচক। কাশীর পান আর লক্ষ্ণৌ-এর পান ঠিক যেন বেনারসের ঠুংরি আর লক্ষ্ণৌ ঠুংরি। পার্থক্য আছে, বোঝানো যায় না—খেয়ে দ্যাখ, শুনে দ্যাখ। লক্ষ্ণৌ কত বেশি 'নাজুক'। স্বাদের পরিচয় পাওয়া শক্ত। মদ-চাকিয়ে, চা-চাকিয়েরা অনেক মাইনে পায়। বেরেন্সনের খাতির জগৎজোড়া। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাক্স বীরবম-এর একটা প্রবন্ধ পড়ে ফেললাম। পাকে-পাকে রস। না—হলো না—কোয়ায় কোয়ায় রস। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন রস দু' জাতের, আমের—একটি আঁটি বাকীটা শাঁস, আর বেদানার, দানায় দানায়। আমাদের রসশাস্ত্রেও ঐ ধরনের রসের বিভাগ আছে। অন্য বিভাগের বিচার পড়লে মধ্যে মধ্যে রস যায় শুকিয়ে। দুরখায়েম (?) কোথায় যেন লিখেছেন, classification is the habit of the secondary order of intelligence—ঠিকই।

এই ধরনের রসগ্রহণ কেবল ডিলেটান্টিজম নয়। ডিলেটান্টের

Senses-ই প্রধান। এটা মনের আলোর খেলা। প্রমথবাবু বলতেন কোনো কিছুতে ডুবে যেতে নেই। তিনি আমাকে বের্গসঁর রচনায় দীক্ষিত করেন। পরে বের্গসঁর খপ্পর থেকে বাঁচান। আবার পড়লাম রাসেল-এর গর্তে। সেখান থেকেও উদ্ধার করলেন। ক্রোচে পড়তে বললেন—পড়লাম যা পেলাম। এবার কিন্তু নিজেই নিজেকে উদ্ধার করি। মার্কস্‌ তিনি জানতেন না—ওটা আমার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ। ১৯২২ সাল থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি। তবে এখনও নতুন ঘাসের খিদে যায়নি। একটু সরে দাঁড়িয়ে নিজের এই নিরুদ্দেশ যাত্রা দেখতে বেশ লাগে। পাপ বোধ নেই—ছু'-একটা আফসোস আছে বড় রকমের—সংস্কৃত ও অঙ্ক বেমালুম ভুলে যাওয়াটাই প্রধান। অত্যন্ত অপূর্ণ রয়ে গেলাম!

৭-২-৫৬

এখানে যুবা বয়সের শিক্ষকদের মন নঙর্থক। জনকয়েকের ছাড়া। নঙর্থক—যদি কিছু নতুন কথা ওঠে তো সেটা অচল প্রমাণ করবার জন্য যা কিছু বুদ্ধি তা খরচ হয়ে যায়। সদর্থক—অর্থাৎ আপত্তি সত্ত্বেও পরীক্ষা করবার তৎপরতা। অত্যন্ত অদ্ভুত লাগে অল্পবয়সীদের মধ্যে মুশকিলের ফর্দ শুনতে। কারণ জানি—কিন্তু

নঙর্থককে সদর্থকে পরিণত করা যায় কিভাবে? এক ধৈর্য—এই যুগে ভারতবর্ষের পক্ষে ধৈর্য নিরাগ্রহ আলস্যের নামান্তর। দুই—ডায়েলেক্টিক। তাতে কবে পরিবর্তন হবে বলা যায় না। না হয় সংখ্যা গুণে পরিণত হলো কোনো না কোনো ক্ষণে, কিন্তু সে গুণ বে-গুণও হতে পারে। ফ্রান্সে পুজাডিজম্ এলো—কম্যুনিস্ট দলের সংখ্যা বৃদ্ধির পরে। ডায়েলেক্টিককেও চালাতে হয় ঠিকমতো। গতি অধোগতি হতেও পারে, উন্নতিও হতে পারে। মোটের ওপর, গড়পড়তা, একটা না একটা দিকে উন্নতি হচ্ছে হয়তো বলা যায়, কিন্তু সে উন্নতিতে অধোগতির ক্ষতিপূরণ নেই, সান্ত্বনা নেই। নঙর্থক মনোভাব সদসৎ বিচারবুদ্ধির লক্ষণ নয়, জাড্যের চিহ্ন।

জড়তা তমোগুণের মধ্যে পড়ে। কিন্তু জড়ভরত ছিলেন যোগী। তাঁর জড়তা কেবল চিত্ত নয়, দেহবৃত্তিরও নিরোধ। অন্য ধরনের জড়তা মন-বিহীন—একাধিক আমেরিকান নভেলে তার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা ক্যালিবানের বংশধর। আমাদের দেশের জড়তা গতিহীনতা—ইনার্শিয়া। স্ট্যাটিক অবস্থারও নিচে। এর শক্তি আছে কিছু না করতে দেবার। অর্থনীতিতে গ্রোথের চর্চা চলছে—সেখানে স্ট্যাটিক বিশ্লেষণ থেকে পরিত্রাণ পেতে নাজেহাল হচ্ছি। কেন? আমার মতে তার কারণ এই: স্ট্যাটিক অবস্থাকে আমরা নির্জীব ভারসাম্যের অবস্থা ভাবি। কিন্তু এই অবস্থার জীবন আছে। সেটা বাধা দেয়। অর্থাৎ আমাদের 'থিওরী অব ইনার্শিয়া' নেই। সেইজন্য দেরাদুনে আমি বললাম ঐতিহ্যের স্বভাব বুঝতে। রাজ্যপাল ও ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ ভাবলেন, আমি আলিগড়ে এসে হিন্দু ও ঐতিহ্যবাদী হয়ে গিয়েছি, আমার বিপ্লবী মনোভাব ঘুচে গিয়েছে। তা নয় মোটেই।

অগ্রস্থতির বাধা কি বুঝতে চাই। সব সমাজ-শাস্ত্রীদের বোঝা উচিত, অর্থশাস্ত্রীদের বিশেষত। এই যে প্ল্যান প্ল্যান করে মরছি তবু লোকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করছে না কেন? কিসের বাধা? কেন বাধা? এই জড়তা, এই ইনার্শিয়া—যাকে চটে আমরা স্টুপিডিটি বলি—সেইটাই প্রধান সমাজ-শক্তি। ভীষণ জোর তার, কারণ সেটা জড়, বিশুদ্ধ ম্যাটার। এবং আমাদের মধ্যে তিন ভাগ জড়, আর বাকীটা ভাব, বুদ্ধি ইত্যাদি প্রভৃতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর র‍্যাশ্যনালিজমের আওতায় বেড়ে উঠেছে আমাদের অর্থশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র, বিজ্ঞান। তারই ফলে ভাবি সব রীজন-এর প্যাঁচে ফেলবো। তা হয় না। ইকনমিক্স-এ থিওরী অব স্টুপিডিটি নেই, (সে চেষ্টা যে চলছে অবশ্য তার প্রমাণ পেয়েছি) খৃস্টান ধর্মে যেমন ডক্‌ট্রিন অব্ ঈভিল আছে। দুটোয় জড়াপট্টি খেয়ে গিয়েছে—খৃস্টান ধর্মের ঈভিল এখন কম্যুনিজম, কিছুদিন আগে যেমন ক্যাপিট্যালিজম।

অন্ধকারের, তমসার নিজের জীবন আছে। গিরিশ ঘোষের কবিতায়—শীকারের ভালো গল্পে—স্যাঁ এক-সুপেরির রচনায় তার খবর পাই। নিজের এক রাতের অভিজ্ঞতাও তাই বলে। মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাতে গাছের গুঁড়ি অনাহত ধ্বনিতে কাঁপে। সে-ধ্বনি পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়ে—কানাকানি, গুজ গুজ ফুস্ ফুস্ করে—ভয়ে শেয়াল ডাকে না—নিঃশব্দ, অথচ ধ্বনির কালো জোয়ার বয়।

আমাদের বাড়িতে বহু বছর ধরে কালীপূজা হয়েছে। হালি-শহরে প্রকাণ্ড শ্মশানকালীর তান্ত্রিক পূজা দেখেছি। ভয়ে বুক কাঁপতো। কিন্তু সেটা ভয়ঙ্করী। আমি যে জাড্যের কথা বলছি সেটা ভয়ঙ্কর নয়, মা কালীর নয়; বলির বোকা পাঁঠার

হতে পারে। বৃষ্টির মধ্যে গাধার ছবিটা মনে আসছে। 'তাও' ও শূন্যবাদের নিষ্ক্রিয়তা সম্পূর্ণ সদর্থক। পশ্চিমী দর্শনের সক্রিয়তায় (activism) মানুষ ওজন জ্ঞান হারায়। কাজের পাল্লায় মানুষ ভদ্র থাকতে পারে না। কর্মদর্শন (philosophy of work) য়ুরোপের অনেক ক্ষতি করেছে। ওটা ক্যালভিনিজম্ আর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল—যান্ত্রিক সভ্যতার ষড়যন্ত্র। চীনেরা ঠিক ব্যাপারটা বুঝেছিল, তাই তারা আমার মতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মার্জিত, ভদ্র, বিদগ্ধ জাত। এটা আমার আন্তরিক বিশ্বাস। ওরা 'তাও'-এর সদর্থক নিষ্ক্রিয়তা, কিংবা নিষ্ক্রিয় সদর্থকতার উত্তরাধিকারী। ওদের বিপ্লবের অন্তরে এক নীরবতা ও শান্তি রয়েছে—সেই ভাণ্ডার থেকে ওরা শক্তি আহরণ করে। ওরা জড় নয়। তাই ওদের sense of humour অতো সূক্ষ্ম। সে-রসিকতা পরিস্থিতি-সাপেক্ষ।

দুটো উদাহরণ মনে পড়ছে। সেবার কলকাতায় নিখিল বিশ্বের ধর্ম-সভা বসলো। (World Congress of Faiths) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা রচনা পড়া হয় মনে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথও কি একটা পড়েন মনে আসছে না। সে যাই হোক —দিন কয়েক সভা চলবার পরে, একদিন বেশ একটা তর্কাতর্কি বেধে গেল। আমরা ভাবলাম এই গেল বুঝি সব ফেঁসে। একটু আশাও করছিলাম। যখন স্বর চড়েছে তখন, সভাপতিমশাই ডাকলেন চৈনিক প্রতিনিধিকে। কিমোনো পরা ভদ্রলোক, একটু খুঁড়িয়ে সামনে এলেন। বেশ খানিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে—"When the waters are dirty it is best not to stir them।" আবার মিনিট-খানেক চুপ—তারপর কিমোনোটি গুছিয়ে নিয়ে পেছনের এক

চেয়ারে বসে পড়লেন। সাতদিনে এই তাঁর একমাত্র বক্তৃতা। বলা বাহুল্য ঘোলা জল জাতুমন্ত্রে থিতিয়ে গেল।

সেবার বিলেতে একটি চীনে ছাত্রী জুটলো। ছোট ছোট চোখের পিটপিটে চাউনি তুষ্টুমি মাখানো। বক্তৃতার সময় এ-বই ও-বই পড়তে বলি, কখনও কামাই করে না, অথচ নোট নিচ্ছে মনে হয় না। খাবার-দাবার সময় অত্যন্ত যত্ন করে। ঘোর ক্যাথলিক—অথচ বাবা পিকিং-এর মস্ত প্রোফেসর, এক ভাই এঞ্জীনিয়ার, আরেক ভাই জেনারেল—এ-মেয়ে দেশে ফিরবে না। বলে আমার ধর্মাচরণে বাধা ঘটবে। আমার খুব রাগ হতো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতাম কর্মপ্রবাহে ঝাঁপ দেওয়াই মনুষ্যোচিত ব্যবহার, কর্তব্য—স্ত্রীজনোচিত তো বটেই—তা ছাড়া মেয়েদের ধর্ম-টর্ম হয় না। মা জ্যাঠাইরা জপ করবার সময় বলতেন, "আরেকটা মাছ ভাজা খা—ওতে 'ফস্ ফস্' আছে।" মেয়েটি নীরবে শুনতো। দেখলাম ওকে কচ্ছপে কামড়েছে। যাই হোক, দেশে ফিরছি, মেয়েটি হাওয়া জাহাজে সময় কাটাবার জন্য একটি ছোট্ট বই উপহার দিলে। জাহাজে বসে খুলে দেখি এই লেখা,

"The pursuit of book-learning brings about daily increase. The practice of Tao brings about daily loss. Repeat this loss again and again and you arrive at inaction. Practice inaction, and there is nothing which cannot be done".—তারপর নাম সই 'কন্যাসম' ইত্যাদি। এ মেয়ে চীনে, পেকে ক্ষীর। ভারতীয় হলে তু'-এক ফোঁটা চোখের জল থাকতো। আমাদের জড়তা এ জাতেরই নয়। লোকে বলে, আমরা ভাবি খুব স্পিরিচুয়াল। ছাই! বিশুদ্ধ ও জড়।

এবার ভাবছি রোজ সন্ধ্যার সময় গাছের তলায় আরাম-কেদারায় শুয়ে পাতা আকাশ আর তোতা পাখী দেখবো। একবার প্রায় মাসখানেক ঐ করেছিলাম, এক সাধুর নির্দেশে। কিন্তু একলা নীরবে থাকার কি জো আছে! যে-কাজ করি তাকে কাজ বলি না, সেটা ফাস্।

৮-২-৫৬

সরকারী চাকুরিতে ভালো ভালো নতুন বৈজ্ঞানিক, ইকনমিস্ট, সংখ্যাবিদ্ ঢুকে পড়েছে। মোটা মাইনে পায়, তাই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে চায় না। আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র এত মাইনে, গবেষণার এত যন্ত্রপাতি, এত সুযোগ সুবিধা দিতে পারে না। সরকারী ল্যাবরেটারিতে পড়াতে হয় না সপ্তাহে চব্বিশ ঘণ্টা থেকে ত্রিশ ঘণ্টা। এবং সব চেয়ে বড় কথা, একবার ঢুকে পড়লে কাজ সম্বন্ধে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। একটা বড় প্রোজেক্ট এলো, তার এক অংশ তুমি পেলে, সেইটে নিয়ে পড়ে থাকো, কিছু নোট লেখো ভালো, বাইরের কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে না, কেননা সবই গোপন। অতএব আন্তর্জাতিক কাঠগড়ায় তোমার কাজের যাচাই নেই। যা কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেটা নিচু গ্রেড থেকে ওপরের গ্রেডে ওঠবার জন্য। সেটা অনিবার্য। ফলে

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি এবং সরকারের খ্যাতি। দু'দিক থেকেই নতুন কাজে বিশেষ লাভ নেই। ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের রিসার্চ গোপন রাখার কিছু মানে আছে। কিন্তু প্ল্যানিং কমিশনের ইকনমিস্ট গোষ্ঠীরও (প্যানেল) রচনাগুলি সিক্রেট। সরকারের প্রতি ডিপার্টমেন্টেই প্রায় আজকাল বহু ইকনমিস্ট নিযুক্ত আছেন। তাঁদের কাজও গোপন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটি ওপরের আদেশানুসারে প্রকাশিত না হয়। অর্থাৎ এই সব গবেষকদের বিশেষ কোনো স্বাধীনতা নেই। ছোট সমিতিতে তাঁদের মধ্যে বয়স্করাই মুখ খুলতে পারেন। অথচ ডিমক্রেসির অর্থ এই : যে খবর সরকারের কাছে আছে ও আসছে সেই পুরো খবরের ওপর আমার-তোমার পুরো অধিকার আছে। স্ট্যাটিস্টিক্স সেইজন্য হলো ডিমক্রেসির প্রধান অস্ত্র। অথচ সরকার একে নিজের ব্যবহারে লাগাতে চায়। আমেরিকার বহু দোষ আছে, কিন্তু তার সরকারের সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা সরকারী রিপোর্টে ও স্ট্যাটিস্টিক্সেই পেয়েছি। আমাদের সরকারের প্রকৃত সমালোচনা অডিট, এস্টিমেট প্রভৃতি রিপোর্ট ভিন্ন অন্য কোনো সরকারী রিপোর্টে পাওয়া যায় কি ? মনে তো পড়ছে না। দ্বিতীয় Evaluation report-এ দু'-একটা সাফ সাফ কথা ছিল। ইভ্যালুয়েশ্যন করবার জন্য একটা প্রকাণ্ড ডিপার্টমেন্টেরই দরকার হতো না যদি স্ট্যাটিস্টিক্স ডিমক্রেটিক সত্য সন্ধানের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বোধ হয় আমরা এখনও পুরোপুরি ডিমক্রেটিক হইনি ; ভারতের এই পরিস্থিতিতে হয়তো বাড়াবাড়ি আত্মবিশ্লেষণ ভালোও নয়, জনসাধারণের আত্মবিশ্বাস তো চাই। সব মানি, কিন্তু এটা বদভ্যাসে দাঁড়াতে পারে। তার লক্ষণও পেয়েছি। তা ছাড়া, সরকারের আর কংগ্রেস পার্টির কাজ যেন এক হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারী গবেষকদের

আর্থিক অবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থা মঙ্গলকর নয়। তাদের মধ্যে হতাশা দেখেছি। অনেকেই দোকান সাজানো পছন্দ করছেন না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁরা মাথা এখনও ঘামাচ্ছেন না বটে, কিন্তু ভেবে দেখলে তাঁরাও হয়তো বলবেন যে, নিজের মতো নতুন কাজ করবার স্বাধীনতা তাঁদের কমে আসছে।

অন্য দিকে বে-সরকারী চিন্তা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠান এই কয়টি :—(১) বিশ্ববিদ্যালয়। আমি যতটুকু জানি ও যেটুকু জানি তা যদি বলি, তবে বন্ধুরা চটে যাবেন, ট্রেড ইউনিয়নের নিয়মভঙ্গ হবে। কাকে কাকের মাংস খায়ও না। তবে, নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন চিন্তা নতুন গবেষণা যে হচ্ছে না সকলেই জানেন। আমার বিশেষ বক্তব্য এইটুকু আমাদের রিসার্চ এখনও ব্যক্তিকেন্দ্রিক —হিরোইক, রোম্যান্টিক, নামজাদা অধ্যাপকরা এই বিষয়ে এখনও সচেতন নন। অথচ এ-যুগে হিরোইক রিসার্চ কেবল অসম্ভব নয়, অনৈতিহাসিক। এখন দল বেঁধে কাজের যুগ। তারো বেশি : রিসার্চটাকেই সোশ্যালাইজড না করে উপায় নেই। প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে বাদ দিচ্ছি। আর চিন্তা? কই এমন কিছু নজরে পড়েনি। ভারি মজার ব্যাপার ঘটছে। গবেষণার ঠ্যালায় প্রাথমিক বিষয়ের চিন্তা প্রায় অ-সামাজিক কাজ হয়ে উঠলো। একে 'ফিলজফাইজিং' নাম দেওয়া হয়।

(২) এক একটি পলিটিক্যাল পার্টির একটা না একটা ছোট্ট-খাট্ট গবেষণা-কেন্দ্র আছে। কংগ্রেসের কেন্দ্রই এখন যা কিছু কাজ করে। একটু একতরফা, তবু ক্রমেই উন্নতি হচ্ছে। সোশ্যালিস্ট পার্টির খোঁজ পরিষদ এখন নিখোঁজ। কম্যুনিস্ট পার্টির রিসার্চ সেক্সন এখনও গঁদ আর কাঁচির ওপরই নির্ভরশীল।

(৩) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিসার্চ সেক্সনই এখন দেশের উৎকৃষ্ট

গবেষণাকেন্দ্র। এর পার্টি লাইন নেই; তথ্যগুলিও নির্ভরযোগ্য; এবং প্রবন্ধগুলিও সারবান।

(৪) ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের সব কাজ জানি না। তবে যেটুকু জানি তাতে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে, এই প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ সবচেয়ে উজ্জ্বল।

(৫) বাকী রইলো আমাদের সংবাদপত্র ও পত্রিকা। 'ক্যাপিটাল', 'কমার্স' 'ইস্টার্ন ইকনমিস্ট' আর 'ইকনমিক উইকলি' আমি প্রায়ই পড়ি। এর মধ্যে শেষেরটিকেই আমার সবচেয়ে পছন্দ। হয়তো অন্যগুলির চেয়ে বেশি তথ্য দিতে পারে না, কিন্তু ইকনমিক উইকলির এমন সংখ্যা দেখিনি যাতে অন্তত একটা প্রবন্ধ আমাকে ভাবিয়ে তোলেনি। চিন্তার খোরাক শচীন চৌধুরী জোগান দিতে জানে। সে একটি চমৎকার গোষ্ঠী তৈরি করেছে,—সব নতুন বুদ্ধিমান অর্থনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিকরাই সে-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কেবল সমাজতত্ত্বেরই দিক থেকে তার সাপ্তাহিকে প্রকাশিত ভারতীয় গ্রাম্যজীবনের বিশ্লেষণ অপূর্ব। দেশে সে গবেষণার নতুন ধারা খুলে দিলো। (এ-কথা সায়েবে মানে।) বাংলা সরকার ছাপিয়েছেন কৃপা করে—ফলে বড় কেউ বইখানি পড়তে পায় না।

দৈনিক সংবাদপত্রে বিশেষ সংখ্যায় বিশেষজ্ঞদের রচনা বেরোয়। যে কাগজের পয়সা আছে সেই পারে। রবিবারের সংখ্যায় একাধিক ভালো লেখা পড়েছি। হয়তো গবেষণা নয়, তবু পাঠ্য।

(৬) নানাপ্রকারের চেম্বার্স অব কমার্সেরও রিসার্চ সেক্সন আছে। যা-কিছু লেখা আমার চোখে পড়ে, তাতে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় পাই না। এখনও দেশী ধনিকতন্ত্র এমন অপক্ব যে, অবজেক্টিভ ছাঁচ দিতেও ভয় পায়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের

তথ্য ও সংখ্যা সরকারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক গবেষণার প্রায় সবটুকুই তাই। দু'-একটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজেরা সংগ্রহ করছেন নিশ্চয়। কিন্তু সব যেন ছেঁড়া ছেঁড়া।

(৭) ল্যাজের দিকে রেডিওর বক্তৃতা। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য—এ-সব বক্তৃতা শুনি। মনে হয় পলিটিক্যাল লেকচার শুনছি। ভালোর সংখ্যা নিতান্ত কম। কোথায় বি. বি. সি-র থার্ড প্রোগ্রাম—আর কোথায় আকাশবাণী! সবই প্রায় বাণী! প্ল্যানিং সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলি কিন্তু ভালো। আমরা 'টক' দিতে জানি না—অত্যন্ত ডাইড্যাক্টিক। সবই প্রায় ধর্মোপদেশ, সার্মন। অর্থাৎ বিষয়ের ওপর কম দখলের ফাঁক ভরাই উপদেশের মাটি দিয়ে।

৯-২-৫৬

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কিভাবে সাজানো যায়, তাই নিয়ে প্রায় বিনিদ্র অবস্থায় কাটছে। কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছি না। University Grants Commission. Planning Commission, আর Inter-University Board—এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের যদি একটি যুক্ত সমিতি বসে ও অনবরত সারা বছর ধরে কাজ করে যায়, তবে কিছু আশা থাকে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের

আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে না মনে হয়। অন্য দিকে আমাদের মিথ্যা দম্ভ, রোম্যান্টিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব কিছু কমবে। সত্যই আমরা এই নতুন দেশের জন্য বেশি কিছু করে উঠতে পারছি না। আর্থিক দৈন্য জানি—সব জানি—পঁচিশ বছর যে লেকচারার ছিল সে হাড়ে হাড়ে জানে। তবু সন্দেহ হয়, আমাদের কর্তব্যের হানি হচ্ছে। এ-অবস্থায় সাহিত্য, সঙ্গীত, ছবি, গল্পগুজোব কিছুই সান্ত্বনা দিতে পারছে না। কেবল কফি আর সিগারেটই চালাচ্ছি। কিছুই যেন হলো না। অথচ কিছু চাই। নচেৎ দেশ ডুববে।

১০-২-৫৬

আজ সারা বিকেল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানের খসড়াটা পড়লাম। এক চটকায় গোটা কয়েক ধারণা ভেসে এলো। মন দিয়ে বহুবার পড়লে হয়তো মতামত তৈরি হবে। আপাতত ধারণা মাত্র। সবটা দৈনিকে বেরিয়েছে কি না জানি না।

প্রথম প্ল্যানের খসড়ার চেয়ে এটার আকার ছোট। একটু যেন তাড়াতাড়ি লেখা। বিশ্লেষণের অংশ যৎসামান্য, নেই বললেই চলে।

যাদের কাজ নেই তাদের কাজ হবে না। নতুন যারা আসবে তাদের কিছু কাজ জুটবে। কিছু নিশ্চয়, কিন্তু কতটা নিশ্চয় বলা হচ্ছে না। এক কোটি আন্দাজ মাত্র। ছোট ইণ্ডাস্ট্রি ও কুটীর-

শিল্পের কাজ তৈরি করাবার কতটা ক্ষমতা, তার হিসাব পাকা কি? ছোট ইণ্ডাস্ট্রির বহু সংজ্ঞা দেখেছি—কোন্‌টা ধরবো? বিদেশী কর্জ ও সাহায্যের হিসেব প্ল্যান-ফ্রেমের হিসেবের দ্বিগুণ। কোন্ ভরসায় দ্বিগুণ হলো? যে-কারণ দেখানো হয়েছে, সেটা ফিকে আশা মাত্র। ইনফ্লেশনের ভয় এবার যেন একটু বেশি পেলাম। অতোটা সব খরচের প্রায় আধখানা গ্যাপ সামলাতে পারবো কি? অবশ্য শেষ ভরসা র‍্যাশনিং। খসড়ার মধ্যে এমন অনেক কথা রয়েছে, যা থেকে মনে হয় যেন স্রোতটি একটানা নয়। দোটানার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতা নেই—যথা ১৯৪৮ সালের পলিসি পরিবর্তনের ইচ্ছা। তবু দোটানার লক্ষণ দেখলাম। "Rapid industrialisation is thus the core of development" —একধারে, আর অন্য ধারে ছোট ইণ্ডাস্ট্রি এবং কুটির-শিল্পের উন্নতির সাহায্যে কনজিউমার গুডস যথারীতি বাড়ানো। দুটোর মধ্যেকার ফাঁক 'ইণ্টেগ্রাল ডেভেলপমেণ্ট'—এই কথা দিয়ে 'পেপারিং' করা হয়েছে। 'ইণ্টেগ্রাল' শব্দটির বহুপ্রয়োগ সন্দেহজনক: "It is not enough in the context of planning to think merely in terms of a balance between supplies and demands in aggregate terms, what is required is balance between requirements and availabilities, especially of key resources at all stages. A great deal of continuous technical and statistical is necessary for the purpose."

(তারপর নতুন সমস্যার উল্লেখ এক লাইনে আছে।) বেশ কথা—অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্লেষণ অচল। খুব মানি। দ্বিতীয় বাক্যটিও মনোহারী। আমার এইখানে একটি ছোট্ট কথা মনে

উঠছে। আমার মতে what is required is not balance, but a little unbalance.

যা থেকে সামলানো যায়, যেটা হোঁচট খাওয়ায় না। এইভাবের যৎসামান্য অ-সমতা গতির ধর্ম। এক বছরের হিসেবে নিশ্চয়ই ব্যালান্স—কিন্তু এক পাঁচ-বছরের পর যদি অন্য পাঁচ-বছর আসে এবং আসবেই, কারণ কাল নিরবধি, তবে 'অ্যাভেলেবিলিটিজ', অর্থাৎ প্রোডাকশ্যনের দিকেই ঝোঁক দিতে হবে। 'রিকোয়ারমেন্টস' তো বেড়ে চলবেই—লোক-সংখ্যা কিছু কমছে না, আমরা বাণপ্রস্থও নিচ্ছি না এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজেশন আরম্ভ হলে থামেও না। অবশ্য key resources at all stages-এর 'অ্যাভেলেবিলিটিজ' কথাই বলা হয়েছে এখানে। তার বৃদ্ধিতে সময় লাগে—ততদিন? 'প্রোডাকশ্যন গুডস'-এর 'অ্যাভেলেবিলিটিজ' বাড়াবার জন্য 'কনজিউমার গুডস'-এর 'অ্যাভেলেবিলিটিজ'-এরও দ্রুত হারে বৃদ্ধি চাই, নচেৎ ইনফ্লেশন অনিবার্য। এখন দেখা গিয়েছে যে, একই ক্যাপিট্যালের ব্যবহারে কিছুকাল পর্যন্ত ছোট কারবার ও কুটীর-শিল্পের উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ক্যাপিট্যাল গুডস-এর উৎপাদনের বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি, কিন্তু একটা ক্রিটিক্যাল টাইমের পর শেষেরটা হুড়মুড় করে বেড়ে যায়। অতএব ব্যাপারটা ইন্টেগ্রেশন নয়, ফেজিং অর্থাৎ ঐ ক্রিটিক্যাল টাইম-এর একটা হিসেব চাই—সেটা কি পাঁচ বছর মোটামুটি ধরা যায়? এ সম্বন্ধে আমরা আপাতত অজ্ঞান। কিন্তু তাই বলে কি 'ইন্টেগ্রাল' শব্দের দ্বারা এই ফেজিং, এই সিকুয়েন্স, এই ক্রিটিক্যাল টাইম-এর কথা চাপা দেবো? ইন্টেগ্রেশান-এর অর্থ যদি 'সামেশান'ই হয়, তবে অর্থশাস্ত্রীদের তার গলদ জানা আছে। আগে ছিল মিক্সড্ ইকনমি—অর্থাৎ এমন খিচুড়ি যে, চাল ছিল ডালের সতীন। এখন হলো ইন্টেগ্রাল ইকনমি

—তুই সতীনে ভাব। কয়েকদিনের জন্য বেশ। কিন্তু তুই সতীনে এক জোট হয়ে যদি বৃদ্ধ স্বামীকে বিধ্বস্ত করতে আরম্ভ করে তবে স্বামী বেচারার প্রাণ থাকবে? ইনি ডান পা উনি বাঁ পা টিপছেন্—স্বামী হাঁপাচ্ছে।

এ যেন একটা কথার প্যাঁচে পড়ে গেলাম। ছাত্রদের থিসিসে দেখেছি, শেষ অধ্যায়ে যেখানে কি করা সম্ভব লিখতে হয়, সেখানে আর কিছু না বলতে পেরে লেখে কো-অপারেশনই একমাত্র উপায়। 'ওরে বাপু, প্রাইভেট সেক্টর আর পাবলিক সেক্টর, তোরা ঝগড়া করিসনি—সবই ইন্টেগ্রাল, সবই ভারতমাতার অংশ।' 'ওরে বাপু, ক্যাপিট্যাল গুডস ইণ্ডাস্ট্রি আর কটেজ এ্যাণ্ড হাউসহোল্ড ইণ্ডাস্ট্রি—তোদের মধ্যে ঝগড়ার কোনো কারণ নেই, সবই ইন্টেগ্রাল প্রোডাকশ্যন-এর যোগান দিচ্ছিস।' এটা পলিটিক্যাল গৃহকর্তার দৃষ্টিভঙ্গী, তাই এর ভিত্তি কম্প্রমাইস। অথচ বলতে হবে ইকনমিক দৃষ্টিভঙ্গী।

দ্বিতীয় প্ল্যানিং-এর চতুর্থ (এইটেই প্রথম) উদ্দেশ্য—

'Reduction of inequalities in income and wealth and a more even distribution of economic power !"

খাশা! ইনকাম অ্যাণ্ড ওয়েলথ দুই-ই আছে, কিন্তু প্রপার্টি কথাটির নামোল্লেখ নেই। এ সম্বন্ধে আমি যত বিলেতী বই ও প্রবন্ধ পড়েছি তাতে জানি ইনকাম অ্যাণ্ড ওয়েলথ-এর দারুণ অসমতা ফিসক্যাল মেজার্স দিয়ে খানিকটা কমলেও যতক্ষণ প্রপার্টির আরো মৌলিক ও আরো সাজ্ঘাতিক অসমতা কমানো না যায় ততক্ষণ আয় ও ধনের বিভাগটা প্রায় তেমনই থাকে, তার গঠনমূলক পরিবর্তন হয় না। বরঞ্চ অসমতা বেড়ে যায়। অন্য উপায় ক্যালডর-এর মতানুসারে ব্যয়ের ওপর জবরদস্ত কর

বসানো। সেটা তো মার্শাল, পিগু, কীনস বলছেন সম্ভব নয়। ক্যালডরের মতে ইনকাম-এর অর্থ ব্যাপক হওয়া চাই ; তার মধ্যে ক্যাপিটাল গেনস্ এ্যাণ্ড আদার ক্যাজুয়েল রিসিপ্টস্ আসা উচিত ; এবং তার ওপর এনুয়েল ট্যাক্স এসেসড অন প্রপার্টি। এই দুটো আনলে তবেই ইনকাম ট্যাক্সের যা কিছু ন্যায়সঙ্গত (ইকুয়িটি) সার্থকতা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তিনি জোর করেই বলছেন যে, ইনকাম-এর এমন কোনো অবজেক্টিভ সংজ্ঞা সম্ভব নয় যার দ্বারা খরচ করবার ক্ষমতা (স্পেণ্ডিং পাওয়ার) মাপা যায়।

ডিস্ট্রিবিউশান অব ইকনমিক পাওয়ার সম্বন্ধে খসড়াটি নীরব। এ-নীরবতা ভয়াবহ। অর্থনৈতিকেরা এ নিয়ে মাথা ঘামান না বলেই কি ? অথচ সবই তো শেষে পাওয়ারের ভাগ বাঁটোয়ারা।

১২-২-৫৬

নতুন আমেরিকান কবিতা কিছু পড়লাম। নতুন কবিরা বোঝাতে চান না, বুঝতে চান। এই ধরনের মন্তব্য সেসিল ডে লিউইস একবার কোথায় যেন করেছিলেন মনে হচ্ছে। তা হলে কম্যুনিকেশনের সমস্যা রইলো না। অবশ্য কবি সর্বক্ষণই জানেন

যে, প্রকাশ হওয়া চাই। কিন্তু বোঝবার প্রয়াসের সমস্যা, তার ক্রিয়া পদ্ধতি ভিন্ন ধরনের। প্রয়াস ছটফটানিও হতে পারে। সে যন্ত্রণা প্রকাশেরও রস আছে, তবে সেটা শান্তিরস নয়। প্রাজ-এর 'রোমান্টিক এগনি'—বইখানিতে তার মারাত্মক সমালোচনা পড়েছি। কিন্তু সাধারণত এই যুগের পাঠক সেই টরচারকে (torture) প্রতিভার সার্থকতা ভাবে—ভাবাই সহজ। বোদলেয়ার, লিওপার্ডি প্রভৃতি কবিতা উপভোগে (অনুবাদে) আমার নিজের এই গণ্ডগোল হয়েছে। যথাযথ বর্ণনাই যদি সার্থকতা হয় তবে অন্য কথা। কিন্তু কি জানি কেন, বোধ হয় ভারতীয় বলেই, সার্থকতার রস আসলে শান্তিরসই মনে হয়। লরেন্স-এর নভেলের চেয়ে তাঁর গল্প, তাঁর গল্পের চেয়ে চিঠি, তাঁর চিঠির চেয়ে তাঁর কবিতা এবং তাঁর কবিতার চেয়েও তাঁর ইটালি ভ্রমণের নক্সা আমার ভালো লাগে। যতই মানুষ শান্ত কেন্দ্রের দিকে এগোয়, ততই যেন সে সার্থক হয়। অনেক স্থলেই তাই দেখেছি : দর্শনে পাসকাল আর কিয়ারক গার্ড ; দু'জনেরই আত্মা মথিত। তবু পাসকাল শান্ত, কিয়ারক গার্ড অশান্ত। গান, নাচ বাজনাতেও তাই—বহু আধুনিক সঙ্গীত পরীক্ষা, নৃত্য পরীক্ষা, বাদ্য-পরীক্ষা শব্দের, দেহের, আলোড়ন মাত্র। সমুদ্র মন্থনে অন্তত এক ছটাক অমৃত না উঠলে চলবে কেন ? স্পেণ্ডার একে 'স্টিল সেণ্টার' বলেছেন। কিন্তু স্টিল মানে স্ট্যাটিক নয়। তার মধ্যে আণবিক্ শক্তি থাকে, যদি ভাঙতে পারা যায় তবেই স্ফুরণ। তার পর সংহতি আনতেই হবে। মিকেল এঞ্জেলোর ছবি ও ভাস্কর্যে অদম্য শক্তির স্ফুরণ ও সংযম দুই-ই আছে, তবু যেন কোথায় অতিরঞ্জন থেকে যায়। রোঁলা মিকেল এঞ্জেলোর জীবনীতে তার ব্যক্তিমূলক কারণ দেখিয়েছেন। তবু যেন…ওস্তাদ যখন গাইছেন তখন তাঁর কণ্ঠের নালী ও শিরা ফুলে উঠছে, কপাল

থেকে ঘাম করছে···এই ধরনের খানিকটা যেন। কষ্টের দাগ গায়ে মেখে রয়েছে যেন,—প্রসবের চিহ্নের মতন। বোঝাতে গেলে দাগ মুছে ফেলতে হয়। এরও বিপদ আছে; না বুঝে বোঝানো সাধারণত অত্যন্ত ঝরঝরে হয়। এমন বক্তৃতা, এমন দর্শন, এমন রচনা, এমন চিত্র, এমন কবিতা সংখ্যায় অল্প নয়!

আবার বেশি বুঝলে না কি মানুষ বোবা হয়ে যায়! রমণ-মহর্ষির নীরবতার গল্প শুনেছি। বোঝা আর বোঝানো—কবিতায় দু'-এর সামঞ্জস্য কি ভাবে সম্ভব ঠিক ধরতে পারছি না।

সার্থকতা হলো 'there-it-is-ness'—অর্থাৎ এই তার আদি, এই তার অন্ত। গ্রহণ করো ভালো—না গ্রহণ করো তার ক্ষতি নয়, তোমারই।

১৭-২-৫৬

প্রবোধ (বাগচী) গেল; আবার মেঘনাদও গেল। দু'জনেই এক রোগে। মনটা বড় বিক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। মেঘনাদের সঙ্গে শেষ কথাবার্তায় মনে হয়েছিল যে, সে দেশ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছে। বিশেষত বাংলা দেশ সম্বন্ধে। আমি আপত্তি জানাই। প্রমাণ শুনতে তার কত কৌতূহল! রেডিওতে শুনলাম তার "political views extreme" ছিল। কোন্ ভদ্রলোকের ছেলের

political views extreme না হয়ে থাকতে পারে! সব কংগ্রেসওয়ালা হবে, ভুঁড়ি বাড়বে, আর বহুমূত্রে ভুগবে, আর যা হচ্ছে তাই ভালো হচ্ছে বলতে হবে! মেঘনাদ ল্যাবরেটারীর বাইরেকার মানুষও হতে পারতো—দরকার হলে। এবং দরকার আছে।

প্রবোধ ভারতীয় বিদ্যার স্কলার—রীতিমতো স্কলার। সেখানে তার ফরাসী বুদ্ধি বিচার। তার বাইরে তার অন্য একটা রাজ্য ছিল যার ভিত্তি বিশ্বাস। কত আড্ডাই না জমেছে তার বাড়ি! পরিচয়ের সে ছিল এক প্রধান স্তম্ভ। প্রমথ চৌধুরীমহাশয় তাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তার সৌজন্যে, বিনয়ে, সংযত পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়নি এমন লোক দেখিনি। ভাইস-চ্যান্সেলারী না করতে হলে আরো কিছু দিন বাঁচতো।

একে একে বাংলার দেউটি নিবছে। এই সব লোকের এই বয়সে যাওয়া অন্যায়! সুভাষ, শ্যামাপ্রসাদ থেকে আরম্ভ। বাংলা শব্দটাই উবে যাচ্ছে যখন, তখন আর এতে দুঃখ করে লাভ নেই। পূরবৈয়াঁ হয়েই থাকা যাবে।

২৫-২-৫৬

শাহানশা ইরাণের বাদশা বাড়ির সামনে দিয়ে কনভোকেশন প্যাণ্ডেলে গেলেন। জানলা দিয়ে ছাত্রদের ঘোড় সওয়ার আর

মোটরগাড়ির শোভাযাত্রা দেখলাম। সারাদিন উৎসব চলবে—যোগদানের ইচ্ছে নেই, সামর্থ্য নেই। বিশ্ববিদ্যালয়টি (তাজের কিছু নিচে) দেখাবার সামগ্রী হয়ে উঠেছে। জাকির সাহেব অসুস্থ অবস্থায় তদারক করছেন শুনলাম। ভারতীয় সরকার পৃথিবীকে জানাচ্ছেন ভারতে মুসলমানদের কত যত্ন কত কদর। ছেলেরা জয়গান করছে শুনতে পাচ্ছি। শোভাযাত্রায় ওস্তাদ হয়ে উঠছি আমরা। অবশ্য ডিসিপ্লিও হওয়া যায়, মজাও পাওয়া যায়। তবে ঐ তামাশা! একটি রোমান যুগের কথা মনে উঠছে।

আচার্য নরেন্দ্র দেবের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় যৎসামান্য ইট ও লাঠি চলেছিল—একজন কনস্টেবলের চোখ গিয়েছে ও একজন অধ্যাপকও শুনছি মার খেয়েছেন। চমৎকার! অথচ তিনি যখন লক্ষ্মৌ-এর ভাইস চ্যান্সেলার, দীর্ঘ চার বছরের মধ্যে ছাত্ররা একদিনের জন্যও অভদ্রতা করেনি। কেন এমন হয়। অথচ এখন তো সেখানে শিক্ষক ভাইস চ্যান্সেলার! এলাহাবাদেও তাই ছিল, তবু সেখানেও কেলেঙ্কারি!

কফি খাবার সময় আচার্যজীর কথা মনে হলো। একটু অবসর পেলেই, একটু সুস্থ হলেই, যখন তখন আমার বাড়ি আসতেন—সময় নেই অসময় নেই কফি। তারপর বই-এর কথা, দেশ-বিদেশের কথা, কত কথাই না হতো। ১৯৩৫ সাল থেকে তাঁর সঙ্গে পরিচয়, পরে ঘনিষ্ঠতা হয়। আমি তাঁর কাছে কত ঋণী তা আমিই জানি এবং বোধ হয় আরো দু'-একজন জানেন। তাঁর সম্বন্ধে লিখতে আমার হাত কাঁপে—অনেকে অনুরোধ জানিয়েছেন লেখবার জন্য, কিন্তু কলম চলছে না। যদি কখনও বর্তমান মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারি তবে লিখবো। তাঁর বিনয়ের, তাঁর সদাচারের, তাঁর বৈদগ্ধ্যের, তাঁর বুদ্ধির, বিদ্যার,

সমবেদনার, তাঁর দার্শনিকতার, চারিত্রিক দৃঢ়তার ও নিতান্ত নম্র স্বভাবের বহু দৃষ্টান্ত আমার জানা, তবু বোধ হয় গুছিয়ে লিখতে পারবো না। পণ্ডিতজী ঠিকই বলেছেন, এমনটি আর হয় না, কেবল দেহই তাঁর দুর্বল ছিল। সম্পূর্ণানন্দজী ইঙ্গিত করেছেন পলিটিক্স-এ তাঁর আসা উচিত হয়নি। আমিও তাঁকে বহুবার এই কথা বলেছি। তিনি তা মানতেন না। তিনি বলতেন প্রথমে তিনি পলিটিশিয়ান পরে তিনি অন্য যা কিছু। এখন মনে হচ্ছে আমাদের পলিটিক্স-এ জন কয়েক অমন অবান্তর, নন-পলিটিক্যাল জীব থাকলে মন্দ হতো না। চেলাপতি ন্যাশন্যাল হেরাল্ডে লিখেছে তার জীবনে মাত্র দু'জন লোক ছিল যাদের সঙ্গে কথা কয়ে ফেরবার সময় মনে হতো পবিত্র হয়েছি, উন্নত হয়েছি। আমারও তাই মনে হতো। অথচ তাঁর সঙ্গে অনেক অবাঞ্ছনীয় লোক দেখা করতে যেতো এবং প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি অত্যন্ত ভদ্রতা করতেন। তারা যেতে চাইছে না, ডাক্তার অধীর হয়ে উঠছে, তাদেরও কোনো বক্তব্য নেই, কেবল মতলবই আছে, তিনি হাঁপাচ্ছেন, ওষুধ শুঁকছেন, আর হাসি মুখে কথা কয়েই যাচ্ছেন। একবার তাঁকে বলেছিলাম, 'আপনার অসুখ আমি ধরে ফেলেছি' 'কি সেটা?' 'আপনার goodness—ওতে হাঁপানি বাড়ে।' হেসে উত্তর দিলেন, 'অর্থাৎ দুর্বলতা?' 'যাই নাম দিন!' 'লোকে বলে আমি দুর্বল, কিন্তু মোক্ষম জায়গায় দুর্বল নই। ওটা আমার ডিমক্রেসী!' 'তা হলে বলুন রাশিয়ায় হাঁপানি নেই!' বাস্তবিকই তিনি মূল ব্যাপারে অটল ছিলেন, অন্যত্র ছিলেন নিতান্ত নম্র, না বলতে পারতেন না। কড়ি ও কোমলের অমন সমন্বয় দুর্লভ!

কাল টিনবার্গেন এসেছিলেন। বক্তৃতা দিলেন, সারাদিন কথাবার্তা হলো প্ল্যানিং নিয়ে। যেমন বিদ্যা তেমনই বিনয়।

অথচ বিদ্যা সবক্ষেত্রে বিনয়ী করেও না দেখেছি। আমার একান্ত বিশ্বাস বিদ্যার ভূমি goodness—(তার বাংলা কি ?) অন্তরে সৎ না হলে বিদ্যায় ফাঁকি থেকে যায়। স্বার্থপর পণ্ডিত দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গিয়েছে। কিন্তু চরিত্রের গলদ পাণ্ডিত্যে প্রতিফলিত হবেই হবে—ভদ্রতার খাতিরে সমালোচকরা নীরব থাকেন। আচার্যজীর এই moral basis-এর কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। বিনয় ছিল তাঁর চরিত্রের মজ্জায় মজ্জায়। সাধারণত এই ধরনের লোক 'লিবারেল' হয়—কিন্তু আচার্যজীর সোশিয়ালিজম ছিল বৈজ্ঞানিক। মূলত তিনি ছিলেন র‍্যাশনালিস্ট এবং পলিটিক্স-এ মার্কসিস্ট হিউম্যানিস্ট। তিনি লেনিনের সব লেখাই পড়েছিলেন। লেনিনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অগাধ—গান্ধীজী ও কার্ল মার্কসের পরেই বোধ হয়।

২৬-২-৫৬

ওয়াল্টার উইস্কফ-এর The Psychology of Economics পড়লাম। খুব মজার, কিন্তু ছাত্রদের জন্য নয়। অর্থশাস্ত্র ঘাঁটিবার পর, বহুদিন পর বইখানির বক্তব্যের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হতে পারে। বক্তব্যটি এই : অর্থনীতির মতামত ও আঙ্গিকের ইতিহাসের সঙ্গে মানুষের সামাজিক অবস্থার অভিব্যক্তির সম্বন্ধ নিগূঢ়। এই যুগে

মানুষ পৃথক ও একাকী হয়ে পড়েছে ; সমাজের কাছ থেকে কোনো আত্মপ্রতিষ্ঠার সমর্থন পাচ্ছে না ; ফলে বিরোধ ও আতঙ্ক (anxiety) বাড়ছে ; তাই তার সমন্বয়ের ও শান্তির জন্য উপযোগী মতামত সে তৈরি করে, তাতে বিশ্বাস করে। এই বক্তব্যের প্রমাণ লেখক আডাম স্মিথ থেকে আধুনিক অর্থশাস্ত্রীর রচনায় উদ্ধার করেছেন। আমার অন্তত অবিশ্বাস নেই। তবে আমি বলি এই ধরনের ব্যাখ্যা সব সামাজিক বিজ্ঞানের বেলাই খাটে। শ্রম-মূল্যের অবনতির ইতিহাস, ইকুইলিব্রিয়াম বিশ্লেষণের অভ্যুদয়, র‍্যাশনালিজমের উত্থান-পতনের বর্ণনা মনোজ্ঞ। রিকার্ডোর দোটানা অবস্থা আমাদের অপরিচিত নয়। ড্রুকমান গত যুদ্ধের সময় র‍্যাশনালিটির ক্ষয় দেখিয়েছিলেন। উইস্কফ তারই জের টানছেন অলিগপলি, প্রডাক্ট ডিফারেনসিয়েশনের বিচারে এবং অন্যান্য প্রকারের কঞ্জুমার ও প্রডুসারের ব্যবহারে। তাঁর মতে মডেল তৈরিটাও একরকমের ইর‍্যাশনাল ব্যবহার। আমার মতে ওটা র‍্যাশনালিটির চরম পরিণতি। ওর মধ্যে অযুক্তি লুকিয়ে আছে এইভাবে। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ইউটিলিটেরিয়ানিজমের দর্শন অনুসারে ধরে নিতেন মানুষ সত্যই, যথার্থই যুক্তি অনুসারে চলে, অর্থাৎ সে হিসেবী। এখনকার মডেল-বীল্ডার ভাবেন মানুষ 'যেন' হিসেবী—অর্থাৎ, ধরা যাক সে হিসেবী, প্রথমে গোটাকয়েক ব্যাপারে, পরে আরো বেশিতে। সত্যকারের হিসেবী আর 'যেন' হিসেবী—এই ফাঁকে যুক্তির ওপর অবিশ্বাস, তার কৃতিত্বে সন্দেহ ধরা পড়ছে। ভেইঙার অনেক দিন আগেই এই 'যেনর' বিশ্লেষণ করেছিলেন। সে যাই হোক, পড়ে মজা পেলাম—বিশেষত ইকনমিক্স-এ male (labour) আর female (land) principle-এর দ্বন্দ্বের প্রকাশ দেখে। ফ্রয়েড প্রভৃতির বিশ্লেষণে

তা হলে কিছু উপকার আছে ! কিন্তু নয়মান পড়ে (এখনও বুঝতে পারিনি) নতুন ইকনমিস্ট, রথচাইল্ডের একটা বক্তব্যে সায় দিতে ইচ্ছে হয়—এখনকার ইকনমিক্স-এ নিউটন, ডারুইন চলবে না ; ফ্রয়েডও অচল ; এখন কেবল ক্লজউইৎসের যুদ্ধের থিওরী —অর্থাৎ স্ট্র্যাটেজী অব পাওয়ার। বাস্তবিকই তাই ; এখন থিওরীর চেয়ে পলিসির ওপরই ঝোঁক ; অর্থাৎ সবই এখন কলেক্টিভ বার্গেনিং-এর ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে। তাই মনে হয় কর্তৃপক্ষের ও অর্থনীতিবিদের মধ্যে মহারথীদের ল্যাসওয়েল, ব্রেডি পড়া উচিত। আমাদের প্ল্যানিং-এর ঐখানে একটা মস্ত গলদ রয়ে গেল। Mixed Economy হলো সেই উনবিংশ শতাব্দীর balance of power। এখন না হয় প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টরের co-existence বললাম। কনফিউসাস যাই বলুন না কেন, নাম বদলালে কি ধাতু বদলায় ? তাই সোশিয়ালিজম-এর সার কথা strategic heights অধিকার করা—অর্থাৎ শক্তির বণ্টন, শক্তির খেলা—কেবল নয়মানের দাবা খেলা নয়, যুদ্ধ। উইস্কফ-এর শেষ মন্তব্য এই :

Thus economics has come a long way : from the symbols of labour value, harmony, and equilibrium, through the stage of rational, economic man and markets, to an interpretation which uses strategy : and warfare as analogies for economic behaviour and represents economic laws as probabilities. A picture of the individual, the economy, and the universe emerges, full of uncertainties, without ethical guide posts, relativistic, probabi-

listic, and appropriate to the precarious situation of mankind in midtwentieth century.

গত পঞ্চাশ বছরে একটা যুদ্ধহীন বছর যায়নি—যুদ্ধের ছায়া তো চিন্তাধারায় পড়বেই। মার্জিন্যালিস্টদের বুদ্ধি ও যুক্তি সর্বস্ব ব্যক্তি এখন গত। অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডে তখনকার আবহাওয়ায় ব্যক্তি না থাকলেও তাকে আবিষ্কার করার প্রয়োজন ছিল। এখন তার প্রয়োজনও নেই। মায়, নেতার ব্যক্তিত্বও এখন ঘুচলো—নেতৃত্বও এখন কলেক্টিভ। এ-ক্ষেত্রে বীরেন গাঙ্গুলী যাকে group dynamics বলছে তারই চর্চা উপযোগী। আমি তাকে dynamics of power বলতে চাই।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জুভেনেল, বাংলার লাট এণ্ডারসনের শক্তি-বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ। ল্যাসওয়েলের study of power থেকে আরম্ভ করাই ভালো। বইখানি পাচ্ছি না খুঁজে—কেউ পড়তে নিয়ে গিয়েছে, আর ফেরত দেয়নি। কিংবা হয়তো জঙ্গলে, অর্থাৎ আমার লাইব্রেরিতে কোনো শেলফের কোণে লজ্জায় আত্মগোপন করেছে। হাজার হোক—দেশটা গান্ধীর, রবীন্দ্রনাথের তো! তার ওপর জওহরলাল বলছেন, পৃথিবীতে আমরা শান্তি আনতে চাই, শক্তির দ্বারা নয়, শান্তিপ্রিয়তার দ্বারা!

৫-৩-৫৬

দু'দিন দিল্লীতে বেশ কাটলো। প্ল্যানিং কমিশনের রিসার্চ

প্রোগ্রামের আলোচনার পর সর্দার গুরবচন সিং-এর সেরামিক্স ও শ্রীসত্যেন ঘোষালের নতুন দেশী বিলেতী ছবির প্রদর্শনী দেখলাম। সর্দারজীর প্রয়াস নিতান্ত মূল্যবান। দেশী রঙ ব্যবহার করছেন। রঙ মেশাতে তাঁকে অনেক পরীক্ষা করতে হয়েছে। নীল রঙ খোলেনি কিন্তু। ডেলফ্‌ট ব্লু যে দেখেছে তার চোখে নেশা জড়িয়ে থাকবেই। দু'জন ছাত্রীর কাজ সুচারু। লোকজন দেখতে এসেছে এই যথেষ্ট। সত্যেন ঘোষালের পোট্রেটগুলি বেশ। অন্যগুলি কেমন যেন মনে বসলো না। আরো মনোযোগ দিয়ে দেখলে হয়তো বসতো। সন্ধ্যার সময় প্রদর্শনী যাওয়াটাই ভুল হয়েছে।

প্রশান্তবাবুর দিল্লীর বাড়িতে গেলে আরাম, সুখ, আনন্দ সবই পাই। ঘাসের ওপর, চীড় গাছের নিচে, অজানা পাতাবিহীন হলদে ফুলের গাছের পাশে বসে থাকলে প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। তার পর বাছা বাছা লোকেদের সঙ্গে পরিচয়, কথাবার্তায় বুদ্ধি সজাগ হয়। সব চেয়ে আরাম পাই যত্নে। দিল্লীতে এত কাজ থাকে যে সময়ই পাই না। পৃথিবীর সেরা ইকনমিস্ট আর সংখ্যাতাত্ত্বিকদের প্রশান্ত-বাবুই কেমন করে যোগাড় করেন ভেবে পাই না—অথচ বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি মাথা খুঁড়লে পায় না কাউকে—টাকা নেই। দিল্লী-কলকাতার Statistical Institute সত্যকারের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কাজ করছেন। প্রকৃত বিশ্বভারতী। প্রশান্তবাবু ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে ফলবান করছেন দেখে প্রাণ সতেজ হয়ে ওঠে।

এবার দু'জন আমেরিকান অধ্যাপকের সঙ্গে পরিচয় হলো। পল বারান স্ট্যানফোর্ডের অধ্যাপক। তাঁর লেখা যেখানে বেরোয়, খুঁজে পড়ি। দিল্লী যাবার আগের দু'দিন ধরে ছাত্রদের সঙ্গে তাঁরই একটা প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করলাম। ভদ্রলোক খুবই কম

লেখেন, কিন্তু যা লেখেন তার মধ্যে ধোঁয়া সৃষ্টির প্রয়াস নেই! সাফ সাফ মোটা কথা। অন্তর্দৃষ্টি আছে গ্রোথ ও প্ল্যানিং সম্বন্ধে। লোকটিকে আমার খুব ভালো লাগলো—একদম অনবদমিত—যা সত্য ভাবেন তাই খোলাখুলি বলেন। এ-ধরনের আমেরিকান দু'-একটি দেখেছি। ভালো 'স্পেসিমেন'। এঁকে ভারতবর্ষে আনতে একবার ইচ্ছা প্রকাশ করি—হয়ে ওঠেনি। তাঁর মতামত অবশ্য আমেরিকা সহ্য করে না—ভদ্রলোকের ছাত্রই নেই, যে রিসার্চের জন্য টাকা ওদেশে চাইলেই পাওয়া যায়, সে টাকা তাঁর কাছে আসে না—অর্থাৎ একপ্রকার একঘরে। অথচ কেউ কিছু করতেও পারে না। জার্মানীতে জন্মকর্ম, এখন আমেরিকান। আমাদের অর্থনৈতিক চিন্তা তাঁর মনে ধরেনি। আমারও ধরে না, তাই বোধ হয় সহজে ভাব হলো। পোডিয়া অন্য ধরনের জীব, আসলে রুমানিয়ান, এখন আমেরিকান। নিতান্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ—বারানের সঙ্গে তর্ক হলো। ভদ্র তর্ক রাত একটা পর্যন্ত।

বারানের কাছে খুব একটা সমর্থন পেলাম। প্ল্যানিং-সংক্রান্ত আমার চিন্তা সুবিখ্যাত ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের চিন্তার সঙ্গে ঠিক যেন খাপ খায় না, অথচ সাহস-ভরে কিছু বলতেও পারি না। মনে মনে কিন্তু জানি যে, মূলে আমার কোনো ভুল নেই। এ-এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থা! আত্মপ্রত্যয় আছে, অথচ কোথাও যেন নেই! বুর্জোয়াদের এই সাবধানী মনোভাব সুপরিচিত। কিন্তু ঠিক তাই কি? সে যাই হোক, বারান আমাকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করুক আর নাই করুক আমার মনে খানিকটা বিশ্বাস এনে দিলে। বড়ই দরকার ছিল।

ছাব্বিশ সাতাশ বছর যখন বয়স তখন ইংরেজীতে আমার প্রথম বই লিখতে আরম্ভ করি। বইখানি কোনো পত্রিকায় সমালোচনার

জন্য পাঠাইনি। আমার মতে যাঁরা ঐ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনীষী সেই বারোজনকে পাঠাই। তাঁরা প্রত্যেকেই চিঠিতে তাঁদের মন্তব্য জানান। বিদেশীর মধ্যে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, বের্গসঁ, হল্ডেন, হবহাউস, কেসারলিঙ, ক্লেমেণ্ট ওয়েব প্রভৃতি চিঠি লেখেন। আত্মবিশ্বাসও এলো, কিন্তু ডক্টরেট নেওয়া হলো না, ভাবলাম আর কি দরকার! দুটো মজার ব্যাপার মনে পড়ছে। তখনকার ইংরেজ (স্কচ্) ভাইসচ্যান্সেলার বিশ্বাসই করতে পারেননি যে, একজন নাবালক লেক্‌চারার—যে আবার গান-বাজনা শুনে ও ছবি দেখে বেড়ায়—সে আবার রাসেল প্রভৃতির কাছ থেকে চিঠি পাবে! বোধ হয়, রাধাকুমুদবাবু কিংবা নির্মল (সিদ্ধান্ত) তাঁকে বলেছিল। তিনি ডেকে পাঠিয়ে চিঠি দেখতে চাইলেন। মাথা গেল গরম হয়ে। তাঁর অবিশ্বাসের ছায়া চোখে ও ভাষায় ফুটে উঠেছিল। আমি বললাম, ব্যক্তিগত চিঠি দেখাতে পারবো না, দেখাতে চাই না। তখন নরম হয়ে বললেন, এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, যদি দেখাও খুশি হবো। পরেরদিন দেখালাম। চোখ ছানাবড়া, চায়ে নিমন্ত্রণ, আর বাসি কেক ভক্ষণ।

আরেকটি কথা মনে পড়ছে। আমার বাবা হলওয়েলের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। বলতেন, 'দ্যাখ দেখি, এধারে লর্ড-চ্যান্সেলার, আবার যুদ্ধমন্ত্রী, আবার দার্শনিক, স্কলার, সব একত্রে···এই না হলে মানুষ!' আইনস্টাইন তিনিই বোঝেন। বাবা জানতেন না যে, হলডেন আইনস্টাইন বোঝেননি। সে যাই হোক, বাবার কথা স্মরণ করে হলডেনকে একখানি বই পাঠাই। যখন কালো বর্ডারে একখানা চিঠি এলো তাঁর কাছ থেকে (তাঁর বৃদ্ধা মা কিছুদিন আগে মারা যান), তখন বাবাকে চিঠিখানি দেখাতে ভীষণ ইচ্ছা হলো। তখন তিনি কোথায়! এ-সব স্ট্যাণ্ডার্ড অবশ্য নিতান্ত ভিক্টোরিয়ান

নিশ্চয়, তবু স্ট্যাণ্ডার্ড সামনে থাকলে সেখানে পৌঁছতে ইচ্ছে হয় এবং অগ্রসর হবার পথে আত্মবিশ্বাস জন্মায়, আর যাঁরা স্ট্যাণ্ডার্ড উঁচু করে ধরেন, তাঁদের কথা মনে এলে চোখে জল আসে।

আত্মপ্রত্যয়ের প্রয়োজন খুব। কিন্তু সেজন্য স্ট্যাণ্ডার্ডও চাই। এখনকার ব্যক্তিগত স্ট্যাণ্ডার্ড কি? বড় চাকরি? কর্মকুশলতা? হেবার (Weber) একেই বোধ হয় আইডিয়াল টাইপ বলেছেন।

পোলিশ আর্টের প্রদর্শনী দেখলাম। ফরাসী যুগের কথা ছেড়ে দিলে, মনে হয় যেন একটা ভীষণ বিষাদের ছায়া সমগ্র পোলিশ আর্টের ওপর থাকে। সোশিয়াল রিয়ালিজম-এর যুগে বড় বিশেষ কিছু হয়নি মনে হলো। ইদানীংকার ছবিতে আধুনিকতার পরশ লেগেছে—কিন্তু আলগোছে। ভাস্কর্য, এচিং ও কাঠের খোদাই চমৎকার—বলবান, সমর্থ। এমন সাজানো প্রদর্শনী এদেশে দেখিনি। শুনলাম কাঠকাটরা, আলো, স্ট্যাণ্ড, সবই পোলাণ্ড থেকে এসেছে। আমাদের প্রদর্শনীগুলি জঘন্যভাবে সাজানো হয়। হিংসে হলো। রাষ্ট্রপতি ভবনের স্থায়ী প্রদর্শনী চোখে দেখা যায় না। ভাগ্যিস কেউ যায় না!

৬-৩-৫৬

মিকোয়ানের বক্তৃতা পড়লাম। স্টালিনের রচনা ক্লাসিক নয় তাও শুনছি। খ্রুশ্চেভের রিপোর্ট থেকে মনে হচ্ছে যে, তিনি

মিকোয়ানের চেয়ে সাবধানী, অতো খোলাখুলিভাবে স্টালিনের সমালোচনা করতে চান না, অথচ গত বৎসর মনে হয়েছিল যে, তিনি ম্যালেনকভের তুলনায় স্টালিনপন্থী। মস্কোতে একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করি—তোমরা এত স্টালিন-উপাসক কেন? উত্তর ছিল মজার: "ভারতবর্ষে গান্ধীর কত ছবি আছে? কতবার তোমরা তাঁর নাম গ্রহণ করো? অথচ গান্ধী দেশকে গড়ে তোলবার সময় পাননি। স্টালিন দেশকে গড়ে তুলেছেন, নাৎসী পশুদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আমাদের কৃতজ্ঞতার কারণ যথেষ্ট নয় কি?" তার পর ছাত্রটি একটি গল্প বলে, 'যখন মস্কোর ওপর জার্মান গোলা বেশি বর্ষণ হচ্ছে তখন স্টালিন ক্রেমলিনের দেয়ালের মাথায় রাস্তার ওপর বেড়াতেন, দাঁড়াতেন, মুখে পাইপ থাকতো—আর আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হতো যে, মস্কো শত্রুর হাতে পড়বে না।'

আরেকটি ঘটনার স্মরণ হচ্ছে। সুধীনের (দত্ত) বাড়ি—তখন বোধ হয় রাত দুটো কি তিনটে। এম. এন. রায় সে রাতে রাশিয়ার বর্তমান অবস্থার আলোচনা করছিলেন—দু'-একটি মজার ব্যাপারও বলেছিলেন। সুধীন ও আরো দু'-একজন স্টালিনবিরোধী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। স্টালিনের বিপক্ষে কড়া মন্তব্য শুনে তিনি বললেন, 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে স্টালিনের স্থান রাশিয়াতে লেনিনের চেয়ে কম নয়, বরঞ্চ বেশি—তবে এ-কথা বলা চলে না।' এখন স্টালিন ভোলার পর্যায়। কাকে মনে রাখবো কাকে ভুলবো এই নির্বাচন পার্টি যদি করে দেয় তবে তো গিয়েছি! কেবল তাই নয়, তখনই সবাইকে মনে করতে হবে, তখনই সকলকে ভুলতে হবে। অবশ্য অন্য দেশেও খানিকটা তাই হয়—যেমন জার্মানদের য়িহুদী অত্যাচারের কথা লিখতে এখন বারণ নেই বটে, তবে লেখা সমীচীন নয়—একজন ইংরেজের লিখে চাকরি গেল। পার্ল হারবারের

উল্লেখ আমেরিকান কাগজে থাকে না। রুজভেল্টের নিউ ডীল ও নিউ ডীলার এখন অপাংক্তেয়। স্মৃতিশক্তি এখন প্রোপাগাণ্ডার ঠেলায় সোশিয়ালাইজড হয়ে গিয়েছে। হাই প্রেসার এডভার্টিজ-মেণ্টের কাজই হলো ব্যক্তিগত স্মৃতিকে অন্যের হাতে সমর্পণ করা।

ব্যাপারটা দাঁড়ায় কৃতজ্ঞতায়। যে-যুগে সবই পরীক্ষামূলক, সবই 'রেলেটিভ', যে-যুগে 'এবসলিউট'-এর মূল্য নেই, যে-যুগের প্রাণ বিজ্ঞান, টেকনলোজি, যখন পুরাতন যন্ত্রের ব্যবহার মানেই প্রতিযোগিতায় অসার্থক ও ক্ষতি সে-যুগে কৃতজ্ঞতা অ-সামাজিক গুণ। তবু মনে হয়, কৃতজ্ঞতাই হলো প্রকৃত জ্ঞানের (wisdom—আমাদের দর্শনের ভাষায় বিজ্ঞানের) প্রাণবস্তু। ঐতিহ্যের আদি ভাব কৃতজ্ঞতা। রাশিয়ানরাও কৃতজ্ঞ—ভাবে স্টালিনকে টপকে লেনিনের প্রতি। ওদের স্মৃতি লাফিয়ে চলে, পিছনে পীটার আইভান পর্যন্ত। স্মৃতি কি এতটাই খাপছাড়া ?

১৮-৩-৫৬

ঝড়বৃষ্টির পর আলিগড়ও সুন্দর দেখাচ্ছে। এ ক'দিন ভূতের মতন খাটলাম, তাই বোধহয় আজ বিকেলে যব, গম, সরষেভরা দিগন্তব্যাপী মাঠ অতো ভালো লাগলো। মোটর রাস্তায় রেখে খালের ধার দিয়ে পশ্চিম মুখো পাড়ি দিলাম। চোখে রঙের

নেশা ধরলো। অনেকের ধারণা, শিক্ষা, সভ্যতা, সবই প্রকৃতির বিপক্ষে। প্রথমে তাই, তারপর প্রকৃতিকে শিক্ষা ও সভ্যতার বুকের মধ্যে টেনে আনতে হবেই হবে। বাইরের প্রকৃতি থেকে এতটা বিচ্যুতি অন্তরের প্রকৃতি বেশিদিন সহ্য করে না। আর্ট এই ক্ষতিপূরণ করতে অক্ষম। এই ভেবে রানিখেতে যেতাম—এখন থেকে দেরাদুন যাবো।

জীবনের গত বিশ-ত্রিশ বছরে একটা ফাঁক বেড়েই যাচ্ছে। দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, দোল, কিছুতেই যোগ দিতে পারি না। বারোয়ারিতে মোটেই আনন্দ পাই না। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে এই সব পাল-পার্বণ অনুষ্ঠানের নিবিড় সম্বন্ধ ছিল!

বারাসত থেকে নীলগঞ্জে যাবার রাস্তা সোজা। দু'পাশে মাঠ, বিল, আর দূরে দূরে গ্রাম। ভোরে গিয়েছি, সন্ধ্যায় গিয়েছি, দুপুরে বটগাছের তলায় ঘুমিয়েছি। বুড়ির বাগানের, তিনকড়িবাবুর বাগানের আম, আর ক্ষেতের আখ চুরি, আর সরস্বতী পুজোর দিন ভোরে যবের শীষ আনতে যাওয়া, শিশিরে ধুতি ভেজা, রাতে কলপুকুরে যাওয়া—এককালে প্রকৃতির সঙ্গে যোগ ছিল বলেই এখনও বেঁচে আছি। য়ুরোপে শুনলাম, বারাসত বদলে গিয়েছে। ট্রেভর হলের বাগানে কি কাঁঠালি-চাঁপার গাছটা এখনও আছে? শেঠপুকুরের পশ্চিম ধারের ঢিবির ওপর বকুল গাছগুলো? স্কুলের জামরুল গাছগুলো? কামিনী গাছগুলো? ফাটকের ঝাউগাছে কি এখনও বাদুড় ঝোলে? না, কলেজ হয়ে সব গিয়েছে? কোথায় আলিগড় জেলার প্রান্তরের আকাশে বাদুড় উড়লো, আর পঞ্চাশ বছর আগে ন'শ' মাইল দূরের একটা ছোট্ট মফঃস্বল শহরের গাছপালা আর বাদুড়ের কথা ভেসে এলো।

পুরানো রেকর্ডে কোন পিন বসালে কি বেজে ওঠে, তার পাত্তা পাই না।

১৯-৩-৫৬

রাশিয়ায় মানসিক পটপরিবর্তনের সামাজিক কারণ কেউ দেখাচ্ছেন না। গোটাকয়েক অব্যবহিত কারণ বোঝা যায়। রুশের আত্মবিশ্বাস এসেছে, তার শক্তি এতই বেড়েছে যে, শক্ররা তাকে সহজে ঘায়েল করতে পারবে না সে বুঝেছে, অতএব যুদ্ধ এখন হচ্ছে না সে জানে। এ অবস্থায় কড়াকড়ি নিষ্প্রয়োজন। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই মনোভাব স্বাভাবিক; রাষ্ট্রের ব্যবহার ক্ষেত্রে কিন্তু অতোটা সহজ নয়, কারণ অনুষ্ঠান অনেকদিন পর্যন্ত নিজের গতিতেই চলে এবং রাশিয়ায় চলবেও। অতএব এই ব্যাখ্যার দ্বারা কতটা যথার্থ পরিবর্তন আর কতটা পুরাতনের জের তার পরিচয় হয় না। অনুষ্ঠানের মানসিক বিশ্লেষণের দোষ ঘটে। রাষ্ট্রের প্রকৃতিতে কিছু বদল হয়েছে কি? কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় এই কয়টি প্রতিজ্ঞা থাকে: (১) রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে না, উবে যাবে না, যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র ও সমাজ এক না হয়ে যায়। (২) যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন রাষ্ট্র ও পার্টি (দল) এক, অর্থাৎ পার্টি রাষ্ট্র চালাবে। (৩) পার্টি অবশ্য শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের।

(৪) তাদের মধ্যে শ্রমিকরা বল্লমের মাথা। অর্থাৎ ব্যাপারটা এই : শ্রমিক শ্রেণী শক্তিকেন্দ্র, পার্টি সেই শক্তির বাহক, রাষ্ট্র তার প্রধান যন্ত্র ও সমাজ তার কর্মক্ষেত্র। ইকোয়েশনটা এই ধরনের : সমাজ= নতুন শ্রেণী=শ্রমিক=দল=রাষ্ট্র=সমাজ। ঐ equal to, ঐ identity-তে গোল বাধে। ঐতিহাসিক কারণে কোনো একটি term প্রবলতম হয়ে যায়। বিপ্লবের সময় নতুন শ্রেণী ও শ্রমিক, তার সঙ্গে সঙ্গে দল ও সোভিয়েট বাড়লো, পরে দল, তার পর প্ল্যানিং-এর সময় থেকেই রাষ্ট্রের প্রকোপ। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্র সর্বস্ব। যুদ্ধান্তরে পুনর্গঠনের সময় কিন্তু সমগ্র সমাজের শক্তির প্রয়োজন হয়। তার ওপর যদি আর্থিক উন্নতির হার বাড়াতে হয়, তখন সমাজকেই প্রাধান্য দিতে বাধ্য। রাষ্ট্রগঠন ইতিমধ্যে কঠিন হয়ে উঠেছে। তাকে নমনীয় করতে পারে এক দল— কারণ দলের সঙ্গে সমাজের যোগ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই দলের মধ্যেই ব্যক্তিগত নেতৃত্বের প্রকোপ এতই বেড়েছে যে, তার আভ্যন্তরীণ শক্তি—যার আনুষ্ঠানিক নাম ডিমক্রেসি—ক্ষীয়মান। অতএব স্টালিন-পূজা বন্ধ হওয়া চাই। ঐ ছেঁদা দিয়ে সমাজ-শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছিলো—বিদ্যুতের বহতায় যেমন হয়। এক যুগে স্টালিন ছিলেন ট্র্যান্সফরমার, পরে স্টালিন-পূজা হয়ে উঠলো সমাজ-শক্তির বহতার স্রবণ-কেন্দ্র। ফলে রাষ্ট্র সমাজের নিকটে আসবে মনে হচ্ছে।

আরেকটি কথা : রাশিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে টেকনিশিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। চার্চিল এই বিষয়ে সকলকে সাবধান করেছেন। তা করুন গে—রাশিয়া আর আমেরিকা এই বিষয়ে একই পথের পথিক। আমেরিকা এখনও এগিয়ে রয়েছে, তবে দ্রুতির হার রাশিয়ার বেশি হয়ে যাচ্ছে। তাতে পৃথিবীর লাভ বই ক্ষতি হবে

না। সে যাই হোক, রুশ সমাজে এর জন্য একটা ভীষণ পরিবর্তন ঘটেছে। এই টেকনিশিয়ান শ্রেণী, যার মধ্যে শ্রমিক, কলেক্টিভ ফার্মের কর্মী, দলের সরকারী চাকুরে, স্কুল-কলেজের মাস্টার, বৈজ্ঞানিক এবং আত্মরক্ষার সাজ-সরঞ্জামের জন্য অগুণতি লোকজন সব রয়েছে—এরা একটা নতুন সামাজিক স্তর। এরা সেই পুরানো শ্রমিক-কৃষক নয়,—এরা শিক্ষিত, কর্মঠ, দেশ-প্রেমিক হয়েও ঐ শিক্ষারই কৃপায় এদের দৃষ্টি দেশাতিরিক্ত ও দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্বজনীন, সাধারণ। (রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই হবে বুঝেছিলেন—রাশিয়ার চিঠিতে পরিষ্কার লেখা আছে। ভদ্রলোকের দূরদৃষ্টি দেখলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। শ্রীঅরবিন্দও বহু পূর্বে এই কথা লিখেছিলেন মনে পড়ছে। হাতের কাছে সে রচনাটি নেই—আমার ভুলও হতে পারে)। এই মিডল ক্লাশ পার্টির রূপ ও ধর্ম বদলে দিয়েছে। ডায়েলেক্টিকের চমৎকার দৃষ্টান্ত। কোথায় সেই রুশ মুজিক-বারিন, আর কোথায় এই টেকনিশিয়ান-স্টাকোনোভাইট!

আরো একটি মার্কসিস্ট ব্যাখ্যা সম্ভব বোধ হয়। এতদিন রুশ ইকনমিতে গোটা তু'-এক আন্তরিক বিরোধ ছিল: এক, শহর-গ্রাম, আর তুই, উৎপাদন (প্রোডাকসান) ও উৎপন্ন সামগ্রীর বিস্তার-বণ্টন (ডিস্ট্রিবিউশন)। এই তুটি বিরোধের প্রধান রূপ রাষ্ট্র ও গ্রামীন কৃষকের বিরোধ। সেই বিরোধ কাজ করছিল কলেক্টিভ ফার্মের বাজার ও তার বাইরেকার প্রাইভেট বাজারের বিরোধের ভেতর দিয়ে। ভার্গাকে আমি এই বিষয়ে প্রশ্ন করি। তিনি বলেছিলেন যে, সাধারণ গৃহস্থ (তাঁর স্ত্রী) তখনও ১৯৫২।৫৩ সালে প্রয়োজনীয় জিনিসের শতকরা ত্রিশ ভাগ খরচ করেন খোলা বাজারের পণ্যে। দিয়াকভ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আপত্তি জানান, বলেন আরো কম, নামমাত্র। আমি শহরের

স্টেট মার্কেটের ঠিক বাইরে রীতিমতো খোলা বাজার দেখেছি—সেখানে ডিম, সব্জী, দুধ বিক্রি হতে দেখেছি। কেবল তাই নয়, ভোরবেলা গয়লা দুধ দুইয়ে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে তাও জানি। এসব জিনিসের দাম একটু সস্তা। দিয়াকভ কট্ঠর কম্যুনিস্ট। সে যাই হোক—এই ব্যাপারটা গভীরতর বিরোধের লক্ষণ মাত্র। সেটা হলো এই : গ্রাম হয়ে উঠছিল শহরের উপনিবেশ, সর্বদাই terms of trade গ্রামের বিপক্ষে যাচ্ছিলো। অতোটা বাড়াবাড়ি হতো না যদি শহরে তৈরি উৎপন্ন সামগ্রী—যেটা অত্যন্ত দ্রুত তালে বেড়ে চলছিল—গ্রামে প্রসারিত হতো। তা হয়নি নানা কারণে। একটা হলো, রাশিয়ান ট্রান্সপোর্টের দুরবস্থা। যা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য খাল কাটা আর বিদ্যুতের ব্যবহার। এই হিসেবে রাশিয়া ও চীন এক গোত্রের ও ভারতবর্ষ ভাগ্যবান। যে কারণেই হোক, ইংরেজ রেল-রাস্তা তৈরি করেছিল এবং আমরা সেগুলি পেয়েছি। অবশ্য আমাদের প্রোডাকশ্যন-ডিস্ট্রিবিউশনের সমস্যা অন্য ধরনের—আমাদের ট্রান্সপোর্ট ব্যবসার জন্য বাড়ছে, উৎপাদনের চাপে নয়। অর্থাৎ মূলত রাশিয়ার বর্তমান সমস্যা সেই মার্কস-কথিত realisation problem। এটার সমাধান আছে, হচ্ছে ও হবে। রাশিয়া বেশ মজার জায়গা হয়ে উঠলো। তার বর্তমান অবস্থা-পরিবর্তনের ব্যাপারে হতভম্ব হবার, আগেই বলেছিলাম, মনোভাবের স্থান নেই। যা মন্তব্য পড়েছি, সবই ভাসা-ভাসা। আচার্য নরেন্দ্র দেব থাকলে বিশদ ব্যাখ্যা শুনতে পেতাম। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির মন্তব্য এখনও জানতে পারিনি। ওঁরা একটু অপ্রস্তুতে পড়েছেন মনে হচ্ছে। মানুষ কতবার মতামত বদলাবে!

৩০-৩-৫৬

াঁ-বম্বে ঘুরে এলাম। অনেক ভালো-ভালো লোকের সঙ্গে দেখা হলো, কথাবার্তা হলো। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় UNESCO-র তরফ থেকে এক সেমিনারের বন্দোবস্ত করেছিল। বিষয় ছিল মোটামুটি এই: পুরাতন সংস্কৃতি ও এই যান্ত্রিক যুগের সম্বন্ধ। আমার ওপর ভার ছিল আর্ট ও সাহিত্যের দিকটা। একটা রচনা পড়লাম—ঠিক অভিভাষণ নয়, গোটাকয়েক সমস্যার ইঙ্গিত বলা চলে। নীরদ চৌধুরীকে অনেক দিন পরে দেখলাম। তার মতামতে সন্দেহের লেশ মাত্র থাকে না এবং সে সর্বাঙ্গ দিয়ে তার মতামত প্রকাশ করে। অদ্ভুত মানুষ! তার সঙ্গে কখনও একমত হতে পারিনি, অথচ তার বিদ্যা, বুদ্ধি ও চারিত্রিক বলকে সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি। যথার্থ don—ভুল ডাকে ভারতে জন্মেছে। আরো অনেকে বক্তৃতা দিলেন, কিন্তু সমাজতত্ত্বে কাউকে পোক্ত দেখলাম না। তিন-চারবার বলতে হলো তিন দিনে। তার ওপর এক সন্ধ্যায় হংসরাজ কলেজে আর একটি বক্তৃতা। শরীর ও মন নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লো। আমার পক্ষে সভা-সমিতিতে আর ঐ ধরনের হৈচৈ করা পোষায় না।

লাঙের সঙ্গে আবার ঘণ্টা দু-তিন প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করলাম। তাঁর মতামত মোটেই উগ্র নয়—অথচ মনে হলো দ্বিতীয় প্ল্যানের ড্রাফ্‌টে হতাশ হয়েছেন।

হফ্‌স্ট্রা বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভারতবাসীরা কি বিদেশীর

সম্পর্কে সত্যই humanly interested ?' আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার ধারণা একটু বেশি রকমেরই। হফ্‌স্ট্রার মতন বুদ্ধিমান, পণ্ডিত ও সহৃদয় মানুষ দুর্লভ। তাঁর দেশে ও এখানে তাঁর ছাত্ররা তাঁকে একরকম পূজা করে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়নের সভাপতি ও অন্যান্য তিন-চারটি ছাত্র আমাকে কফি খাওয়াবার সময় তাই বললে। তারা বীরেনকে (গাঙ্গুলী) অত্যন্ত ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে, তার ইঙ্গিতে ছাত্ররা অসাধ্য সাধন করতে পারে শুনলাম। শুনে খুবই খুশি হলাম। বীরেন সাধু। তার মাথা এত ঠাণ্ডা যে, হিংসে হয়। ডাঃ রাও-এর এক মন্তব্যের সে এমন ভদ্র ও নরমভাবে প্রতিবাদ করলে যে, কী বলবো! অধ্যাপকের মধ্যে এমন লোক এখনও আছে, দেখে আশা হয়, গৌরব হয়। অথচ প্রায় ত্রিশ বৎসর পড়াচ্ছে। ডাঃ রাও-এর মধ্যে ধর্মভাব ফুটে উঠেছে দেখলাম। অব্যাহতি নেই। আমার এখনও আসেনি —তাই নিয়ে রাও ঠাট্টা করলে। তার মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদাবোধ রয়েছে বললে। এক এক সময় সন্দেহ হয়, আমারও মধ্যে আছে। আবার মনে হয়, ওটা middle class virtues নয় তো ? যদি হয়ও বা, তবে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নয়। Something is not done ভাবটা থাকলে অনেক সময় রক্ষা পাওয়া যায়। কফি হাউসে অপরিচিত ছাত্রদের সঙ্গে বসে গল্প করতে বেশ লাগলো। অপরিচিত মনেই হলো না।

বোম্বাইয়ের সেমিনারের বিষয় ছিল গ্রাম ও শহরের সম্বন্ধ। অনেকগুলি গবেষণামূলক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পড়া হলো। ডাঃ শ্রীনিবাস, ডাঃ কাপাদিয়া ও শ্রীমতী আচার্য নিজের নিজের survey-র সিদ্ধান্ত যা বললেন, তাতে আমার ধারণা ইদানীং জাতিভেদ জ্ঞান যে বাড়ছে, তার সমর্থন পেলাম। আশ্চর্য এর

বাঁচবার ক্ষমতা। গ্রাম যাচ্ছে, যৌথ পরিবার গিয়েছে, অথচ জাতিভেদ কমছে না, বরঞ্চ বাড়ছে। বিহারে অন্ধ্রদেশে, তামিলনাদে, মহীশূরে, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে অত্যন্ত বেশি। জওহরলাল কিছুদিন আগে বিহারের এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, তিনি জাতিভেদ ভেঙে দেবেন। এসব কথা তাঁর নরম হৃদয়ের লক্ষণ। বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, ইসলাম, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ পারেনি, ইংরেজ আমলের কোনো আইনকানুনই পারেনি। সক্ষম কেবল অর্থনৈতিক পরিবর্তন, যার ফলে শ্রেণী উঠবে, জাতিভেদ যাবে। তারও চিহ্ন খুব স্পষ্ট নয়। আমার এক মুসলমান বন্ধু তাঁর ছোট ভাইয়ের বিবাহে একটু কুণ্ঠিত হয়েই বলেছিলেন, 'এই আমাদের পরিবারে প্রথম অ-ব্রাহ্মণ মুসলমানের মেয়ে এলো।' তাঁর বৃদ্ধা মার মন একটু খুঁত খুঁত করেছিল, তবে আজকালকার ছেলে, তায় বিলেত-ফেরত বলে বেশি আপত্তি করেননি। 'আমার মা খুব লিবারেল' মন্তব্যটিও শুনেছিলাম।

নারায়ণ ও অরুণা আসফ আলির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো। অরুণা এখন কি করবেন বুঝতে পারছেন না। নারায়ণ তার নতুন থিসিস বললে। ন্যাশনাল হেরাল্ড-এ কম্যুনিস্ট পার্টি-লাইন কি হবে তাই নিয়ে গোটাকয়েক প্রবন্ধ লিখেছিল তারই জের। অসম্ভব বুদ্ধিমান লোক—ঐ একমাত্র মেনন যে জীবনে কিছু করতে পারলে না। ওর সঙ্গে কথা কইলে মাথা চনমন করে ওঠে।

দিলীপকুমার (অভিনেতা) মন দিয়ে শুনছিল। ছেলেটিকে আমার খুব ভালো লাগলো। রোজই দেখা হতো। মোটেই নষ্ট হয়নি, ভারি sensitive মন। অভিনয় নিয়ে ভাবে। দিলীপ-কুমারের ধারণা, মেয়েরা অতি সহজে যে-পার্ট করছে তার সঙ্গে

এক হয়ে যেতে পারে, পুরুষে তা পারে না, তার বুদ্ধি-বিবেচনায় আটকায়। তথ্য হিসেবে ঠিকই মনে হলো। কিন্তু ফলে অভিনয় হয় কি না, সে কথা আলাদা। ভাবের তন্ময়তা আর্টের শত্রু খানিকটা ডুব দিয়ে সাঁতার কাটা, খানিকটা সাঁতার কেটে ডাঙায় ওঠা, ডাঙায় উঠে কাপড় ছাড়া, গা মোছা, সেজে গুজে সহজ হওয়া —রঙ্গমঞ্চ, গঙ্গার ঘাট, নদীবক্ষ নয়, স্রোতে গা ভাসানো নয়। হালিশহরের রঙ্গমঞ্চে প্রফুল্লের দশ মিনিট ধরে ডুকরে ডুকরে কান্নার জন্য যবনিকা ফেলতে হয়েছিল। দিলীপকুমারের ধারণা, বুদ্ধি-বিচার একপ্রকার বিপত্তি। তা নয়। আত্মসচেতনতা অবশ্য ভিন্ন জিনিস।

অধ্যাপক নয়রাট দেখা করতে এলেন। সেই বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান পণ্ডিত নয়রাটের পুত্র। এখন আমেরিকাবাসী, টাটা স্কুল নিয়ে এসেছে সোশ্যাল রিসার্চের উচ্চ পদ্ধতি শেখাবার জন্য। ভারি মজা লাগলো এই এক পুরুষে আমেরিকানের মনোভঙ্গির পরিবর্তন দেখে। ভাষায় আমেরিকান ভঙ্গি এসে গিয়েছে, উচ্চারণ এখনও বিদেশী এবং তথ্যের জন্য তত্ত্বকথা আলোচনা ত্যাগ করতে এখনও অভ্যস্ত হননি। ধরতাই বুলি এসে গিয়েছে, কিন্তু চিন্তাশক্তি এখনও চাপা পড়েনি। আমার বক্তব্য ছিল এই : গবেষণার পদ্ধতি (টেকনিক) গবেষণার বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে ; গবেষণার বিষয় দেশের সমস্যার সঙ্গে যুক্ত না হলে থিসিস লিখে ডক্টরেট পাওয়াই সার হবে এবং দেশের সমস্যা তার ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতএব বিদেশী পণ্ডিতের কাছে সাহায্য নেওয়ার অর্থ যতটা ভাবা যায় ততটা নয়—এই ছিল আমার ইঙ্গিত— ইঙ্গিতের চেয়েও একটু বেশি। ভদ্রলোক সেটা সহজে ধরতে পেরে ঠাণ্ডাভাবেই উত্তর দিলেন। সময় একটু অধিক লাগলো

বটে, 'তবু উত্তরটি যুক্তিপূর্ণ। তিনি কিভাবে রিসার্চ টেকনিক শেখাচ্ছেন বললেন। আলিগড়ে নিমন্ত্রণ করবো ভাবছি। ভিয়েনা কি ছিল আর এখন কি হয়েছে ভাবলে দুঃখ হয়। অস্ট্রিয়ান স্কুলের চিন্তাধারায় টিউটনিক দোষ কম, ফরাসী গুণই বেশি। অপেরার জন্য ?

৩১-৩-৫৬

উণ্ডহ্যাম লিউইস্-এর The Human Age-এর দ্বিতীয় অংশ Monstre Gai ও তৃতীয় অংশ Malign Fiesta শেষ করলাম। সেই পুরানো Childermass-এর জের। লিউইস্-এর জোর ভাষা একটু যেন দমেছে। স্যাটায়ার পেকেছে, অর্থাৎ চরিত্রগুলো নিজের বলে দাঁড়িয়েছে। Third City ও Dis-এর বর্ণনা ভয়ঙ্কর, পড়তে পড়তে গা গুলিয়ে ওঠে। পাপে জড়ানো অথচ বিবেক রক্ষা এই খৃস্টান সমস্যা ঠিক বুঝি না। এক্‌জিস্টেনসিয়ালিস্টরা যাকে involvement বলেন, সেটা কি এই ? তাঁদের অ্যাবসার্ড আর এঁর স্যাটায়ার কি এক পদার্থ ? দান্তের 'পারগেটরি' আর 'ইনফারনো'র কথা কেবলই মনে পড়ছিল। তাঁরই আধুনিক সংস্করণ ? যদি তাই হয়, তবে বলতে হবে যে, সর্বজনগৃহীত বিশ্বাসের কাঠামো এই যুগে, অতএব এই বই-এ না থাকার জন্য লিউইস্-এর রচনায় করুণা নেই। Lewis lacks compassion।

তাই তৃতীয় শহর আর শয়তানের রাজ্য এই পৃথিবীরই বর্তমান সভ্যতার উপসংহার। পুলম্যানের ট্র্যাজেডি তাই। তবু সেই ট্র্যাজেডি গ্রীক কিংবা মধ্যযুগীয় ট্র্যাজেডির মতন চিত্তকে শুদ্ধ করে না। হাতের কাছে 'ডিভাইন কমেডি'র নতুন অনুবাদ ছিল, গোটাকয়েক অংশ উল্টে পাল্টে দেখলাম। অতো অল্প কথায় কতখানি, আর এখানে অতো বেশি কথায়, অতো চেঁচিয়ে কত কম! যতটা সুখ্যাতি পড়েছিলাম, ততটার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছে। নরক, বিবেক—এ সব ঠিক বুঝি না। ভারতীয় সংস্কার ভিন্ন? মরিয়াক, গ্রেহাম গ্রীন প্রভৃতি কাল্পনিক নভেলিস্টদের রচনা খুবই উপভোগ করি, কিন্তু কেমন যেন হৃদয়ঙ্গম হয় না। বাংলা ভাষায় ঐ ধরনের বৈষ্ণব নভেল, তান্ত্রিক নভেল বলে কিছু নেই। বৈষ্ণব কবিতা, তান্ত্রিক বেতাল পঞ্চবিংশতি এককালে ছিল। এখন লেখা হলে পড়া যেতো—হয়তো তাও বুঝতাম না। মনটাই জগাখিচুড়ি, খানিকটা হিন্দু, খানিকটা অ-হিন্দু, পশ্চিমী—কোনো 'সেন্স্ অব বিলংগিঙ' নেই। হিন্দু গোঁড়ামি দেখলে সায়েব, আর উগ্র সায়েবিয়ানা দেখলে ভারতীয়! এই একশ' বছর ধরে খিচুড়িভোগ চলছে দেশে। নিরুপায়!

জাকির সায়েব সন্ধ্যার সময় এলেন। ঘণ্টা দুই গল্প হলো। অবসর নিয়ে পড়াশুনো করবেন আর লিখবেন এই আশা প্রকাশ করলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য যতদিন একেবারে নষ্ট না হচ্ছে ততদিন তাঁকে ভারতের সেবা করতেই হবে। তাঁর আদর্শবাদ, মহাত্মাজীর কাছে শিক্ষাদীক্ষা, দেশপ্রেম তাঁকে অব্যাহতি দেবে না। পণ্ডিতজীও ছাড়বেন না। অত্যন্ত সেন্সিটিভ মাইণ্ড, তাই কষ্ট পান। এ লোক আলিগড় ছাড়লে বিপদ, আবার সব ঢিলে হয়ে যাবে।

লক্ষ্ণৌ-এর অভিজ্ঞতা ভোলবার নয়। আমরা কলেক্টিভ লিডারশিপ গড়ে তুলতে পারিনি। ইংরেজদের হাজার বছর লেগেছে—তাও যতটা বলে ততটা নয়। সেখানেও দশ বারটা অ-সাধারণ গুষ্টি এখনও নেতৃত্ব করে পড়ছিলাম। ভারতবর্ষ অবতারের দেশ—এটা প্রকৃত ব্যাখ্যা নয়। গ্রাম-পঞ্চায়েত তো এককালে ছিল শুনি! এখন প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠানের আকার, সংখ্যা বেড়েছে; একই মানুষ বহু অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছে; ফলে কোনোটার সঙ্গেই প্রেম হয় না। তা ছাড়া এই ধরনের অ-বাস্তব, অ-সামাজিক অধ্যয়ন-অধ্যাপনা দেহ-মন-প্রাণকে, সমগ্র মানুষকে অধিকার করে না। কেষ্টার ব্যাগার খাটা! অনেক শিক্ষকের মুখে শুনেছি, ঐ মাসে তিনশ' টাকার জন্য যতটুকু আইনানুসারে লেক্‌চার দিতে হয় তাই দিলেই যথেষ্ট—তার বেশি কোনো দায়িত্ব নেই। জৈব প্রয়োজন থেকেই সব আগ্রহ ওঠে জানি; কিন্তু ওঠবার পর আগ্রহ ভিন্ন হয়; এক একটি আগ্রহ (ইন্টারেস্ট) পেশায় (অকুপেশনে) দানা বাঁধে, পৃথক সত্তা গ্রহণ করে, তাইতে চরিত্র (পার্সনালিটি) পাকে, ফলে বিশেষ মূল্য (ভ্যালুজ) তৈরি হয়—ডাক্তারদের, উকীলদের, এঞ্জিনীয়ারদের, মধ্যযুগের শিল্পীদের যেমন হয়েছিল। সেই মূল্যগুলো যখন ব্যবহারে (কোড্ অব্ কণ্ডাক্ট) পরিণত হয় তখন ব্যাপারটা সহজ হয়ে ওঠে নতুন লোকের পক্ষে। আমাদের দেশের শিক্ষাকেন্দ্রে তেমন কিছু হয়নি। পুরানো আই. সি. এস. দলের একটা কোড্ ছিল। আমরা এখন সব কিছুই করতে পারি, ইন্সিওরেন্স থেকে পাটের দালালি পর্যন্ত। (ইন্সিওরেন্সটা গেল বোধ হয়।) অবশ্য প্রথম থেকেই কোড্ করলে সর্বনাশ; অধ্যক্ষ হাতে মাথা কাটবেন। সব দেশেই মাস্টারদের মধ্যে নোংরামি আছে—অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজেও খুব—কিন্তু এতটা কি? এখানেও কম বেশি আছে, তবু যেন গড়পড়তায়,

তুলনায়, বিলেতের চেয়ে এদেশে একটু বেশি। অথচ আমাদের দায়িত্বও বেশি নয় কি? আমরা যে নতুন জাত। কেবল দায়িত্ব বেশি চাই নয়, সেন্স অব্ আর্জেন্সিটাও। কিন্তু কোনোটাই ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে না। যেকালে ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তে কাজ হতো, সেকাল গত, কবরস্থ দশ হাত মাটির তলায়। এ-যুগ হিরোয়িক যুগ নয়, রোম্যান্টিক যুগও নয়, টীম-ওয়ার্কের যুগ। কিন্তু টীমই তৈরি হচ্ছে না। এখনকার টীম্ মানে যারা একত্রে ভোট দেবে, তা যে-কোনো উদ্দেশ্যেই হোক। ল্যাবরেটারিতে সকলে মিলে একযোগে, এক প্ল্যানের ছকে কাজ করছে তো শুনি না। আর্টসের ডিপার্টমেন্টে, ফ্যাকাল্টিতে সবাই একাকী, প্রত্যেকেই হিরো। আর না হয় হিরোর পার্ট চাই! উপায় কি? জানি না। চোখ কান বুজে পড়ে যাও, পড়িয়ে যাও, লিখে যাও—ব্যস্। দশের কথা দেশের কথা ভেবেছো কি মরেছো?

কামুর 'মিথ্ অব্ সিসিফাস্' চমৎকার লাগলো তাই। এর অনেক অংশ Rebel-এর আগের লেখা, কিন্তু ফরাসী জানি না বলে পরে পড়লাম। অনেক ব্যাপারে সায় আছে আমার। আত্মহত্যা ছাড়া—তা এও একপ্রকার আত্মহত্যা বৈ কি! এ-যুগের মানুষ অ্যাবসার্ড, এ-যুগের যুক্তি অ্যাবসার্ড। যারা লাফ মেরে ওপারে গেল, ভগবদবিশ্বাসী হলো তারা শান্তি পেলো, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে। কেউ বললে বুদ্ধির জয়ের পরে বিশ্বাস, কেউ বললে গোড়া থেকেই বুদ্ধির হার—সেই একই কথা। জ্ঞান বুদ্ধি ছাড়াও যায় না, অথচ চার ধারে অজ্ঞানতা, irrationality; এবং দুটোর মোকাবিলা, মুখোমুখি—তাই anguish, তাই অতো হাত পা বেঁধে মার খাওয়া। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা গ্রহণ না করে উপায় নেই, অথচ করলেও সুখ শান্তির

জলাঞ্জলি। রবীন্দ্রনাথের ছিল বিশ্বাস, গান্ধীরও ছিল তাই। আমাদের, আমার, নেই।

শান্তি বর্ধনের 'লিটল ব্যালে গ্রুপ'-এর পঞ্চতন্ত্র দেখে এলাম বোম্বাই-এ। মোটামুটি বেশ। আইডিয়াটি ভালো। নাচ, পোশাক কেমন যেন! সঙ্গীতে কিছু ফিল্মী সুর ঢুকেছে। থীমটা বন্ধুত্ব, অথচ প্রোপাগাণ্ডা নয়। বর্ধন মারা গিয়ে দেশের ক্ষতি হয়েছে। তাঁর স্ত্রী চালাচ্ছেন। ওঁদের স্কুলটা চলছে এখন। প্রথমে খুবই কষ্ট পেতে হয়েছিল। বোম্বাই শহরের অনেকেই কালচারের ভক্ত। ভয় হয়। নব্য ধনীরা উৎসাহী হয়ে কালচারের সর্বনাশ করছেন দেখেছি। যাঁরা বলেন সঙ্গীতে 'ইণ্টারেস্টেড', আধুনিক সাহিত্যে 'ইণ্টারেস্টেড' লোক-সঙ্গীতে, এবস্ট্রাক্ট ছবিতে 'ইণ্টারেস্টেড' তাঁরা ভদ্রলোক, নিতান্ত ভদ্র, কিন্তু সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলার পক্ষে নিতান্ত ভয়ঙ্কর। এইসব হস্তী-হস্তিনীদের কাছ থেকে কালচারের সহস্র হস্ত দূরে থাকাই ভালো। 'ইণ্টারেস্টেড' 'ইণ্টারেস্টিং,' কথা-গুলি নিতান্ত ভুয়ো, ছেঁদো, অন্তঃসারশূন্য, এমন কি ডাহা মিথ্যা। বক্তৃতা দেবার পর ঢুলুঢুলু চোখে ভি-চোলী আর চকচকে শাড়ি রঙিন ঠোঁটে শীৎকার করে উঠলেন 'হাউ ইণ্টারেস্টিং'! বুঝলাম একবর্ণ বোঝেননি, আর ছে···লী করছেন। তবু মিষ্টি কথায় উত্তর দিতে হবে! এঁরা পার্টিতে অতো মিথ্যা কথা কন কেন? আমাদের মা পিসী মাসীরাও ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা বলতেন, বাধ্য হয়ে। এঁদের বাধ্যবাধকতা কি? পুরুষদের মিথ্যেতে সাধারণত একটা আশা পূরণ থাকে, একটা কল্পনার খেলা থাকে, কিন্তু এ কেবল যাদু ডালা। পৃথিবীতে মিথ্যার অনেক প্রয়োজন আছে—না থাকলে লক্ষ্ণৌ লক্ষ্ণৌ হতো না—কিন্তু এইপ্রকার ইণ্টারেস্টেড হবার, 'হাউ ইণ্টারেস্টিং'

বলার সামাজিক উদ্দেশ্য কি ঠিক ধরতে পারছি না। বোম্বাই-দিল্লীর নব্য সমাজ সৃষ্টি করা? হবে বা! সে যাই হোক এই 'ইন্টারেস্টিং' শব্দটি শুনলেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়।

৫-৪-৫৬

শহরের হরতাল নতুন সেলস্ ট্যাক্সের বিপক্ষে। আমার সিগারেট ফুরিয়েছে—কোনো সিগারেটই হয়তো পাওয়া যাবে না। অর্ডিন্যান্স জারি করে নতুন ট্যাক্স চাপানো হলো। উপায় ছিল না—নচেৎ সব মাল গায়েব হয়ে যেতো। আমাদের বণিক সম্প্রদায়ের মুখ বড় মিষ্টি, কিন্তু তারা সামাজিক প্রগতির শত্রু। এঁদের শক্তি কত বেশি এঁরা আমাদের বুঝতে দেন না সব সময় কিন্তু যখন বোঝান তখন হাড়ে হাড়েই বুঝি। প্রতি পরিবারে এঁদের পঞ্চমবাহিনী আছে—বাড়ির গৃহিণীরা। আদ্যাশক্তিও বণিকশক্তি একত্রিত হলে কোনো প্ল্যানেরই এমন পৈতৃক শক্তি নেই যার আশীর্বাদে সেটি সার্থক হতে পারে। অবশ্য অর্ডিন্যান্স নামটাই জঘন্য। উত্তরপ্রদেশের লেবার এন্‌কোয়ারি কমিটি একবাক্যে সিফারিশ্ করলে যে, মজুরদের মাসিক বেতন ত্রিশ টাকার কম কিছুতেই হবে না। সেটা মাত্র কানপুরের কাপড়ের কলে চালাতে সেক্সন ১৪৪-এর সাহায্য নিতে হয়েছিল। (১৪৪ না অর্ডিন্যান্স মনে পড়ছে না) অদ্ভুত দেশ, অদ্ভুত শহর কানপুর!

শুনেছি শাক সব্জি পাওয়া যাবে না। না পাওয়া যাক, ফল ? তাও মিলবে না। রুটি মাখন ডিম ? তাও না। সম্পূর্ণ হরতাল। অবশ্য বেশি দাম দিলে সবই পাওয়া যাবে শুনছি। তাই দেওয়া যাবে। কিন্তু মুরগীর ডিমের দাম এত বাড়ে কেন ? এর ইকনমিক্সটা কখনই ধরতে পারিনি। মালথাস্-এর ব্যাখ্যা অচল। মার্কস যতদূর মনে পড়ছে এ সম্বন্ধে নীরব। কীন্সের কনজাম্পশান ফাংশান ? উঁহু। হীক্স ? নাঃ। জার্নালগুলো ঘাঁটতে হবে। সিম্পেথেটিক রাইজ নয় তো ? মুর্গীর ডিমের দাম কমে বাড়ে কেন তাই জানি না অথচ অর্থনীতির অধ্যাপক ! অল্প সময়ের বিশ্লেষণে আমার খানসামা বিশ্বাসী কিন্তু। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই : অর্থনীতিতে যে প্রাইস-থিওরী আছে তার সাহায্যে সংসার চলে না, অন্তত আমার সংসার চলে না। মেয়েরা আর বোনেরা সংসার চালায়—জেনে চালায় কিনা জানি না, তবে চলে তাঁদের কৃপায়—অর্থাৎ তাঁদের না হলে চলে না। হগ্ সাইকেল-এর মতো এগ্-সাইকেল আছে কি না জিজ্ঞাসা করতে হবে এশান্ রশীদকে—সে বিলেত থেকে বিজিনেস্ সাইকেল-এর থিওরী শিখে এসেছে।

নানাপ্রকারের ‘দায়িত্বহীন’ মন্তব্য মনে উঠছে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিং অসম্ভব, যতক্ষণ এই ট্রেডিং সার্ভিস করায়ত্ত না হচ্ছে। সমাজতত্ত্বের দিক থেকে বলা চলে আমাদের বণিক সম্প্রদায় অর্থাৎ ছোট বড় মাঝারি বণিক সম্প্রদায়ের কায়েমী সত্ত্ব অগ্রগতির অন্তরায়। সেল্স ট্যাক্স না বাড়ালে ডেভেলপমেণ্টের টাকা আসতো কোথা থেকে ? অবশ্য পদ্ধতি সম্বন্ধে ও দু’-একটা অন্য ব্যাপারে আমার খুব আপত্তি।

মার্কান্টিলিজম, কমার্স ক্যাপিটাল সম্বন্ধে যে সব বই পড়েছি তাতে মনে হয় না যে, আমাদের এই বণিকের দল কোনো

ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পন্ন করছেন না। এঁদের সঙ্গে তাঁদের কোনো মূলগত মিল নেই। অর্থনীতির বই-এ পড়েছি স্পেকুলেশন সব সময় নিরর্থক নয়, বাজারের দিক থেকে তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ ব্যাপারই অন্য। অবশ্য পৃথিবীতে সবই দরকারি, বিষধর সর্প থেকে খাণ্ডারবাহিনী শাশুড়ি পর্যন্ত প্রত্যেক পদার্থের পক্ষে ওকালতি করা যায়। কালাবাজারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও ওকালতি শুনেছি ও পড়েছি। তবু মনে হয়, এগুলো না হলেও চলতো। কেবল তাই নয়, এগুলো অন্যায়, গান্ধীজী বলতেন, চরিত্রের দিক থেকে, আমি বলি আর্থিক ডেভেলপমেণ্টের দিক থেকেও। ব্ল্যাকমেলিং দেশে বেশ চালু হয়ে উঠলো। অথচ বলছি সোশিয়ালিস্ট প্যাটার্ন। ঠিক বুঝি না।

যে যাই বলুক, প্ল্যানিং মানে ফিজিকাল কণ্ট্রোল, মালের উৎপাদনের ওপর ও তার বিতরণের ওপর। আপাতত সম্ভব নয় জানি, তবু···।

৬-৪-৫৬

ফরাসী দেশে ফ্যাশিজম নতুন রূপ নিয়েছে—Poujadism-এ। ঐ বণিক সম্প্রদায়ের ট্যাক্স দেবার অনিচ্ছা থেকেই সেটা ফুটে উঠলো।

' ফরাসী দেশের Poujadism-এর প্রাদুর্ভাব সংক্রান্ত গোটা-কয়েক ভালো প্রবন্ধ পড়লাম। ইনকাম-ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়াটা ফরাসীরা আর্টে পরিণত করেছে। কেবল ইনকাম-ট্যাক্সই নয়, প্রত্যেক ট্যাক্স। শাসনপদ্ধতি অতোটা কেন্দ্রীভূত হলে ফাঁক থেকে যাবেই। এই কেন্দ্রীকরণ চতুর্দশ লুই-এর আমল থেকে চলছে। সেণ্ট্রালাইজেশনের বিপদ ঐখানে। মারা পড়ে সৎলোকেরা, মধ্যবিত্ত কেরানীরা। তারা সেইজন্য সরকারের ওপর যায় চটে।

আমাদের দেশেও ঐ বিপদের আশঙ্কা আছে। ইনকাম ট্যাক্সের কত যে ফাঁকি চলছে এখানে তা কহতব্য নয়। একজন বললেন, প্রতি বৎসর একশ' কোটির কম নয়। তাঁর বলবার অধিকার আছে। এটা যদি সত্য হয়, তবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার জন্য পরের কাছে হাত না পেতে দেশের মধ্যেই একটু কড়াকড়ি করলেই তো হয়! যখন শুনি অমুকের কাছে অতো লাখ টাকা ইনকাম ট্যাক্স হিসেবে পাওনা এবং সরকার তার অর্ধেক নিতে রাজি হয়েছেন—'সমঝোতা' হয়েছে, তখন মনে হয় গরীব অধ্যাপক না হয়ে বড়লোক ব্যবসাদার হলেই পারতাম। যুদ্ধের সময় দেখেছি যে, বড়লোক হওয়া খুব শক্ত ব্যাপার নয়।

আমার বদ্ধ ধারণা দেশে যথেষ্ট অর্থ আছে। রাজা-রাজোয়াড়ার, মেয়েদের, মোহন্তদের কাছে বিস্তর সোনা রূপো হীরে জহরত আছে। ইনকাম ট্যাক্সে ভীষণ ছেঁদা রয়েছে। বণিক সম্প্রদায় সেলস্ ট্যাক্সে খুবই ফাঁকি দেন, ক্রেতার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। রাষ্ট্র যে সর্বসাধারণের এটা আমরা এখনও বুঝিনি। বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়া বাহাদুরি ভাবি। ফরাসীরাও রাষ্ট্রকে আপন ভাবে না। পুলিশকে আমরা এখনও শত্রু ভাবি—ফরাসীরাও তাই ভাবে।

পার্লামেণ্টারি ডিমক্রেসি ফরাসীদের কাছে, আমাদেরও কাছে

বিদেশী সামগ্রী। ফ্রান্সে ফিনান্স ক্যাপিটালের প্রভাব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালের চেয়ে বেশি। নিচে ছোটখাটো বণিক আর চাষী। প্রথম অবস্থাটি আমাদের নয়। কিন্তু এক জায়গায় মিল আছে, সেটা বুরোক্রেসির ক্ষমতায়। ফ্রান্সের সব প্ল্যানের তলা ফুটো করে দেন ওঁরা, আর ডোবান ফিনান্সিয়াররা। আমাদের প্ল্যান যাঁরা চালাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই প্ল্যানে ঘোরতর অবিশ্বাসী। আমেরিকায় রুজভেল্টের নিউ ডীল কর্মচারীদের হাতেই খতম হয়, পিছনে থাকতেন ওয়াল স্ট্রীটের ফিনান্সিয়ার। অথচ রুজভেল্ট দেশের বাছা বাছা লোক নিজের চারপাশে জুটিয়েছিলেন। প্রশান্তবাবু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের একত্র করলেন, প্ল্যানফ্রেম তৈরি হলো—কিন্তু, কিন্তু হুঁকো নলচে গেল বদলে, রইলো কেবল কল্কেটি। খাশা বন্দোবস্ত! পণ্ডিতজী কি বলবেন জানি—আস্তে আস্তে এগুতে হবে, সকলকে নিয়ে, দেখা যাক কি হয়। In the ultimate analysis তাই হবে, আপাতত খেটে যাও, we are doomed to hard labour !

৭-৪-৫৬

কাল 'ভাইভা' পরীক্ষা নিলাম। এরা কীন্স না পড়ে ডিলার্ড পড়ে, সরকারি রিপোর্টের বদলে বাজারের সস্তা টেক্সট বই ঘাটে;

ছু'রকম মাল্টিপ্লায়ারের পার্থক্য জানে, কিন্তু কোন্ অবস্থায় কোন্টা খাটে, তাদের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা কি, এদেশে সেগুলি সচল না অচল, কিছুই জানে না। তিনটি dissertation কিন্তু মন্দ নয়— একটার বিষয় ছোট শহরের সোনা-রূপোর কারবার, দ্বিতীয়টির আলিগড়ের কাঁচা ও পাকা আড়তের লেনদেন, আর তৃতীয়টির এই শহরের ঘরবাড়ির সমস্যা। এই ধরনের বাস্তব গবেষণার সাহায্যে যদি কিছু ইকনমিক্স তৈরি হয়। থিওরী শিঁকেয় তুলে রাখতে হবে না, মাত্র বাস্তব জগতের ওপর আপাতত বেশ দিনকয়েক জোর দিতে হবে, তবে যদি কিছু হয়।

শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কেউ যদি আমার হয়ে লেখে, তবে যে ক'টা কথা খাপছা খাপছা মনে আসছে, সেগুলো অক্ষরে ধরা পড়ে।

(১) পাপ মানতে গেলেই ভগবান মানতে হয় এবং সে ভগবান ছু'মুখো। (২) ছু'মুখো ভগবান নিতান্ত পলিটিক্যাল জীব। (৩) আপত্তিটাই বা কি? এযুগের ভগবান ন্যাশনাল নিশ্চয়, কিন্তু ইখ্নাটনের মোনোথিয়ীজম্ও তো ইম্পিরিয়াল ছিল! (৪) ভগবান মানবো না, পাপ স্বীকার করবো, অনন্ত মানবো না ক্ষণ মানবো, সংসার দুঃখময় মানবো না কষ্ট পাবো, নিয়ম মানবো না পরিবর্তন চাইবো, ন্যাচরল ল' মানবো না অথচ স্টোইক হবো, বিশ্বসত্তা নেই আত্মসত্তা আছে, আত্মা নেই আত্মীয় খুঁজবো,—এই হলো আধুনিক মনের দ্বন্দ্ব। বিভক্ত মন নিয়ে মানবিক ঐক্যসাধন অসম্ভব, সম্ভব কেবল কোল্ড ওয়ার। বিজ্ঞানের দোষ নয় কিন্তু। বিজ্ঞানের জন্যই আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হইনি। বরঞ্চ বিশ্বজনীন নিয়মের অধীনতায় বিশ্বাসই জন্মায়। অবশ্য বিজ্ঞানের ঐক্য হলো

পোটেনশিয়াল ইউনিটি। ওপেনহাইমার লিখেছেন পৃথিবীর যাবতীয় দ্বৈততা (গ্রেট অ্যান্টিনোমিস) মানুষকে বিভক্ত করেছে ও সেই সঙ্গে একত্রিতও করেছে। একমত। (৪) বাস্তবিকই কি দ্বৈততা ? বোধ হয় তার চেয়েও গভীর—অ্যালিনেশন, সৃষ্টি থেকে ভোগের বিচ্ছিন্নতা। তাই নিরানন্দ, দুঃখ ? (৫) উপনিষদের আনন্দ, রবীন্দ্রনাথের আনন্দ—ধরা যাক এক—ব্যাপারটা কি ? ভোগের নয়, সৃষ্টির শুনেছি। কিন্তু সৃষ্টিরই বা আনন্দ কি ? প্রতিদিন ভোরবেলা সূর্যোদয় দেখি, আনন্দ হয় আমার, সূর্যের আবার আনন্দ কি ? অথচ প্রতি প্রত্যূষে নতুন সৃষ্টি হচ্ছে, লাল করবীর রঙ বদলাচ্ছে, নিমগাছের ফুল ঝরছে, কচি পাতা গজাচ্ছে, ডালিম গাছ ফুলে ভরে উঠলো। আমার ভালো লাগলো, আনন্দ হলো আমার। উদ্দেশ্যহীন প্রকাশ, বিস্তার, স্ফুরণ, এই আনন্দ ? না, মেয়েটি প্রথম মা হচ্ছে। তার চোখে আলো পড়েছে, দেহপূর্তি হচ্ছে, একে আনন্দ বলবো ? প্রকাণ্ড ক্যানাডিয়ান এঞ্জিন, সুপার কনস্টেলেশন হাওয়াই জাহাজ, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের গদ্য, পঞ্চাশতলা স্কাইস্ক্রেপার, রাইটের স্থাপত্য—আনন্দ পাই, ঠিক যা চাইছে তাই হচ্ছে বলে—ফাংশান্যাল। উপনিষদের আনন্দ এ জিনিস নয়। শক্তির বিকাশে যে আভা প্রকাশ পায়, তাকেই আনন্দ নাম দেবো ? কথাটার বর্তমান অর্থ আমাকে বুঝতে দিচ্ছে না। আনন্দ, আনন্দময় কোষ, আনন্দলহরী, আবার সাঁওতাল পরগণায় বাঙালী-বাবুদের আনন্দধাম। বিয়ের কনের আনন্দপট আর আনন্দনাড়ু, আর বোম্বাই অঞ্চলের আনন্দী রাগ, বিজয়ার দিন আনন্দা লবণ, সবই নন্দ ধাতুর খেলা।

নলিনী (গুপ্ত) বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তিনি তাঁর নব্য বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান পাঠিয়েছেন। তাঁর যে

আমাকে মনে আছে দেখে মনটা কেমন করে উঠলো। অনেক রাতে প্রমথ চৌধুরীমহাশয়ের বাড়ি থেকে ফিরতাম। কে বলে বাঙলা সাহিত্য মরেছে, কে বলে বাঙালী চিন্তা করে না? কি গভীর মানুষ এই নলিনীবাবু! কি অদ্ভুত ঘন ভাষা, চিন্তা, আর ব্যালান্স! পাণ্ডিত্য এর হজম হয়ে গিয়েছে। অন্য স্তর থেকে ভাবা আর লেখা। অথচ সেদিন বর্তমান বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে একটি লম্বা প্রবন্ধ পড়ছিলাম—নলিনীবাবুর নামোল্লেখ নেই। আমি বৈজ্ঞানিক নই অধ্যাত্মজ্ঞানীও নই, অতএব তথ্য ও তত্ত্বে কতটা সত্য, আর কতটা ভুল বুঝতে পারলাম না। সত্যেন (বোস) কি বলে? অধ্যাত্মজ্ঞানের দিক থেকে কে বলতে পারে? কিন্তু পৃথক পৃথক সমালোচনা করলে চলবে না। দুটোর ওপরই সমান অধিকার যার আছে সেই পারবে, যদি অবশ্য সে লিখতে জানে। আমার কোনো অধিকারই নেই—কেবল কৃতজ্ঞ হবার অধিকারই আছে।

৯-৪-৫৬

এক চুমুকে অমলের (হোম) 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' শেষ করলাম। গলার কষ্টটা বেঞ্জইন ভেপারে যাচ্ছিলো না, হঠাৎ চলে গেল।

অমৃতসরে মোতিলালজীর ভ্রূকুঞ্চন, রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নেওয়া, সি. এফ. এণ্ডরুজের গুরুদেবের চাহনিকে ভয়, শমী 'তাহার পরে আর ফিরিল না,' এগুলো অনন্ত মুহূর্ত। এদের ভেতর দিয়ে যে মূল্যজ্ঞান বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তাকে সম্মান দেওয়া প্রকৃত শালীনতার লক্ষণ। মনে রাখা, মনে করিয়ে দেওয়া—এইটাই ঐতিহ্যের প্রাণ-প্রক্রিয়া। অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা। মার্সেল তাকে বলেন উইজডম, আমরা বলি ঋণ-শোধ।

কিন্তু শোধ কিছুতেই হয় না। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, মোতিলাল, জিন্না এঁরা বিপ্লবী মানুষ—ইতিহাস তাঁদের খুলেছে আবার বেঁধেছে। বেঁধেছে, কারণ এঁদের ক্রিয়াকলাপ সাময়িক প্রতিবেশের আশীর্বাদে ঘটেছিল। খুলেছে, কারণ এঁদের প্রতিবাদ দুই স্তরের, মৌলিক প্রতিবাদ নিয়তির বিপক্ষে এবং সেই মৌলিক প্রতিবাদের বিপক্ষে মানবিক প্রতিবাদ। দুটো এক হয় যখন, তখন মন, কাজ, সব ঝক্‌ঝকে তর্‌তরে, lucid।

কামু লিখেছেন,—

'Opposite the essential contradiction, I maintain my human contradiction. I establish my lucidity in the midst of what negates it. I exalt man before what crushes him and my freedom, my revolt and my passion come together then in that tension, that lucidity and that vast repetition.'

এখনও টেনশন চলছে, এখনও দেশে-বিদেশে অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি চলছে—নেই লুসিডিটি—কারণ প্যাসান নেই। বোধ হয় আফ্রিকায় আছে—কামু একপ্রকার আফ্রিকান, তাই বোধ হয়

কিছু বুঝেছেন। আগামী ইতিহাসের ঋণ পরিশোধ হয় না, চক্রহারে সুদ বেড়েই যাচ্ছে। পুরানো কথার অর্থ ঋণ পরিশোধের প্রয়াস। তার মধ্যে একত্রে থাকবে ঐ ফ্রীডম, ঐ রিভোল্ট আর ঐ প্যাসান। বাকি সব বৃদ্ধের বকবকানি!

১০-৪-৫৬

জন গ্যাণ্টারের 'ইন্সাইড আফ্রিকা' প্রায় শেষ হলো। প্রায় নয়শ' পৃষ্ঠার বই, কিন্তু ঝরঝর্ তর্তর্ করছে। একটা অংশ বাদ পড়ে গেল তবু। মোটামুটি একটা ছবি পেলাম। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব আফ্রিকান স্টাডিজ-এর উপদেষ্টা হয়ে বন্ধু হক্স্ট্রা এসেছেন। আফ্রিকার সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। গ্যাণ্টারের বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকা ভিন্ন অন্যত্র যে আলোড়ন চলছে, তার প্রকৃতি জাতীয়তাবোধ, ন্যাশনালিজম। দক্ষিণ আফ্রিকায় ও রোডেশিয়ায় সেটা একপ্রকার শ্বেতজাতির ন্যাশনালিজম গ্যাণ্টার কোলোনিয়ালিজম বরদাস্ত করেন না মোটেই এবং এই মন্থনের পর অমৃত উঠবে না গরল উঠবে, সে সম্বন্ধে চিন্তিত। গরল অর্থে তিনি কম্যুনিজমই বোঝেন। তিনি অবশ্য বলছেন, কম্যুনিজমের আশঙ্কা নিতান্ত

কম। কিন্তু শঙ্কা আসার কথাই ওঠে না। যদি নির্যাতিত মানুষ প্রোপাগাণ্ডার জোরেই কম্যুনিস্ট হয় ভাবা যায়, তবে অবশ্য অন্য কথা। আমার এই ধরনের খোঁজাখুঁজি নিতান্তই অ-বৈজ্ঞানিক মনে হয়। অথচ গ্যাণ্টারের রিপোর্ট অদ্ভুত রকমের 'অবজেক্টিভ'। এই 'অবজেক্টিভিটি'র মধ্যে কতই না গোঁজামিল থাকে। চরিত্রাঙ্কনে গ্যাণ্টারের সমকক্ষ তুর্লভ। সোয়াইৎসার, নাসের, এনক্রুমা প্রভৃতির রূপ যেন ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এলো। কত মজার খুঁটিনাটি ঘটনাই না আছে বইখানিতে। একেবারে শ্যেনদৃষ্টি। ঠিক এই ধরনের 'রিপোর্টাজ' খাঁটি আমেরিকান সৃষ্টি। এমন রসালো, জীবন্ত, চলন্ত রূপ, অথচ নির্বাচিত ঘটনাই আশ্রয়—ভূয়োদর্শন থেকেও নেই—একটা মোটামুটি লিবারেলিজম-এর অন্তঃশীল টান রয়েছে। আরেকটুকু ওপাশে ঠেলে দাও তো এরেনবার্গ, আর ওপাশে দাও তো দিনের, সপ্তাহের, পক্ষের মাসের ইতিহাস। নতুন আর্ট। গভীর বিশ্লেষণ চেয়ো না কিন্তু। এই মহাভারত কে পড়বে জানি না। গ্যাণ্টার যদি আর পাঁচ বছর পরে এদেশে আবার আসেন তো মন্দ হয় না। তাঁর চোখ দিয়ে নতুন করে নিজেদের দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। পণ্ডিতজী থাকতে যেন আসেন।

১১-৪-৫৬

আজকের ডাক-এডিশনের 'ন্যাশনাল হেরাল্ড'-এর প্রথম পৃষ্ঠায়

একটি খবরের শীর্ষক "সোভিয়েট লীডারস্ এনগেজমেণ্টস ইন ইউ কে রেস্‌ট্রিক্টেড"—আর কালকের দিল্লী এডিশনের স্টেটস্‌ম্যান-এর ৬ পৃষ্ঠায় ৬ স্তম্ভের নিচে সেই একই রয়টারের খবরের শীর্ষক হলো Wider contacts with British people desired, Soviet Leaders U. K. visit' খবর এক, দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন। দুই-ই অবজেক্টিভ, দুই-ই সত্য খবর। ন্যাশনাল হেরাল্ড ইঙ্গিত দিচ্ছে, গতায়াতের স্বাধীনতা কেবল রাশিয়াতেই খর্ব হয় না, ইংলণ্ডেও হয়। আর স্টেটস্‌ম্যান ইঙ্গিত দিচ্ছে, রাশিয়ান নেতারা ইংরেজ জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন, অতএব সাবধান। শেষেরটি উহ্য। স্টেটস্‌ম্যান-এর সাজানো বেশি 'অবজেক্টিভ' মনে হওয়াই স্বাভাবিক—প্রায় নিউট্রাল। ন্যাশনাল হেরাল্ড-এর সাজানোটি ক্রিটিকাল মনে হবে—কিন্তু ক্রিটিসিজম্‌টাও অবজেক্টিভ। ন্যাশনাল হেরাল্ড পাঠকের চোখ খোলে, স্টেটস্‌ম্যান চোখের সামনে রাখে। দুটো উদ্দেশ্য ভিন্ন।

স্টেটস্‌ম্যান-এর এক চমৎকার শিল্প-চাতুর্যের কথা স্মরণ হচ্ছে। তারিখ ঠিক মনে নেই। আবাডি কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ এবং সোশিয়ালিস্টিক প্যাটার্নের প্রস্তাব যে পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল, তার মধ্যে একটা 'বক্স'-এ একজন ডুবুরি বরফ ভেঙে ওপরে উঠছে এই ছবিটা ছিল। তার তলায় লেখা দি কোল্ডেস্ট পিকচার। এই বিদ্রূপটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। অনেকদিন ছবিটা তুলে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম তারিফ জানাবো। হয়ে ওঠেনি, কাটিংটা হারিয়ে গিয়েছে, তাই হয়তো কিছু ভুল হতে পারে।

রুশ কম্পোজার শস্টাকোভিচ সম্বন্ধে ডেসমণ্ড শ-টেলার লিখছেন :

The tenth symphony represents a new and

masterly synthesis of those alternating moods—broading melancholy, bitter irony, bursts of frantic exuberance—which in combination make him seem something of a modern Hamlet.

খাসা ভাষা, কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না। বিষাদ, অদম্য স্ফূর্তি—জানি, আবদুল করিমের ও ফৈয়াজ খাঁ'র গানে, এনায়েৎ খাঁ'র সেতারে, আলাউদ্দীনের সরোদে পেয়েছি, কিন্তু তিক্ত শ্লেষ-বিদ্রূপ রসটা কি? তার ওপর হ্যামলেট! এ-ধরনের সাহিত্যিক সমালোচনা উপভোগ্য নিশ্চয়, যেমন নেভিল কার্ডুসের ক্রিকেট আর ডারুইনের গলফ্ সম্বন্ধে রচনা। সঙ্গীত আলোচনায় বার্নার্ড শ' সমাজতাত্ত্বিক, আর নেভিল কার্ডুস সাহিত্যিক। তাঁরা সঙ্গীতের আঙ্গিক সম্বন্ধেও জ্ঞানী নিশ্চয়, তবু তাঁদের রচনার প্রধান আকর্ষণ সাহিত্যের। খানিকটা অনিবার্য নিশ্চয়, তবু একটা মস্ত ফাঁক থেকে যায়।

আমাদের সঙ্গীত আলোচনাতেও এই ব্যাপার ঘটছে। দেশী, বিদেশী পত্রিকায় যে সব সঙ্গীত আলোচনা পড়ি, তাতে আমার সঙ্গীত উপলব্ধির বিশেষ সাহায্য করে না। বোধ হয়, ঐ ধরনের সাহিত্যধর্মী আলোচনা আমাদের সঙ্গীতে প্রযোজ্য নয়। আমাদের রাগের একটাই mood, তার বৈচিত্র্য তালে ও অলঙ্কারে, তাও আটঘাট বাঁধা। সেদিন দেখছিলাম এক ইংরেজী দৈনিকের সঙ্গীত সমালোচক পূরিয়ার ঠুংরি চেয়েছেন। এ যেন কচি খোকার সোনার পাথরবাটিতে কাঁঠালের আমসত্ত্ব চাওয়া। হয়তো বড়মানুষের আদুরে ছেলে চাইলে পায়। কিন্তু রসভঙ্গ করা যেন সত্যের অপলাপ মনে হয়। তা ছাড়া রাগের mood ঠিক মানবিক নয়, ওটা নিতান্তই নৈর্ব্যক্তিক। কথা দিয়ে রাগের mood কিছু

বদলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—তাও বেশি নয়। রাগের মধ্যে bitter irony কি করে ঢোকে জানি না। এগুলো শ্রোতার আরোপ। কারুর রামায়ণ শুনলে সীতার বিরহে দুঃখ হয়, আবার কারুর হারানো রামছাগলের কথা মনে ওঠে। শ্রোতার মানসিক অবস্থা এতই বিচিত্র যে, তার ওপর বিশ্বাস রাখা চলে না। তা ছাড়া বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিই তো আর্টের একটি প্রধান কাজ! সঙ্গীত আলোচনা টেকনিক্যাল হলেই সঙ্গীতের উন্নতি হয়, প্রসার অবশ্য না-ও হতে পারে। কিন্তু প্রসারের জন্য কি প্রকৃতিকে বিসর্জন দেবো?

একবার ওঁকারনাথ ঠাকুরের আসরে আমাকে সভাপতিত্ব করতে হয়। বোধ হয় তাঁকে সম্মানপত্র দেওয়া হচ্ছিলো। যেমন সুকণ্ঠ, তেমনই পার্সনালিটি, তেমনই হিন্দী ভাষণ! একেবারে রাজযোটক! ভাষণে তিনি বললেন, রাগ-রাগিণীর লিঙ্গভেদ, বয়সভেদ পর্যন্ত আছে—ভাব ও রসভেদ তো রয়েইছে। এবং গেয়ে দেখাতে লাগলেন। সকলেই স্বীকার করলে আছে এবং রয়েছে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কি জানি কেন দুষ্টুবুদ্ধি মাথায় চাপলো। বললাম, পর্দার আড়াল থেকে যদি গাওয়া হয়, তবে কি পুরুষ স্ত্রী, বয়স কি বোঝা যাবে? অন্য লোকে যদি কেবল সারেগামা দিয়ে রাগটি প্রকাশ করে, তবে? যদি তাল বদলানো যায়, তবে? এই ধরুন বলে রামকেলী আর কালাংড়ার ধ্রুপদী রূপ দেখালাম শব্দ না ব্যবহার করে, তাল না দেখিয়ে, মাত্র আ আ দিয়ে। তারপর রামকেলী ও কালাংড়ার দ্রুত রূপ দেখালাম ঐভাবে। শ্রোতারা ভাবভেদ ধরতেই পারলে না। তারপর কালাংড়ার একটা বিদ্যাসুন্দরী টপ্পায় সারগম গাইলাম, পরে কথাবিহীন 'কাদের কুলের বউ'। ভাবভেদ প্রকট হলো শ্রোতাদের

কাছে। কোনো রাগের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করিনি। এই রকম-ভাবে মেঘ ও সারং-এর তথাকথিত ভাবগত পার্থক্য যৎসামান্য দেখানো সহজ।

আমি রাগ-রূপের কথাই বলছি, শব্দসম্পন্ন গানের ব্যাপারই অন্য। সেখানে bitter irony আনা যায় কথার মাধ্যমে। তবে কেমন লাগবে বলা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হয়তো পারতেন, যদি তাঁর হৃদয়ে তিক্ততা থাকতো। তা ছিল না। এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তমহাশয় যতদূর জানি, সঙ্গীত রচয়িতা নন।

মার্কাস স্টোনের অভিমান, মৃত প্রভুর জন্য কুকুর বিছানায় মুখ রেখে কান্না, দোলায় চড়া মোহিনী, আয়েগা আয়েগা আয়েগা—এ হলো কুমুদার (রাধাকুমুদ) চা খাওয়া, অর্থাৎ চায়ে দু'-এক ফোঁটা দুধ আর ছ' চামচ চিনি। আলিগড়ে একজন ভদ্রলোকের কাছে গল্প শুনছিলাম—'ক চামচ চিনি দেবো ?' 'যাতে চামচটা খাড়া থাকতে পারে।' এ আবার চিনি নয় গুড়। ছবি, গানে গুড় ঢাললে খোকাদের ভালো লাগে। আর্ট আর যাই হোক, jam নয়। কীর্তন তাই এখনও বরদাস্ত হলো না। আম মানে দশেরী—সফেদা—ল্যাংড়া—সোবির খাশ—আর ভারতীয় ঐক্য-সাধনের জন্য জোর এলফন্সো। মধুচুষী, বেগমবাহার, ভূতো বোম্বাই, সিঁদুরে, গোলাপখাশ আম নয়। বেশি মিষ্টি, বেশি সুন্দর—একটু যেন বেশি বেশি। সামনে একটা মাদ্রাজী আম রয়েছে—খানসামা পছন্দ করে এনেছে। এটা আম নয়, ঐ ধরনের মুখ পার্টিতে দেখেছি।

আমের আম্রত্ব বুঝতেন চৌলাখীর নবাব, কদর পিয়ার এক বংশধর। আর বুঝতেন ঠুংরি ও পান-জর্দা। ভালো গানের সময় তিনি গলে যেতেন, নিজেকে সামলাতে পারতেন না। একদিন সকালে কৈসারবাগের এক নবাব-বাড়িতে গান গাইছেন কাশীর বিদ্যাধরী। অমন ভৈরবী অনেক দিন শুনিনি। নবাব সাহেব পাশে বসে, সাড়া নেই, শব্দ নেই, আহা নেই, বাহবা নেই, একেবারে গুম। গান থামলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নবাব সাহাব, তবিয়ত কেমন ? বাড়ির খবর ভালো তো ?' গম্ভীরভাবে বললেন, 'আজকের কাগজ পড়েছেন ?' কিছুই বুঝলাম না। 'ছোট সাহেবের বক্তৃতা পড়েছেন ?' 'পড়েছি। কিন্তু…' 'কাল কৈসারবাগের বারদোয়ারিতে আমের নুমায়েশ খেলা হয়েছিল। সেখানে লাট সাহেব কিনা বললেন যে, বোম্বাইয়ের এলফন্সোর তুলনা হয় না !' তখন বুঝলাম। 'আচ্ছা, আপনিই বলুন, উনি আমাদের মেহমান, অতিথি, অতিথি এসে আপনাকে বললেন যে, আপনার পিলাও ভালো নয়, আপনার মুসল্লম ভালো নয়। এ কী রকম আদব্ !' তারো অতিরিক্ত কিছু ছিল। চুপি চুপি আপন মনে বললেন, 'ইয়ে কভী হো শক্তা !' অর্থাৎ দশেরী, সফেদা সমর-বেহেস্ত, বাদশা পসন্দ্—এদের সঙ্গে তুলনা কি সম্ভব হতে পারে, মানুষে করতে পারে ! আবার আস্তে আস্তে বললেন, 'বোম্বাইয়ে শুনেছি, লোকে বিবিকে তুম্ বলে ডাকে। তাই হবে বা !' লাট সাহেব বোম্বাইয়ের লোক। নবাব সাহেবের সেদিন ঠুংরি শোনাই হলো না। এটা লক্ষ্ণৌ-এর সুখ্যাতি নয়, অন্য শহরের অখ্যাতি নয়—এটা মাত্র রসবিচার, যে-রস গেঁজে যায়নি, তাড়ি হয়নি, গুড়েও পরিণত হয়নি।

১২-৪-৫৬

আমাদের উর্দুর অধ্যাপক সেখ রশীদ সিদ্দিকী রসজ্ঞ ব্যক্তি। হাল্কা প্রবন্ধে তিনি সিদ্ধহস্ত। নিতান্ত আস্তে কথা কন, অত্যন্ত বুদ্ধিমান। প্রায় রোজই বাগান থেকে ফুল পাঠান, আর কলেজে এসে দুটি গার্ডেনিয়া দেন। বছরের প্রথম সরষে ফুলের তোড়া পাঠিয়েছিলেন, এক সায়েরীর সঙ্গে। একদিন বলছিলেন উত্তর প্রদেশের বৈদগ্ধ্য এটাওয়া স্টেশনের ওপারে শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, উনাও পর্যন্ত। তাই থেকে ভঙ্গী, উচ্চারণ, কহন-সহন প্রভৃতির সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্বন্ধে কথাবার্তা চললো। এ এক রকম U ও non-U শ্রেণীর ভেদ-বিচার।

ছেলেবেলায় বাংলা দেশের, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার পার্থক্য বোঝা যেতো। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলতেন, কৃষ্ণনগর শ্রেষ্ঠ। বিজয় মজুমদার মহাশয় বলতেন কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইল পর্যন্ত গঙ্গার দু'ধার। রাজসাহী-পাবনা বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে এক বিশেষ কালচার দেখেছি। কেবল তাই নয়, বাগবাজার-শ্যামবাজার আর কালিঘাট-ভবানীপুর এক ছিল না। বালিগঞ্জের দ্রুত পরিবর্তন এক অদ্ভুত ব্যাপার। রাস্তায় হাঁটলে নিজেকে বিদেশী মনে হয়। বাংলা দেশের কেন্দ্রগুলি সব লোপাট হয়ে গেল। একজন পুরানো বেহারি ছাত্র বললে, ভাগলপুর আর গয়া এখন সব একাকার। কাশী বোধ হয় কাশীই রয়ে গেল, বিশ্বনাথের কৃপায় বা!

কারণ আছে। কিছু কারণ জানি। তবু, পরিবর্তন বিষাদময়।

দুর্গন্ধ নালা আর কে চায়! তবে ভদ্রতা, শালীনতা, বৈশিষ্ট্য ছিন্ন-ভিন্ন হলে 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা!' বয়সের চিহ্ন? দোষই বা কি তাতে? Graciously যদি বৃদ্ধ হওয়া যায়, তবে বিক্ষোভের কারণ নেই। এলিয়ট maturity of manners-কে কালচারের অঙ্গ বলেছেন। বুড়ো খোকা বুড়ো খুকী না হলেই হলো, আর স্বর্ণযুগের জন্য হা-হুতাশ না করলেই হলো। ব্যাপারটা কালাতিপাতের স্বীকৃতির সঙ্গে কালের অধীনতা অস্বীকার। কালের টানা-পোড়েন পাকা হলে চরিত্র খাপী হয়। কালচার আর ক্যারেক্টার এইখানে এক। ইন্দিরা দেবীকে মনে পড়ছে। আরেকজন পুরুষকে, যিনি আমার আত্মীয় ছিলেন।

১৩-৪-৫৬

আজ কি চৈত্র-সংক্রান্তি? আজই তো জেলেপাড়ার সঙ বেরুবে? আজই না চড়ক-পুজো? ছেলেবেলায় একবার চড়কের মেলায় যে দৃশ্য দেখেছি, ভাবলে এখনও ভয় হয়। একত্রে নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর। পিঠে মোটা লোহার কাঁটা ফুটিয়ে বাঁই বাঁই করে ঘোরা, একতলা উঁচু জায়গা থেকে ইঁট-কাঁটা ভরা গর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া, বুকে রক্ত বইছে, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, চক্ষু আর কাপড় রক্তবর্ণ, আর গলায় মোটা সুতোর মালা। মেলা বসতো মুসলমান জোলা তাঁতি পাড়ায়, খেতাম কদমা আর পাঁপর। এককালে ছিল বৌদ্ধ অনুষ্ঠান। এখন মনে হয়, তন্ত্রের অংশও

ছিল। বৌদ্ধ-জয়ন্তীর ঘটা হবে শীঘ্র, কিন্তু শেষ দিকে বাংলা দেশে ব্যাপারটা জঘন্য হয়ে উঠেছিল। অতো বড় ধর্মের জন্মস্থানেই অতো অবনতি ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। সমাজটা ছন্নছাড়া হয়ে যায়। খড়দার মেলা, ফুলের মেলা, চড়কের মেলা, কুলুটির মেলা, পেনেটির মেলা, অনেক মেলা দেখেছি—গা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে। বারোয়ারি অভব্য নিশ্চয়, কিন্তু ও-রকম অভদ্র নয়। আমার ছাত্রাবস্থার বন্ধু জ্যোতিষ জেলেপাড়ার সঙকে ভদ্র করে তুলেছিল। অমৃতবাবু জ্যোতিষের জন্য ছড়া ও কবিতা লিখে দিয়েছিলেন একবার। জানি না, এখন কেমন চলছে। দিল্লীতে যে শোভাযাত্রা হয়, তার মধ্যে ব্যঙ্গ থাকে না এবং সামাজিক ব্যঙ্গের ভেতর দিয়েই জনসাধারণের চাপা দুঃখ-কষ্ট দুর্ভোগের সামাজিক প্রকাশ সম্ভব হয়। একমাত্র Shankar's Weekly যথেষ্ট নয়। অবশ্য এই ধরনের সামাজিক মুক্তির মধ্যে ওপরকার শ্রেণীর চালাকি থাকে, বিরোধের বিষদাঁত এতে ভেঙে যায়, বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখে। এখন কি আমরা বিপ্লব চাইছি? দিল্লীতে জেলেপাড়ার সঙ দেখালে মন্দ হয় না। রামলীলার কর্ম নয়। দেবাসুরের যুদ্ধ, সৎ-অসতের লড়াই একটু যেন বেশি রকমের অবাস্তব। আমাদের পার্লামেণ্টে যখন বাস্তব সমালোচনা সহজ নয়, তখন জেলেপাড়ার সঙের ওপরই নির্ভর করতে হয় দেখছি। সরকারী কর্মচারী—বুরোক্রেসিকে ঠাট্টা করার অমন সুযোগ আর কি আছে? বিশেষত যখন আইন তাদের সাহায্য করছে। প্রত্যেক সঙ সামাজিক এবং anti-legal, anti-bureaucratic। সঙের হাসি মোটা, চওড়া, খোলা, ঠোঁট-বাঁকানো নয়—বুদ্ধিদীপ্ত বিদ্রূপ নয়, প্রাণখোলা হাঃ, হাঃ, হাঃ। ব্যাপারটা বেশ ডেমক্রেটিক অর্থাৎ mediocre—জমবে ভালো।

গ্রেহাম গ্রীন-এর লেখা অত্যন্ত আঁটসাঁট ; ভাষা ও গল্পের মিলন সম্পূর্ণ : বেগে চলে পরিণতির দিকে। 'The Quiet American'-ই বোধ হয় আঁটের দিক থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ নভেল। একটি অবান্তর কথা নেই। গাঢ়বদ্ধতা বিস্ময়কর। তবু, আমেরিকান পাইল, যিনি নায়ক, যেন আবছা রকমের। বোধ হয় সেইটাই গল্পের ট্র্যাজেডি। তাঁর তুলনায় ইংরেজ ফাউলার নিতান্তই পরিণত, স্পষ্ট মূর্ত। ফুয়ঙ্—যিনি নায়িকা—হাল্কা অথচ দৃঢ় রেখা ও রঙে রচিত। উপভোগের স্তর তিনটি : (১) এশিয়ার পটভূমিতে আমেরিকার কার্যকলাপের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। ব্যাপারটা পলিটিকাল হয়েও পলিটিকাল নয়। এশিয়ার জটিল পরিস্থিতি, পাইল বুঝতেই পারে না। কেতাবী আদর্শবাদের তাড়নায় সে Third Force তৈরি করতে যায়, আবার সেইজন্যই সে ফুয়ঙ্কে বিয়ে করে আমেরিকান বানাতে চায়। দুটি ক্ষেত্রেই তার অক্ষমতা প্রমাণ হলো। বেচারি খুন হলো, আর ফুয়ঙ্ ফাউলারের কাছে ফিরে এলো। ফাউলার নিজেকে রিপোর্টার বলছেন, অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নিউট্রাল। 'এ যুদ্ধ আমার নয়।' বুদ্ধিমান, পরিণত য়ুরোপীয়ানের মনোভঙ্গী এই রকমই মনে হয়। এইখানে য়ুরোপীয়-আমেরিকানের মনোভাবের বৈষম্য পরিস্ফুট। পাইল ধার্মিক (moral) আর ফাউলার বৈজ্ঞানিক ও sophisticated। (২) ফাউলারেরও ধর্ম আছে, নিজেকে রিপোর্টার অর্থাৎ সিনিক বললে কি হবে! এই ধর্মের সমস্যা হলো involvement—অর্থাৎ জড়িয়ে পড়বো কি না। হীরের মতন এর গোটা কয়েক ফ্যাসেট্ আছে। একটা হলো, দক্ষিণ এশিয়ার আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের দলাদলি থেকে সরে দাঁড়ানো। গ্রীন এখানে অনেকটাই সার্থক। আরেকটা হলো ফুয়ঙ্, যাকে তিনি ছাড়তে চান না, যার জন্য স্ত্রীর কাছে ডাইভোর্স চান। স্ত্রী

প্রথমে সম্মতি দিলেন না। পরে যখন দিলেন তখন পাইল খুন হয়েছে এবং ফাউলারের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। তৃতীয়টা হলো, পাইলের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর যোগ। সেটায় পুলিশ কেস্ ঠিক হয় না, তবু সে ব্যাপারে ফাউলার morally involved। চতুর্থ ফ্যাসেট হলো, পাপ ও বিবেকের সেই ক্যাথলিক ধারণা। এটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তবে না বোঝার জন্য উপভোগে আমার কোনো বাধা হয়নি। গ্রেহাম গ্রীনের ইদানীংকার নভেল পড়ে আমার মনে হয়েছে যে, তিনি ক্যাথলিসিজমের বাহ্য রূপ, আচার, আড়ম্বর, বিশ্বাস থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এমন একটা জায়গায় পৌঁচেছেন, যেখানে ব্যক্তিত্বের সর্বজনীন মূল্য তার সামনে জ্বল জ্বল করছে।

(৩) তৃতীয় স্তর নিছক সাহিত্যের। রিপোর্টার এখানে সাহিত্যিক। দক্ষিণ এশিয়ার যুদ্ধের এমন অপূর্ব, সংযত বর্ণনা আমার চোখে পড়েনি।

ওদেশে পাকা ক্যাথলিক হয়েও যদি পাকা নভেলিস্ট হওয়া যায়, যেমন মরিয়াক, গ্রেহাম গ্রীন—ঈভলীন ওয়াফ্‌কে ধরছি না, তিনি সমান স্তরের নন,—তবে এদেশে তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, সুফি নভেলিস্টই বা হবে না কেন? উৎকৃষ্ট তান্ত্রিক গল্প, বৈষ্ণব ও সুফি কবিতা আছে। 'বিসর্জন'কে তান্ত্রিক নাটক বলা যায় কি? তারাশঙ্করের একটা ছোট নভেলের প্লটে তান্ত্রিক সাধনা স্থান পেয়েছে বটে, তবু যেন ঠিক বসেনি। বৈষ্ণবী নভেল না লিখতে যাওয়াই ভালো, একেই আমরা ভাববিলাসী। তান্ত্রিক নভেলের সম্ভাব্যতা খুব বেশি। কোনো কাপালিককে নায়ক করতে বলছি না, কিংবা কপালকুণ্ডলার অনুকরণও চাইছি না। তবে মনে হয় শক্তিমন্ত্রের মধ্যে (মন্ত্রশক্তি নয়) অনেক নাটক-নভেলের বীজ রয়েছে।

২৬-৪-৫৬

নিজের দেহ নিয়ে অন্যে পরীক্ষা করছে দেখলে বিজ্ঞানের ওপর বিশ্বাসের চেয়ে নিজের বুদ্ধির ওপর অবিশ্বাস হয়। বিজ্ঞানের বাহাদুরি চিরটা কাল শুনে এলাম, কিন্তু বেশি দেখলাম বৈজ্ঞানিকের, বিশেষত ডাক্তারের অসার্থকতা। কেন এমন হয় ভাবছি। মনে হচ্ছে, ব্যক্তির সজ্ঞান সহযোগ না থাকলে বিজ্ঞানই বা কি করবে, বৈজ্ঞানিক-ডাক্তারেরই বা দোষ কি! কেবল ব্যক্তির নয়, সমাজেরও সহযোগ প্রয়োজন। মাত্র রোগ সারানোকেই ডাক্তারি বিদ্যার চরম পরিণতি যে ভাবে, সে বিজ্ঞানের সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান।

শুনেছি প্রতি মানুষের বিশেষত্ব আছে, সেটা তার নিজস্ব, একান্ত unique……যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে জ্ঞানপ্রকাশ জোহরি মারা গেল। এত লোকে ভালোবাসতো তাকে, সত্যই ভালোবাসতো, কই কেউ তার যন্ত্রণার এক তিল ভাগ নিতে পারলে না তো! মানুষের খাঁটি নিজস্ব সম্পত্তি যন্ত্রণা, তার অংশীদার কেউ হতে পারে না। যীশু কাল্পনিক অংশীদার, তাও যন্ত্রণার নয়, মানসিক পাপের। ধর্মের অনেকখানি আবেদন এই অংশীদারের সন্ধান, অবতার থেকে গুরুবাদ পর্যন্ত। যন্ত্রণার ভাগবাঁটোয়ারা হয় না, অথচ মানুষ চায় হোক। মিথ্যা চাহিদা—তাই ধর্মের মধ্যে অনেকখানি আত্মপ্রবঞ্চনা রয়েছে। জীবনে এই ধরনের দু’-একটা দামী জিনিস সোশ্যালাইজড্‌ হয় না দেখছি। অবশ্য তাদের ইতিহাস আছে।

বিজ্ঞানের সাহায্যে যন্ত্রণা কমে, কিন্তু সোশ্যালাইজড্ হয় না। এইখানে বিজ্ঞানেরও প্রবঞ্চনা। অসভ্য জাতির যন্ত্রণাবোধ কম, বিজ্ঞানের দৌলতে নয়, ট্রাইবালিজমের জন্যেও নয়। বাঙালীর মেয়েকে প্রসবের তিন ঘণ্টা পর রান্নাঘরে ঢুকতে দেখেছি, আবার আধ মাইল দূর থেকে প্রায় সারারাত গোঁঙানিও কানে এসেছে। আর্থিক অবস্থার তারতম্যে এর ব্যাখ্যা হয় না। শিক্ষা, অভ্যাস, প্যাভলভ্—মানতে পারি, তবু যন্ত্রণা নিজস্ব। ভাগ্যিস্ আত্মা আমাদের নিজস্ব নয়, হলে ভাবতাম আত্মাই যন্ত্রণা।

সচ্চিদানন্দের আনন্দ কতটুকু ?

খুকু (শ্রবণা) স্কুলের মধ্যবার্ষিক পরীক্ষান্তে দেখা করতে এলো। বয়স দশ কি এগারো। বছর দুই পরে ম্যাট্রিক দেবে। সাতটি বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছে, পড়তে হচ্ছে পঁচিশখানি বই ! একে শিক্ষা না পীড়ন বলবো ! সব বাচ্চাদেরই কি এই দশা ? না আমার এই পচা তিন-পুরুষে অধ্যাপক বাড়িরই কেবল ? বাঙালী মেয়েদের এই ধরনের শিক্ষায় বাংলার সর্বনাশ হবে। এত পাঠ্যপুস্তক পড়ে পরীক্ষা দিলে একটি বাচ্চা হবার পর যক্ষ্মা না হয়ে যায় না। ছোট্ট মেয়েকে দেখলে আমার মন যত বিষণ্ণ হয়, অতো বিষণ্ণ কিছুতে হয় না। মেয়েদের মা'রা বলেন কি মিষ্টি মুখ আর হাসি—আমি দেখি দুঃখ দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, ক্ষোভ, রোগ, শোক, অভিমান, অপরিণতির হতাশার চিহ্ন। বুদ্ধদেব অনেক কিছুই দেখেছিলেন—বাঙালী ছোট্ট মেয়ে তো দেখেননি, দেখলে সারনাথে ফিরতেন না, ঐ গয়াতেই প্রাণত্যাগ করতেন।

২৭-৪-৫৬

একটি মতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলে সন্দেহবাদ জন্মায় না। সেজন্য অন্তত ছুটি বিরোধী মতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া চাই। কেবল তাই নয়, দুটি শক্তিশালী দল বিপরীত সত্যকে সমর্থন করবে। সেই থেকে সত্য সম্বন্ধেই প্রশ্ন উঠবে—এবং তারই ফলে এপিস্টেমলজি—সক্রেটিস অর ডেকার্ট্। বিদেশী ইকনমিক্সের ইতিহাসে এই ধরনের প্রাথমিক তত্ত্বসন্ধান পেয়েছি। ভারতে মহাত্মাজীরই ছিল একমাত্র। তাই পাগলামি মনে হতো, এখনও হয়। প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টরের মতবাদের বৈপরীত্য থেকে কি কোনোপ্রকার epistemology of economics উঠবে না? পার্লামেণ্টের এবারকার বৈঠকে দু'জন বুদ্ধিমান ব্যক্তির মুখ থেকে প্ল্যানিং সম্পর্কের আলোচনায় philosophy কথাটি বেরিয়ে গেল। রবিন্স-এর শিষ্যরা কি বলবেন জানি না! যে যাই বলুন না কেন, শেষে মানুষকে এমন অবস্থায় আসতে হয়; যেখানে প্রাথমিক প্রতিজ্ঞাকেই অস্বীকার করা ছাড়া গতি থাকে না। গান্ধীজী তাই করেছিলেন—তাঁর মনে গোটাকয়েক সাংঘাতিক প্রশ্ন জেগেছিল এই ইকনমিক্স সম্পর্কে। উত্তর দিতে পারেননি অবশ্য। তবু ব্যাপারটা সক্রেটিক। আমরা ছাত্রদের প্রশ্নই করি, তাইতে রোজগারও করি, কিন্তু সত্য বলতে কি, আমাদের মনে কোনো সন্দেহই ওঠে না। বড়ই বিশ্বাসী জীব আমরা। হয়তো কৃষ্ণও কারুর কারুর মিলেছে, কিন্তু এ-কালাবাজার মথুরার সে-কালার প্রেমের বাজার নয়।

আমার মনে প্রাইভেট সেক্টর এবং পাবলিক সেক্টর—দুই সেক্টরের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ উঠেছে। পাবলিক সেক্টরের দয়ায় কুঁতিয়ে কাঁতিয়ে ওয়েলফেয়ার স্টেটের কাঠামো খাড়া করা যায়—কিন্তু সোশিয়ালিজম্ না আসতেও পারে। আর সন্দেহ হয়েছে এই যে, প্রাইভেট সেক্টরের তাগিদ মুনাফা বৃদ্ধি নয়, আশা-মরীচিকা। এখানে সব বো, বে, বা-র খেলা—কালে সবই হবে, হবার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যাবে, আবার হবে। কি যে হবে তা জানি না। হওয়ার নাম ক্যাপিটাল-বৃদ্ধি। চীনেরা যখন ওষুধ কিনতে পেতো না, তখন প্রেস্কৃপশনটা জলে ধুয়ে সেই জলটা রোগীকে খাইয়ে দিতো। ফল যে হতো না তা নয়। আমাদেরও হচ্ছে। আমি চাই দেশের প্রত্যেক শিক্ষক আর যুবক সন্দেহশীল হোক। নতুন এপিস্টেমলজি না হলে নবজীবন জমে না—প্রমাণ ওদেশের সপ্তদশ শতাব্দীতে ছড়ানো। (মুঘল আমলের নবজীবনের পেছনে বৃন্দাবন গোঁসাইদের তত্ত্বজ্ঞান মনে হয় ছিল—কতটা ও কিভাবে জানি না। কে বলতে পারেন তাও জানি না। যাঁরা দার্শনিক, তাঁরা ঐতিহাসিক নন এবং যাঁরা ঐতিহাসিক, তাঁরা রসতত্ত্বের ধার দিয়ে যান না পাছে ভিজে যান।)

১৮-৪-৫৬

ডাক্তার-বদ্যি দেখছে। আরো দেখবে। খরচের কূলকিনারা নেই। সরকারী বন্দোবস্ত, নিয়ম-কানুন না হলে কিছুই হবে না।

রাশিয়ায় আমাকে পাঁচজন অধ্যাপক পরীক্ষা করলেন, কত প্লেট নিলেন, কিছুই খরচ হলো না। বিদেশী ও বিদেশী অধ্যাপক বলে বিশেষ খাতিরও দেখালেন না। ওখানকার রীতিই তাই। ক্লিনিকে আমার পূর্বে ও পরে দুটি গ্রামের মেয়ে ছিল, চাষীর ঘরের। ইংলণ্ডেও ডাক্তারকে টাকা দিয়েছি, এখানকার তুলনায় অনেক কম। ওয়েলফেয়ার স্টেটের সঙ্গে সোশিয়ালিস্ট স্টেটের পার্থক্যের জ্বলজ্বলে প্রমাণ ডাক্তারিতে, রোগ ও রোগীর প্রতি ব্যবহারে।

আমার হঠাৎ মনে হলো এ-দেশে কোনো চালাক হাতুড়ে যদি মাত্র পেটেণ্ট ওষুধের মোড়কগুলি পড়েন, তা হলেই তিনি এক্সপার্ট নাম কিনে বত্রিশ টাকা ফী আদায় করতে পারেন। ক্যাপি-টালিজমের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া এই পেটেণ্ট ওষুধের বিক্রিতে ও ব্যবহারে। ক্যাপিটালিজম বলতে আমরা ভাবি লোহা আর কাপড়ের কারখানা। কিন্তু ওষুধের ব্যাপারে ক্যাপিটালিজম হাজারগুণ বেশি মারাত্মক। পেটেণ্ট ওষুধ আর ইন্‌জেক্‌শন না দিলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ডাক্তার হতে পারে না, রোগীদের পছন্দ হয় না। তাঁদের দেহ ও মন এমন হয়েছে যে, তা না হলে রোগও সারে না। মন পর্যন্ত দুষ্ট হয়েছে আমাদের। একেবারে বামুনে শয়তানী।

একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। বরাবরই দুঃখকষ্টের সময় পড়লে, লিখলে ভুলে থাকি। আগে পড়লেই চলতো, এখন কিন্তু কাগজ-কলম চাই। লিখি আর না লিখি, আঁচড় কাটি। খুব কম লেখকই যথার্থ সান্ত্বনা দিতে কিংবা যন্ত্রণার উপশম করতে পারে। দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা যখন নিজস্ব বস্তু, তখন তার উপশম নিজের হাতে—অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে হাতের কাজে। মোক্ষ সাধনার একটা পাকা ভিত্তি দৈহিক সক্রিয়তা। বিধবাদের রান্না করা, ঘর মোছা,

বাসন মাজা প্রভৃতি কাজগুলি কেবল ফিউডাল পরিবারের কর্তার নিষ্ঠুরতার চিহ্ন নয়। অকুপেশনাল থেরাপিতে কাজ হতে দেখেছি।

অন্তত এই হিসেবে শিক্ষক সম্প্রদায়ের শ্রমদানে আমি অবিশ্বাসী নই। একবার প্রায় বিশ্বাসী হয়েছিলাম। শ্রমদান সপ্তাহে জন বার-চোদ্দ ছাত্রসমেত কোদাল দিয়ে একটা নালা চাঁছলাম। রাজ্যপাল আর মন্ত্রী আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এ হলো কি! নালা চাঁছার পর কোদাল হাতে ছবি তোলা, তারপর কিছু জলযোগ, তাতে বেশি খরচ হয়নি। কিন্তু যে মাটি চেঁছে খানার ধারে রেখেছিলাম, অর্থাৎ আমার তত্ত্বাবধানে ছাত্ররা রেখেছিল, সব এক পশলা বৃষ্টিতে যথাস্থানে ধুয়ে এলো। আমার কপালে বিশ্বাস টিকে না—বিশ্বাস করেছি কি মরেছি। তাই জোর, 'মনে হয়' বলি, 'মনে এলো' লিখি।

এই প্যারাগ্রাফটি লিখে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

What are the basic categories of the sociology of knowledge ? Concepts represent interpretative responses to given situations. We are actually dealing with four variables : (1) the situation, such as a community, a nation, a revolution, or a class, which we attempt to interpret, when we respond to it ; (2) the individual who is peculiarly involved in the situation and accordingly forms an image of it. Such involvements may include occupational aims, political aspirations, kinship ties, economic

rivalries and alliances, in short, a multitude of overlapping group attachments; (3) the imagery which individuals or groups adopt; (4) finally, the audience to which the image is conveyed, including its peculiar understandings, symbols to which it attaches meanings, and a vocabulary to which it responds. The four factors of ideation must be considered as inter-dependent variables.—Karl Mannheim—Essays in the Sociology of Culture. Introduction p. 2.

২৯-৪-৫৬

আজকার প্রধান খবর যদি লিখতাম, তবে ডায়েরী হতো। অবশ্য মনের ওপর খবরের ধাক্কার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ, তার সম্বন্ধে মন্তব্য, সবই ডায়েরীতে চলে। আমি ঠিক ডায়েরী লিখছি না, যদিও ঐ ধরনের রচনার প্রতি আমার একটু মোহ আছে। 'দাদার ডায়েরী' দিয়েই 'সবুজ পত্রে' আমার হাতে খড়ি। দেশী বিদেশী বহু ডায়েরী পড়েছি, পীপস্ থেকে জীদ্, মার্সেল পর্যন্ত। এমিয়েল-এর জার্নাল আমি সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের কৃপায় পড়তে পাই। মাণ্ডালে জেলে অন্তরীণ বাসের সময় ভারত সরকার তাঁকে খানকয়েক মূল্যবান বই পড়তে বাধা দেয়নি। (গ্যেটের Poetry

and Truth, Conversations with Eckerman এবং কার্লাইলের Past and Present প্রভৃতিও তাঁর কাছে ছিল, নাগালে থেকে নিয়ে এসেছিলেন।) এমিয়েল খুব ভালো লেগেছিল মনে আছে। তার ওপর, আর্নল্ড-এর Essays in Criticism-এ যখন সুখ্যাতি পড়লাম তখন থেকে এই ডায়েরী পড়বার ও লেখবার ঝোঁক এলো। কেইসারলিঙ ও রবীন্দ্রনাথের ইদানীংকার রচনা একটু বেশি দার্শনিক। তবু চমৎকার। নিছক রিপোর্ট ও দার্শনিক ডায়েরীর মাঝামাঝি অনেকখানি স্থান রয়েছে—আমি তারই মধ্যে ঘোরাফেরা করি।

দেহ-মন ঐ টাইম-স্পেসের মতনই ব্যাপার—যমজ গোছের, ডিপথঙ বলা চলে। খানিক দূর পর্যন্ত মন শক্ত করা যায় নিশ্চয়। কিন্তু দেহকে করায়ত্ত করবো যে ভাবে, সে দাম্ভিক অহংকারী। তা যদি সম্ভব হতো, তবে সাধুদের কর্কট রোগ বহুমূত্র হতো না। শোনা যায় পরমহংসদেবের নিদ্রাবস্থায় তাঁর গায়ে যদি কেউ টাকা পয়সা ছোঁয়াতো, অমনি গায়ের সে জায়গাটা কুঁচকে যেতো। অথচ তাঁরও ক্যান্সার হলো, তাইতে তিনি মারা গেলেন। অতো বড় যোগীর যদি ঐ অবস্থা হয় তবে চলতি দেহ ও মনোবিজ্ঞানের অনেকগুলি প্রতিজ্ঞাকেই অদল-বদল করতে হয়। আমার ধারণা, 'সোমা'ই ভিত্তি, সাইকী তার ওপর রঙ চড়ানো। কাঁচা বুনিয়াদের ওপর স্কাইস্ক্রেপার তোলা শক্ত। শুনেছি, রাইট সাহেব থল-থলে কাদার ওপর ইমারত খাড়া করেছিলেন টোকিওতে। সেই রকম হয়তো দু'-একজন যোগী ঋষি কাঁচা দেহের ওপর আত্মজ্ঞান খাড়া করতে পারেন। এটা কিন্তু আত্মজ্ঞানের বাইরের ব্যাপার। আত্মজ্ঞানে মৃত্যুভয় হয়তো গেল, আরো অনেক কিছু হলো। কিন্তু যে যন্ত্রণায় মৃত্যু অনিবার্য, তার বেলা আত্মজ্ঞান অক্ষম। হিন্দু

খৃস্টান আদর্শবাদ—এ একপ্রকার আদর্শবাদ ছাড়া আর কি ?—পৃথিবীর জীবনের সংসারের অনেক নিরেট সত্যকে বুঝতে দেয়নি। অবশ্য সেজন্য তাকে ত্যাগ করাও যায় না। এ যুগের হিন্দু ভারতবাসীর এই এক মানসিক দ্বন্দ্ব !

মানুষ বোধ হয় শান্তিস্থিতির জন্য একটা সিদ্ধান্ত চায়। ভূত, ভগবান, অবতার, গান্ধী, এরিস্টটল, একোয়াইনাস, পোপ, সর্দার, ডিক্টেটার, আদর্শবাদ বস্তুবাদ, 'ইজম্'—একটা না একটা তৈরি সিদ্ধান্ত পেলে অনেক আরাম। উইলিয়ম জেমস লেকচার দেবার সময় আবোল-তাবোল বকে গেলেন, শ্রোতৃবৃন্দের একজন শেষে প্রশ্ন করলে তা হলে আর আপনার সিদ্ধান্তটি কি ? জেমস উত্তর দিলেন, 'বিশ্বের কি অন্তিমকাল এসেছে যে, আমাকে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দিতেই হবে ?' এর মোদ্দা কথাটা হলো এই—সত্তা একটা প্রোসেস—স্থায়ু নয়, substance নয়। এই ভূত-বিজ্ঞানের আদিম প্রতিজ্ঞা। বুঝলাম—প্রোসেস মানে তো চলা ? চরৈবেতি, চরৈবেতি, চরৈবেতি—কিন্তু কতদিন মানুষ চরবে ? শৃঙ্খলে বাঁধা গ্যালি-স্লেভের অবস্থা মানুষের। সেও স্থির নয় স্থাণু নয়, কিন্তু কার নৌকো কে চালায় ! এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের ঘুরপাক খাওয়ার মতন—কাফকার 'কে'র মতন।

৩০-৪-৫৬

খাশা বন্দোবস্ত ডাক্তারদের। কথাবার্তা বন্ধ, চা-সিগারেট

বন্ধ, বিদেশ যেতে হবে অস্ত্রোপচারের জন্য। মা বলতেন, দশ বারো বছর পর্যন্ত নিরীহ ছিলাম—সত্যেনও (বোস) বলে ঐ বয়সে ভীষণ লাজুক ছিলাম। হয়তো ছিলাম। তাহলেও পঞ্চাশ বছর কথা কইছি, অনর্গল, দিনে দশ বারো ঘণ্টা নিশ্চয়, স্বপ্নে বক্তৃতা দেওয়াটা ছেড়েই দিলাম। আর সিগারেট-চা-কফির ইয়ত্তা নেই। হিসেব এই রকম : দিনে পঁচিশটা সিগারেট চল্লিশ বছর, তিন কেৎলী চা—পেয়ালা হিসেবে যারা খায় তারা ডিলেটাণ্ট —প্রায় বিশ বৎসর, আর কফি দু' কেৎলী প্রায় পনেরো বছর। অতএর আফশোস নেই। ভগবানের রাজ্যে ন্যায় বিচার নেই কে বলে! কিন্তু বেচারা লপচু কোম্পানী আর কফি হাউস কি দোষ করলে? এটা বোধ হয় চা-কফি বাগানের শ্রমিকদের অভিশাপ।

যে মানুষ ট্রাউজারসের ক্রীজ, ধুতির কোঁচা, পিরানের রঙ, কলমের কালি, লেখবার কাগজ, বই সাজানো প্রভৃতিতে ঈষৎ অদল-বদল হলে রসাতল করে, সে মানুষকে সঙ্কটের সময় পাথর হয়ে যেতে দেখেছি। আবার শক্ত সামর্থ্য লোক মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কেঁদে আকুল। আমার ধারণা, ছোট্টখাট্ট ব্যাপারে নার্ভাস হওয়া ভালো, শক্তি সঞ্চিত থাকে বড় ব্যাপারের জন্য। যদি বড় ব্যাপার না ঘটে তবে অবশ্য সবই বরবাদ। কিন্তু সত্যই তা কি? Fussiness-এর একটা সামাজিক মূল্য আছে। নতুন বৌকে নিয়ে fuss না করলে বেচারীর অভিমান হয় না? বুড়ি ঠাকুমা মারা যাচ্ছেন, অর্থাৎ গিয়েও যাচ্ছেন না—এক্ষেত্রে নাতি নাত-বৌদের fuss করা ছাড়া আর কি কর্তব্য বুঝি না। বড়-গিন্নীর চাবি হারিয়েছে, ছোটগিন্নীর নেল-পলিশ পাওয়া যাচ্ছে না, ওধারে মেজগিন্নীর চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আর সেজগিন্নীর অম্লশূল চাগাবো চাগাবো করছে। নাতির জন্য মাগুর মাছ

আসেনি,..এ সব নিয়ে চেঁচামেচি না হলে সংসার কিসের ? Fuss করো না, worry করো না উপদেশ ঝেড়ে আমেরিকার পত্রিকা খালাস—কিন্তু না করলে সমাজ চলে না, পরিবার রাখা যায় না, সঙ্কীর্ণ অর্থে তো অসম্ভব। না, না, ওয়ারি, ফাস, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামাজিক বস্তু। বাড়াবাড়ি না করলেই হলো—অর্থাভাবে কেই বা করছে! তার ওপর ঘুমের ওষুধ তো রয়েইছে। রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে কি fussটাই না করলেন! কিন্তু না করলে রামায়ণ ও মেঘনাদ বধ লেখা হতো না, আর রামরাজ্য পরিষদও তৈরি হতো না।

এই সব নানা কারণেই পার্শী থিয়েটারের পৌরাণিক ড্রামার মধ্যে একটা কমিক থাকতো। ভূমাতে আনন্দ, কিন্তু ছোটতে মজা। সংস্কৃত সাহিত্যে ট্র্যাজেডি নেই, তার কারণ তাঁরা জ্ঞানী ছিলেন। রসতত্ত্ব নিয়ে অতো fuss না করলে নিশ্চয় বহু অপাঠ্য ট্র্যাজেডি ও নভেল লিখে ফেলতেন।

আজকাল অর্থশাস্ত্রীরা তুচ্ছ ব্যাপারে fuss করছেন বলেই না উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির হার তাঁদের অজানিতে অতোটা বেড়ে গেল! আমার তো মনে হয় fuss-এর জন্যই আমরা বেঁচে আছি, নচেৎ সব ক্যালভিনিস্ট হয়ে যেতাম।

সে যাই হোক, কথা বন্ধ তো মনও বন্ধ হোক। যা নিয়ে কথা কওয়া যায় না, আড্ডা আসর জমানো যায় না, তার অস্তিত্ব মন স্বীকার করে না। ব্রহ্ম আছেন, কারণ তাকে নিয়ে মজলিস হয়—প্রমাণ উপনিষদ আর ঋষিদের সভা। আর ভগবান তো রয়েইছেন, প্রমাণ ধর্মব্যাখ্যা কীর্তন ইত্যাদি। ডাক্তারের উপদেশগুলোকে গম্ভীরভাবে নিতে পাচ্ছি না। ইতি—ধূর্জটিপ্রসাদ